বীরভূম লাভপুরের সাহিত্যসেবক
বন্ধুবৎসল
স্বর্গগত নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়
এবং
আমার সাহিত্য-সাধনার প্রশ্রয়দাতা
বীরভূম হেতমপুরের মহারাজকুমার
স্বর্গগত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তীর
স্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র

নিবেদন

পণ্ডিত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন-প্রতিষ্ঠিত নবপর্যায় বীরভূমি মাসিক পত্রে আমার লেখা কবিতা 'উদ্বোধন-সঙ্গীত' ছাপার অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত হয়, সন ১৩১৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। তাহার পর আমার প্রথম গল্পলেখা 'প্রাচীন মঙ্গলডিহি' তিনিই বীরভূমিতে প্রকাশ করেন। লাভপুরের নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাও বীরভূমিতে প্রকাশিত হইত। কুড়মিঠার নিকটবর্তী মঙ্গলডিহি গ্রাম আমার পিতৃদেবের জন্মভূমি। মঙ্গলডিহির নিত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কুড়মিঠায় বিবাহ করিয়াছিলেন। নির্মলশিবের আমন্ত্রণ লইয়া নিত্যগোপাল উপস্থিত হইলেন কুড়মিঠায়। আমি লাভপুরে গিয়া নির্মলশিবের সঙ্গে দেখা করিলাম। লক্ষপতির পুত্র নির্মলশিব প্রথম সাক্ষাতে আমার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহার চিরবিদায়ের পূর্ব পর্যন্ত সেই অন্তরঙ্গতা অক্ষুণ্ণ ছিল। নির্মলশিবের ব্যবহারে আমি যেন মানুষকে নূতন চোখে দেখিতে শিখিয়াছিলাম এবং নিজেকে নূতন রূপে আবিষ্কার করিয়াছিলাম।

কলিকাতা ইণ্টালী হইতে রামরাখাল ঘোষ-সম্পাদিত 'গৃহস্থ' মাসিক পত্রে সন ১৩২০ সাল ভাদ্র মাসে বীরভূম হেতমপুরের মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন-লিখিত 'সুপুর' নামে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। সুপুর বীরভূমের একটি গ্রামের নাম, প্রবন্ধটিতে গ্রামের ইতিকথা ছিল। লেখায় তাঁহার অসামঞ্জস্য দেখিয়া আমি প্রতিবাদ করি; সন ১৩২০ সালের চৈত্র মাসে আমার প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। প্রতিবাদ পড়িয়া মহিমানিরঞ্জন কুড়মিঠা গ্রামে পত্রসহ একজন লোক পাঠাইয়া দেন। পত্রখানি হারাইয়া গিয়াছে, ভাষাটা মনে আছে। 'প্রতিবাদ পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। বীরভূমে এমন লোক আছে আমি জানিতাম না, আপনি হেতমপুর আসিয়া সাক্ষাৎ করিলে আনন্দিত হইব।' মঙ্গলডিহির ভোলানাথ গঙ্গোপাধ্যায় হেতমপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন, থাকিতেন আপন মাসীমার বাড়ীতে। আমি একদিন সন্ধ্যায় মাসীমার বাড়ীতে উঠিলাম, এবং পরদিন প্রাতঃকালে মহিমানিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করিলাম। তাঁহারই অনুরোধে আমি হেতমপুরে থাকিতে সম্মত হই। আমার পরামর্শে হেতমপুরে বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে রাজবাড়ীর পূর্ব হইতেই পরিচয়

ছিল। তিনি সভাপতি হইলেন, উপদেষ্টা হইলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। মহারাজকুমার হইলেন সম্পাদক, আমি সহকারী সম্পাদক। আমার পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট হইল প্রতিমাসে পঁচিশ টাকা। এই টাকা ভাঙ্গিয়াই আমাকে খাইতে হইত। আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কাহিনী সংগ্রহ করিতাম। তখন বাস ছিল না, রিক্সা ছিল না। পায়ে হাঁটিয়া, কোথাও বা গরুর গাড়ীতে যাইতাম। গরুর গাড়ীর ভাড়া যাহাই হউক না কেন, রাজ-সেরেস্তার নিয়মমাফিক মাইল হিসাবে টাকা পাইতাম। খাইতাম গ্রামের গৃহস্থ-বাড়ীতে। নগেন বসুর বিশ্বকোষ ছাপাখানার উপরতলায় বসিয়া লিখিতাম। নীচতলার ছাপাখানায় বই ছাপা হইত। আমার উপরে মাতব্বরি করিবার কেহ ছিল না। 'বীরভূম বিবরণ' লিখিয়াই আমি সাহিত্যিক সমাজে পরিচিত হই। মহারাজকুমার টাকা না দিলে আমার লেখা বই ছাপার হরফে বাজারে বাহির হইত না। এই পরিচয় ও প্রশ্রয়ের পূর্ব ঋণ স্মরণপূর্বক বইখানি আমি নির্মলশিব ও মহিমানিরঞ্জনের নামে উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থমধ্যে গ্রাম্য গাথা ও প্রবচন-প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছি। সুহৃদ্বর ডক্টর সুশীলকুমার দে 'প্রবাদসংগ্রহ' ২য় সংস্করণ প্রকাশ করিলে আমার সংগৃহীত সমস্ত প্রবাদ তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলাম। এই জন্য এই পুস্তকে প্রবাদের তালিকা বর্জন করিয়াছি।

আমি গ্রাম্য ক্রীড়ার কথা বলিয়াছি। যে কালে বাঙ্গালার খেলোয়াড়গণ ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস খেলায় বিশ্বজয় করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন দিনে পল্লীগ্রামের সেকেলে খেলার কথা আলোচনা অসঙ্গত বুঝিয়াও প্রসঙ্গটা ত্যাগ করিতে পারিলাম না। ইহাকে কেহ কুসংস্কার বা মোহ বলিলেও অসন্তুষ্ট হইব না। আমি শ্রদ্ধাবশেই প্রাচীন সাহিত্য, বিশেষ মঙ্গল কাব্য তথা যাত্রা, কবিগান ও হাফ-আখড়াই গানেরও আলোচনা করিয়াছি।

গ্রন্থমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ, রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বসু, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও অপরেশচন্দ্রের উদ্দেশ্যেও শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি।

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের পক্ষ হইতে পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী প্রদেশপাল বীরভূম রায়পুরের সিংহ-পরিবারের দীপনারায়ণ সিংহ যে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন তাহার অর্ধাংশ হইতে ইতিপূর্বে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা' প্রকাশিত হইয়াছে। বাকী অর্থ হইতে এই গৌড়বঙ্গ-সংস্কৃতি প্রকাশিত হইল। দীপনারায়ণ আজ অমরলোকে। আমি তাঁহার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

গ্রন্থ দুইখানিরই 'নামকরণ' করিয়াছেন বিশ্ববন্দিত বিদ্বান সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

যাত্রার কথা আছে ১৭৮০ শকাব্দায় সঙ্কলিত বিবিধার্থ-সংগ্রহ ২৩৫ পৃষ্ঠায়। তাহারও সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্বে ১২২১ সালের সমাচার দর্পণে ৬ই কার্তিক প্রকাশিত হয়—'কালীয় দমন-যাত্রাকারী শ্রীদাম ও সুবল দুই ভ্রাতা দুর্গোৎসবে মোং শ্রীরামপুরে যাত্রা করিতে আসিয়াছিল। এথাতে নবমীপূজার দুইপ্রহর রাত্রিতে শ্রীদাম ওলাউঠা রোগে হঠাৎ মরিয়াছে এবং তাহার পূর্বরাত্রিতে ঐ সম্প্রদায়ের এক বালক হঠাৎ মরিয়াছে। এই রোগে এইরূপে লোক রোগগ্রস্ত হইবা মাত্র মরিতেছে। কিছু কাল বিলম্ব হয় না।'

আমরা পরমানন্দ অধিকারীকে পাইয়াছি ১১৭৫ সালে। তাহার ছাত্র শ্রীদাম সুবল, দুই ভাই। ১২২১ সালে শ্রীদামের মৃত্যু হয়। শ্রীদাম-সুবলের ছাত্র বদন। বদনের ছাত্র গোবিন্দ অধিকারী, গোবিন্দের ছাত্র নীলকণ্ঠ। সমাচার দর্পণের সংবাদ আমাদের সময়-নির্ণয়কে সমর্থন করিতেছে। শিশুরাম, পরমানন্দ, শ্রীদাম-সুবল এবং নীলকণ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

গৌড়বঙ্গ-সংস্কৃতি পুস্তকে প্রকাশিত প্রায় সমস্ত লেখাই দীর্ঘকাল ধরিয়া বিভিন্ন সময়ে বীরভূমি, ভারতবর্ষ, উজ্জীবন, কথা-সাহিত্য, সাপ্তাহিক দেশ, দৈনিক আনন্দবাজার ও যুগান্তরে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই অবকাশে ঐ সকল পত্রিকা-সম্পাদকগণকে আশীর্বাদ জানাইতেছি।

এই প্রবন্ধ সংগ্রহে তৎকালীন সাংস্কৃতিক জগতের নানা জ্ঞানীগুণি, কর্মীপুরুষের উল্লেখ আছে। সেদিন যাঁহাদের সাহচর্য ও সহযোগিতা আমার পাথেয় ছিল, আজ তাঁহাদের অনেকেই পরলোকে। তাঁহাদের স্মৃতিভার বহন করিয়া আমি দিন গণিতেছি।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক স্নেহভাজন ডক্টর শ্রীমান ভবতোষ দত্ত লেখাগুলির শ্রেণী বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। জিজ্ঞাসার শ্রীমান শ্রীশকুমার কুণ্ড এবং শ্রীমান পরেশ কুমার নন্দী মুদ্রণ বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইয়াছেন। আমি ইঁহাদের সর্বকল্যাণ কামনা করিতেছি। নিবেদন ইতি—

গৌড়বঙ্গ

অতি পূর্বকালে ভারতবর্ষের এক অংশ পাঁচটি ভাগে বিভক্ত ছিল। নাম ছিল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম। বর্তমান ভাগলপুর অঞ্চলের পূর্ব নাম অঙ্গ। বঙ্গ—পূর্ববঙ্গ, কলিঙ্গ—কটক অঞ্চল। তাহার পরের দেশ ওড্র-উড়িষ্যা। পুণ্ড্র মালদহ অঞ্চলের এবং সুহ্ম রাঢ় অঞ্চলের পূর্ব নাম। পুণ্ড্রের রাজধানী ছিল গৌড়। অঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম পরবর্তী কালে গৌড়মণ্ডল নামে অভিহিত হয়। একসময় সমগ্র বাঙ্গালা দেশ গৌড়বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। আসাম পর্যন্ত সীমা ছিল এই গৌড়বঙ্গের। উত্তরকালে কোন সময় গৌড়বঙ্গ চারিটি প্রদেশ বা ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়। পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, প্রাগজ্যোতিষভুক্তি, বর্ধমানভুক্তি ও দণ্ডভুক্তি—মালদহ, আসাম, রাঢ় অঞ্চল, এবং মেদিনীপুর অঞ্চল। পরে বর্ধমানভুক্তির অর্থাৎ রাঢ়ের একাংশের নাম হয় কঙ্কগ্রামভুক্তি।

গৌড় বঙ্গ নামে পৃথক হইলেও সভ্যতা ও সংস্কৃতির যোগসূত্র উভয়ের অচ্ছেদ্য ছিল। মহাকবি কালিদাস সম্রাট রঘুকে বঙ্গবিজেতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অনেকের মতে রঘুবংশের রঘুর দিগ্বিজয়ে গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের রেখাচিত্র রহিয়াছে। বঙ্গের নৌসাধনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কালিদাস। পরবর্তীকালে দুই পরাক্রান্ত রাজবংশ গৌড়বঙ্গের শাসনকার্য পরিচালন করিতেন। গৌড়মণ্ডলের অধীশ্বর ছিলেন পালরাজগণ। বর্মরাজবংশ বহুদিন বঙ্গের শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। বর্মরাজগণের সময়ে রাঢ়ামণ্ডলের সঙ্গে বঙ্গের ঘনিষ্ঠ সংযোগ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গেশ্বর হরিবর্মদেব প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন রাঢ়ের সিদ্ধল-গ্রামীন ভবদেব ভট্ট। শস্ত্র এবং শাস্ত্রে ইঁহার সমান পারদর্শিতা ছিল। অধিকাংশ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের জন্ম হইতে মরণোত্তর কর্তব্য-বিধান আজিও ভবদেব-সঙ্কলিত দশকর্ম পদ্ধতি অনুসারেই পরিচালিত হয়। ভবদেব এ দেশের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী কয়েকটি শিল্পী সম্প্রদায়কে পুরোহিত দানপূর্বক হিন্দুসমাজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। "তিলি, তাম্বুলী, মালী, গোপ, নাপিত, গোছালী, চিটে, পিটে, কামার, এই নয়

জাতি আমার।" তিলি বণিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাম্বুলী—পানবিক্রেতা। মালী—মালাকার। গোপ—সৎগোপ ও পল্লব গোপ। নাপিত—ক্ষৌরকার, গোছালী—বারুজীবী, বারুই যাহারা পানের চাষ করে। চিটে—মোদক ময়রা। পিটে—কুমোর। কামার—কর্মকার, লৌহের অস্ত্রশস্ত্র ও কৃষিকর্ম ও গৃহোপকরণ-নির্মাতা। ইহারা নবশাখ নামে পরিচিত।

ভবদেব আপন জন্মভূমিকে কখনো বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার প্রিয় সুহৃদ বৃহস্পতি মিশ্র ভবদেবের প্রশস্তি-শ্লোকে বলিয়াছেন—

রাঢ়ায়ামজলাসু জাঙ্গল পথ গ্রামোপকণ্ঠস্থলী
সীমাসু শ্রমমগ্ন পান্থ পরিষৎ প্রাণাশয় প্রীণনঃ।
যেনাকারি জলাশয়ঃ পরিসর স্নাতাভিজাতাঙ্গনা
বক্ত্রাব্জ প্রতিবিম্ব মুগ্ধ মধুপী শূন্যাব্জিনী কাননঃ॥

যিনি রাঢ়দেশের জলহীন বনপথে গ্রামোপকণ্ঠ সীমায় শ্রমক্লান্ত পথিকগণের প্রাণমনের প্রীতি সম্পাদক জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই জলাশয়ের পরিসর বক্ষে অভিজাতবংশীয় রমণীগণও স্নান করিতে আসিতেন। জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত তাঁহাদের মুখারবিন্দ দেখিয়া মুগ্ধ ভ্রমরেরা পদ্মবন শূন্য করিয়া চলিয়া আসিত।

ভবদেব ভট্টের পূর্বপুরুষ অট্টহাসের সাধনক্ষেত্র বর্তমান লাভপুরের পূর্ব প্রান্তে দেবীদহ নামক বিশাল সরোবরের বিলুপ্তাবশেষ আমি ভবদেব-প্রতিষ্ঠিত জলাশয়ের অন্যতম বলিয়া মনে করি। লাভপুরের অট্টহাসের অদূরবর্তী উত্তরে ভবদেবের জন্মভূমি সিদ্ধল গ্রাম আজিও বর্তমান রহিয়াছে।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিগ্বিজয়ী গৌড়বঙ্গ আক্রমণ করিয়াছেন। এক হাজার দুই খ্রীষ্টাব্দে মধ্যভারতের মহারাজা ধঙ্গ রাঢ় এবং অঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ধঙ্গের খাজুরাহো লিপিতে লিখিত আছে তিনি রাঢ় ও অঙ্গ দেশের রাজারাণীকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এই সময় কে রাঢ়াধিপ ছিলেন, কোন্ সুযোগে রাঢ় স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিল, আজিও তাহা জানা যায় নাই। মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ রাঢ়াধীশ্বরের বংশধর বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন।

দশ শত চব্বিশ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোল দণ্ডভুক্তি আক্রমণ করিয়া তাহার অধীশ্বরকে নিহত করেন। দক্ষিণরাঢ়ের রণশূর চোলসৈন্যের হস্তে পরাস্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গের অধিপতি গোবিন্দচন্দ্র চোলরাজের সঙ্গে যুদ্ধে

পশ্চাদপসরণ করিয়াছিলেন। উত্তর রাঢ়ে মহীপালের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় বরণ-পূর্বক চোলরাজ দেশে ফিরিয়া যান। দণ্ডভুক্তির ধর্মপাল নিহত হওয়ায় সুহ্মের সামন্তরাজকে দূরীভূত করিয়া ধর্মপালের রাজনৈতিক প্রতিনিধি সোমঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ সুহ্মের সিংহাসন গ্রহণ করেন। সামন্তরাজ কর্ণসেনের পুত্র লাউসেন মহীপালের সাহায্যে যুদ্ধে ইছাইকে নিহত করিয়াছিলেন। এই বিপ্লব উপলক্ষ্যেই তিনি কতকগুলি যোদ্ধজাতিকে একতাবদ্ধ করিবার জন্য ধর্মরাজপূজার প্রবর্তন করেন। অনধিকৃত-বিলুপ্ত-পিতৃরাজ্য-গৌড়েশ্বর প্রথম মহীপাল এই সময় উত্তর রাঢ়ের বনময় প্রদেশে থাকিয়া বলসঞ্চয় ও সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সেনরাজবংশের কোন পূর্বপুরুষ দাক্ষিণাত্যরাজ রাজেন্দ্র চোলের সৈন্যদলে কার্য করিতেন। তিনি আর স্বদেশে ফিরিয়া যান নাই। বীরভূম মুড়ারই রেল স্টেশনের উত্তরে কর্ণাটক ক্ষত্রিয় এই সেনবংশের প্রথম উপনিবেশের বিরাট ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে বীরনগর। ধঙ্গ ও রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয় গৌড়বঙ্গ-সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

কিছুকাল পরে নর্মদাতীরবর্তী ত্রিপুরীর পরাক্রান্ত ভূমিপাল চেদীপতি কর্ণদেব গৌড়বঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা বীরশ্রীকে দান করিয়া তিনি বঙ্গেশ্বর জাতবর্মার সঙ্গে বৈবাহিক সন্ধিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর নয়পাল দেবের পুত্র যুবরাজ বিগ্রহপালের হস্তে কর্ণদেব কনিষ্ঠা কন্যা যৌবনশ্রীকে অর্পণ করেন। ইহাও বৈবাহিক সন্ধি। বীরভূমের পাইকোড় গ্রামে চেদীরাজের কোন সামন্তের একটি প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মনে হয় চেদীরাজ্যের সংস্কৃতিও গৌড়বঙ্গকে প্রভাবিত করিয়াছে।

পালবংশের রাজা রামপালের তিরোধানের অব্যবহিত পরেই সেনবংশের বিজয়সেন রাজোপাধি গ্রহণপূর্বক রাঢ়া এবং বরেন্দ্রী অধিকার করেন। পুত্র বল্লালসেন রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বাগড়ি এবং মিথিলার অধীশ্বর ছিলেন। সম্রাট লক্ষ্মণসেন গৌড়বঙ্গের সংস্কৃতিকে অতুল মহিমায় শ্রীসম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার তিরোধানের পর যুবরাজ কেশবসেন ও মাধবসেন কিছুদিন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন পূর্ববঙ্গে। রাঢ়বঙ্গ কথাটাও এদেশে এক সময় খুব প্রচলিত ছিল।

পাঠান এবং মোগল রাজত্বে ঢাকা গৌড়ের গৌরব স্পর্ধা করিয়াছে। পাঠান-মোগলরাজগণ গৌড়বঙ্গের যোগসূত্র অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁ মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপন করেন। মুর্শিদাবাদ কিছুদিন গৌড়বঙ্গের

সংস্কৃতিকেন্দ্র ছিল। বর্গীর হাঙ্গামায় এই রাঢ় অঞ্চলই সর্বাপেক্ষা উপদ্রুত হইয়াছে। ইংরাজ রাজত্বের পত্তন হয় মুর্শিদাবাদে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এদেশে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই পরিবর্তন বর্তমানে এক সর্বনাশা পথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। ইহার কি পরিণাম শ্রীভগবানই জানেন।

যুগধর্ম ও যুগ-সংস্কৃতি

হিন্দু-সংস্কৃতি

শংসন্তি শিল্পানি দেব শিল্পানি ॥
আত্ম সংস্কৃতির্বাব শিল্পম্ ॥
অনেন যজমানঃ আত্মানং সংস্কুরুতে ॥
অনুকৃতির্হ শিল্পম্ ॥

যাহার দ্বারা আত্মার সংস্কার সাধিত হয়, তাহাই সংস্কৃতি। সুতরাং ব্যক্তির মত জাতির, ব্যষ্টির মত সমষ্টির সংস্কারের মূলভিত্তিই হইল সংস্কৃতি। সংস্কৃতি—জাতির জীবিকার অবলম্বন—পশুপালন, কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য। সংস্কৃতি—জাতির সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা—আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, রাজ্যশাসন-পদ্ধতি। সংস্কৃতি—জাতির মানস-সম্পদ—সঙ্গীত, কাব্য, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান। অতএব যে জাতির জীবিকার অবলম্বন যত উন্নত, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যত নির্দোষ, মানস-সম্পদ যত সমৃদ্ধ, তাহার সংস্কৃতিও সেইরূপ উৎকৃষ্ট।

মানুষ যেদিন হইতে স্বভাবের সঙ্গে সংগ্রাম সুরু করিয়াছে, প্রাকৃতিক যুদ্ধে জয়ী হইতে চাহিয়াছে, সেইদিন হইতেই তাহার সংস্কৃতির সূত্রপাত হইয়াছে। মানুষ তাহার স্বভাবজ প্রবৃত্তি অহঙ্কার, কাম, ক্রোধ, লোভকে সংযত করিয়াছে, পরস্পরের সহিত সদ্ভাবে বসবাস করিয়াছে, মানুষ অগ্নি, বায়ু, বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিতে শিখিয়াছে—এই স্বভাবের উপর বিজয়লাভের সংকল্পেই তাহার সংস্কৃতির উদ্ভব। কিন্তু হিন্দু-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যই হইল প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য-সাধন। অপরা প্রকৃতির পরাজয় শুধু পরা-প্রকৃতির বশীকরণেই সাধিত হয়, ইহাই হিন্দুর অনাদিকালের আদর্শ। হিন্দু যেমন উচ্চ-গ্রামে সুর বাঁধিয়া দিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে এক দিব্য-ভূমিতে সমুন্নত করিয়াছে, তেমনই স্বভাবের সঙ্গে সম্বন্ধের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া প্রকৃতি বশীকরণেও সমর্থ হইয়াছে।

অনেকে হিন্দু-সংস্কৃতিকে কৃষি-প্রধান বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। এরূপ অভিধানের সার্থকতা বুঝিতে পারি না। কৃষি এবং শিল্প অঙ্গাঙ্গীভাবে আবদ্ধ। কৃষির জন্যই শিল্পের প্রয়োজন হইয়াছিল। শিল্পের সাহায্য ভিন্ন কৃষিকার্য

সম্পন্ন হয় না—তা সে শিল্প যতই নিম্নাঙ্গের হউক। অবশ্য এই শিল্প কুটির-শিল্প নামে আখ্যাত হইতে পারে। তথাকথিত প্রস্তরযুগের শিকারী-মানবও কুঠার এবং তীরের ফলক নির্মাণে শিল্পের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল। তথাকথিত আদিম-মানবকেও গিরিগুহাবাসের জন্য শিল্পীর সাহায্য লইতে হইয়াছিল। কৃষিকার্যে আদিম কাল হইতে লাঙ্গল, জোয়াল প্রভৃতি শিল্প-দ্রব্যের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং আদিম-মানব আগে কৃষক, পরে শিল্পী—এরূপ বিভাগ চলে কিনা সন্দেহ। প্রস্তরযুগের শিকারী-মানব কবে পশুচারণে বা পশুপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাই বা কে বলিবে? অতএব তাহারাও আগে শিল্পী, পরে পশুপালক—এইরূপই অনুমান করিতে হয়।

ধর্ম এবং সংস্কৃতি এক বস্তু নহে। ভারতীয় সংস্কৃতিরই নামান্তর হিন্দু-সংস্কৃতি। তথাপি আমরা ভৌগোলিক সংস্থান ধরিয়া নামকরণ না করিয়া প্রবন্ধের 'হিন্দু-সংস্কৃতি' নাম ইচ্ছাপূর্বক দিয়াছি। কারণ, ভারতে হিন্দু ভিন্ন অপর কোন জাতি নাই, যাহারা আছে তাহারা সম্প্রদায় মাত্র; এবং পরবর্তীকালে হিন্দু-সংস্কৃতির মিশ্রণেই এই ভারতবর্ষে অপর কয়েকটি সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছে। পাঠান-মোগলের নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল।

ধর্ম এবং সংস্কৃতি এক বস্তু নহে, কিন্তু ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিশেষত হিন্দু-ধর্ম ও হিন্দু-সংস্কৃতি পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হিন্দু-সংস্কৃতির স্বরূপ বুঝিতে হইলে প্রধানত ধর্মের মধ্য দিয়াই বুঝিতে হইবে। হিন্দু-সংস্কৃতিকে আমি ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। জন্ম হইতে মরণোত্তর কর্তব্য-বিধানে হিন্দু যে ছয়টি দেবতার উপাসনা করে, হিন্দু-সংস্কৃতির আংশিক নামকরণে আমি সেই ছয়টি দেবতারই সাহায্য লইয়াছি। হিন্দুর উপাস্য এই ছয়টি দেবতাব নাম—'গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নি বিষ্ণু শিবং শিবা'। গণেশ, সূর্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি। অতএব আমি হিন্দু-সংস্কৃতির বিভাগ বণ্টন করিয়াছি—১. গাণপত্য-সংস্কৃতি, ২. সৌর-সংস্কৃতি, ৩. আগ্নেয়-সংস্কৃতি, ৪. বৈষ্ণব-সংস্কৃতি, ৫. শৈব-সংস্কৃতি ও ৬. শাক্ত-সংস্কৃতি। ইহাদের সংক্ষেপিত পরিচয় এইরূপ—

১. গাণপত্য-সংস্কৃতি—শাস্ত্র বলিয়াছেন 'জ্ঞানং গণেশং'। মানুষের যেদিন হইতে জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, মানুষ বুদ্ধির ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে, মানুষের পঞ্চকৃষ্টি বা পঞ্চজন একত্রে 'গণে' দলবদ্ধ হইয়াছে—সেইদিন হইতেই গাণপত্য-সংস্কৃতির সৃষ্টি। হিন্দুর জ্ঞান-বিজ্ঞানের—তাহার মানস-

সম্পদের মূলে আছে এই গাণপত্য-সংস্কৃতি। হিন্দুর বিদ্যা ও শ্রীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী ও লক্ষ্মী গণেশেরই ভগিনী, সহোদরা। হিন্দুর ললিতকলা এই দেবগোষ্ঠীরই অবদান; উপনিষদের 'দেবজন-বিদ্যা' এই গাণপত্য-সংস্কৃতিরই পরিণতি। সঙ্গীত হইতে সাহিত্য, এমন কি দর্শন পর্যন্ত এই ধারার অন্তর্ভুক্ত। যদিও নিশ্চিতরূপে চিহ্নিত করিবার উপায় নাই, তথাপি একথা বলিতে পারা যায় যে, রাজনীতি, হিন্দুর পারিবারিক প্রথা ও সমাজের আদিমতম বিধিব্যবস্থা এই সংস্কৃতি হইতে উদ্ভূত। কালে গণপতি অপ্রধান হইলেও হিন্দু-সমাজ হইতে তাঁহার প্রভাব অন্তর্হিত হয় নাই। ভারতের—তথা বাঙ্গালার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যেও ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

২. সৌর-সংস্কৃতি—এক হইতে দশম পর্যন্ত সংখ্যা-লিখনপদ্ধতি, যজ্ঞ-কার্যের ও মানবের শুভাশুভ গণনার জন্য দিন, পক্ষ, মাস, বৎসর, গ্রহ, নক্ষত্র, তিথি প্রভৃতির আলোচনামূলক গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ এই সংস্কৃতি হইতে উদ্ভূত। সমাজের সর্বস্তরে ইহার প্রভাব। বেদে মিত্র দেবতা বহু সম্মানিত। ভারতীয় ব্রাহ্মণের সর্বশ্রেষ্ঠ দীক্ষা সাবিত্রী-দীক্ষা। গায়ত্রী-মন্ত্রে সবিতা দেবতারই স্বরূপ প্রকাশিত। অধুনা সমাজে গ্রহাচার্যগণ যতই অবজ্ঞাত হউন, এক সময় তাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয়গণের অন্যতম ছিলেন। বসন্তের মত দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির চিকিৎসাও সৌর-সংস্কৃতির সৃষ্টি। আয়ুর্বিজ্ঞানের কিয়দংশ এই সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

উড়িষ্যার কোণার্কের মন্দির এবং মন্দির-পার্শ্বস্থ মূর্তিনিচয়ে সৌর-সংস্কৃতির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের যে পরিচয় প্রকাশিত, তাহা লইয়া যে-কোন দেশের যে-কোন জাতি গৌরব করিতে পারে। এই মন্দির ও মূর্তি-গোষ্ঠী দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, খ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সৌর-সংস্কৃতির প্রভাব বহু-বিস্তৃত ছিল। বাঙ্গালার নানা স্থানে বহু প্রাচীন সূর্যমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাঙ্গালার পাল ও সেন রাজগণের কেহ কেহ সৌর ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের পল্লীর সর্বশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত 'ইতু পূজা' বা 'মিতু পূজা' মিত্র পূজারই নামান্তর। সূর্যদেব আজিও আরোগ্যের দেবতারূপে পূজাপ্রাপ্ত হন।

৩. আগ্নেয়-সংস্কৃতি—মানুষের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে অগ্নিদেব যেদিন প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় দিন। প্রস্তরে প্রস্তরে ঘর্ষণে অথবা অরণীকাষ্ঠের মন্থনে কিরূপে অগ্নির প্রথম আবির্ভাব ঘটিয়াছিল তাহা ইতিহাসের গবেষণার বিষয়। কিন্তু যেরূপেই তাঁহার

আবির্ভাব ঘটুক, অগ্নিকে যাঁহারা প্রয়োজনীয় কার্যে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই তাঁহাদের সংস্কৃতি অত্যন্ত সমুন্নত ছিল। যজ্ঞবেদী নির্মাণের জন্য ভূ-মিতি ও পরিমিতি শাস্ত্রের উদ্ভব এই সংস্কৃতি হইতেই হইয়াছিল। আয়ুর্বেদ ও ধনুর্বেদের অনেকাংশ এই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এই সংস্কৃতি হইতে রাষ্ট্রনীতি ও অলঙ্কারশাস্ত্র এবং নক্ষত্র-বিদ্যার অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। একখানি পুরাণের নাম অগ্নিপুরাণ।

আর্যগণের অনেকেই সাগ্নিক ছিলেন, তাঁহাদের পৃথক অগ্নি-গৃহ ছিল। প্রতিদিন সেই গৃহরক্ষিত অগ্নিতে সমিধ দান করিতে হইত। আজিও কোন কোন ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠিত নিত্য-হোমে তাহারই শেষ স্মৃতি বর্তমান রহিয়াছে। কবে অভিশপ্ত-অগ্নি সর্বভুক্ হইয়াছেন, কবে আর্যগণের একশাখা অগ্নি-উপাসক পৃথক সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছেন, নিশ্চিত করিয়া জানিবার উপায় নাই। মনে হয় ব্রহ্মার সঙ্গে অগ্নির কিছু সম্বন্ধ ছিল। আজিও পশ্চিমবঙ্গের প্রতি হিন্দুপ্রধান পল্লীতে অগ্নিভয় নিবারণের জন্য চৈত্রমাসের কোন এক নির্দিষ্ট দিনে অগ্নির আরাধনা হয়। ঐদিন ব্রহ্মা-পূজার দিন নামে পরিচিত। শান্তি-স্বস্ত্যয়নে হোম করিতে হইলে মর্তে ব্রহ্মা আছেন কি-না দেখিয়া দিন স্থির করিতে হয়। শাস্ত্র বলেন, 'জয়া পূর্ণা মহীতলে'। জয়া ও পূর্ণা তিথিতে ব্রহ্মা মর্তে অবস্থিতি করেন। ব্রহ্মাও আদিতে পঞ্চবদন ছিলেন। মহাদেবের সঙ্গে বিবাদে তাঁহার একটি মস্তক লুপ্ত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে ব্রহ্মা ব্যাসকে বলিতেছেন—

"আমার আছিল বাছা পাঁচটি বদন।
এক মাথা কাটিয়া লইল পঞ্চানন॥"

এই বিবাদের পৌরাণিক রহস্য আছে এবং ব্রহ্মার এই মস্তকহীনতার সঙ্গে অগ্নিপূজা-লোপেরও সম্বন্ধ আছে।

৪. শৈব-সংস্কৃতি—বৈষ্ণব-সংস্কৃতির কথা সর্বশেষে বলিতেছি। অনেকে বলেন আর্যগণ অথবা আর্যেতর কোন কোন জাতি আদিতে পশুচারক ছিলেন। আমার মনে হয় শৈব ও বৈষ্ণব-সংস্কৃতির সঙ্গে পশুচারক জাতির সম্বন্ধ আছে। শৈব-সংস্কৃতির সঙ্গে কৃষির এবং বৈষ্ণব-সংস্কৃতির সঙ্গে বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। শৈব-সংস্কৃতি হইতে যে লোকগীতি এবং মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার মধ্যে শিবের কৃষিকার্য একটি প্রধান উপাখ্যান। শৈব-সংস্কৃতি বহু প্রাচীন এবং অতীতে শিবোপাসক জাতিই

কৃষির আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহারাই যোগমার্গের প্রবর্তক। চিকিৎসা-কার্যে মুক্তা, প্রবাল, পারদ, স্বর্ণাদি ইহারাই প্রথম ব্যবহার করেন। ঔষধার্থে হলাহলের প্রয়োগও এই সংস্কৃতির অন্যতম দান।

জাতিগঠনেও এই সংস্কৃতির অবদান বড় অল্প নহে। সমাজের আপাদ-মস্তক—চণ্ডাল হইতে ব্রাহ্মণ পর্যন্ত সকলেই শিবপূজায় অধিকারী। স্মরণাতীত কাল হইতে এই সংস্কৃতির মধ্যে শুদ্ধি-আন্দোলন অত্যন্ত ব্যাপকভাবে অন্তঃপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। গত ১৩২৮ সালের তৃতীয় সংখ্যক পরিষৎ-পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় আচার্য হরপ্রসাদের 'মহাদেব' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় এই শুদ্ধির বিবরণ দিয়াছেন। সেকালে একদল ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা 'যাযাবর'। তাঁহাদের গোত্রই ছিল 'যাযাবর'। ঋষি জরৎকারু প্রভৃতি 'যাযাবর' গোত্রের ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের দলকে 'ব্রাত' বলিত, দলভুক্ত সকলেই 'ব্রাত্য' ছিলেন। দুই-চারি দিনের জন্য ইঁহারা যেখানে থাকিতেন সেই স্থানকে 'ব্রাত্যা' বলিত। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—"পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ বলে ব্রাত্যেরাও ঋষিদের মত দৈব প্রজা অর্থাৎ দেবতাদের উপাসক। তবে তাহাদের দেবতারা স্বর্গে গিয়াছেন। মরুৎ দেবতারা তাহাদিগকে কতকগুলি সামগান শিখাইয়া দিয়াছিলেন। সেই গান করিলে তাহারা দেবতাদের খুঁজিয়া পাইত। সেই গানগুলির নাম 'ব্রাত্যস্তোম'। যে যজ্ঞে ব্রাত্যস্তোম গান হইত তাহার নামও ব্রাত্যস্তোম। অন্য অন্য যজ্ঞে ঋত্বিক ছাড়া একজন মাত্র যজমান থাকে, দুইজন যজমানের কথা বড় দেখা যায় না। কিন্তু ব্রাত্যস্তোমে যজমান হাজার হাজার হইতে পারে। আর সকলেই ব্রাত্যস্তোম করিয়া পবিত্র হইয়া যাইত ও ঋষিদের সঙ্গে সমান হইয়া যাইত। ব্রাত্যস্তোমের পর ঋষিরা ব্রাত্যদের সঙ্গে একত্রে খাইতেন, তাহাদের হাতের রান্না খাইতেন। তাহাদিগকে বেদ পড়িতে দিতেন, তিন বেদই পড়িতে দিতেন, তাহাদিগকে ঋত্বিক দিতেন, মোটামুটি তাহাদিগকে আপনাদের সমান করিয়া লইতেন"। এই ব্রাত্যদের দেবতা ছিলেন শিব। পূর্বে ব্রাত্যস্তোম অর্থাৎ শুদ্ধিযজ্ঞ যখন তখন হইত। পরে একটি নির্দিষ্ট দিনে শুদ্ধিযজ্ঞ সুরু হয়। আজিও বৎসরের শেষে চৈত্র সংক্রান্তির পূর্বদিন শিবের গাজনের দিন। এই দিনের নাম 'হোমপর্ব'। শিবের গাজনে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত ভক্ত হইতে পারে এবং উত্তরীয় সূত্র (উপবীত) গলায় দিয়া গাজনের কয়দিন সকলেই সমান হইয়া যায়। ইহাদের মূলমন্ত্র—

'মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবা শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্।'

সমগ্র ভারতের এবং ভারতের বাহিরেও এই সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, তক্ষণশিল্পে, সঙ্গীতে, কাব্যে, সাহিত্যে, দর্শনে, জীবিকার অবলম্বনে, সমাজ-ব্যবস্থায় এবং রাষ্ট্রনীতিতে এই সমুন্নত সংস্কৃতির প্রভাব সর্বত্র সুপরিস্ফুট।

৫. শাক্ত-সংস্কৃতি—শৈব-সংস্কৃতির এবং বৈষ্ণব-সংস্কৃতির সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। ভারতীয় দর্শনে প্রকৃতিবাদ বা শক্তিবাদ এই সংস্কৃতি হইতে উদ্ভূত। এই সংস্কৃতি সমাজের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়াছিল এবং সমাজে এখনও ইহার প্রভাব অপ্রতিহত। এই সংস্কৃতি সমাজের বিভিন্ন স্তরগুলি এক অখণ্ড যোগসূত্রে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ভারতব্যাপী নবরাত্র-উৎসব এবং বাঙ্গালার দুর্গোৎসব প্রকৃতই জাতীয় উৎসব। দুর্গোৎসবে সাহিত্য ও দর্শনের সঙ্গে কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যেরও সমবায় সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কামার, কুমার, ছুতার, মালাকার হইতে আরম্ভ করিয়া মুচি হাড়ি ডোম চণ্ডাল পর্যন্ত এই উৎসবে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছিল। হিন্দু-জাতির সর্বসম্প্রদায়-সম্মেলনের এমন উৎসব বাঙ্গালায় আর দুইটি নাই। কিন্তু বর্তমানে অর্থাভাব হেতু এবং আরও নানা কারণে এই উৎসবের প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হইলে এই সমস্ত উৎসবে নূতন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। শাক্ত-সংস্কৃতির ফলে বাঙ্গালার সঙ্গীত, কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি, রাজনীতি ও সমাজনীতি যথেষ্ট সমৃদ্ধ হইয়াছিল। শাক্তগণ চিন্ময়ী জননীকে মৃন্ময়ীর সঙ্গে একাত্মপীঠে মিলাইয়া এই নদী, পর্বত, বনানী ব্যবধানবহুল ভারতবর্ষকে এক অখণ্ড ঐক্যে আবদ্ধ করিয়াছিল।

৬. বৈষ্ণব-সংস্কৃতি—এই সংস্কৃতিও বহু পুরাতন। বেদ এবং তন্ত্রের সমন্বয়ে এই সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছিল। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, অধর্ম নিবারণ এবং ধর্ম-সংস্থাপন এই সংস্কৃতির অন্যতম আদর্শ। শৈব-সংস্কৃতির মূলমন্ত্র যেমন 'যত্র জীব তত্র শিব', এই সংস্কৃতির মূলমন্ত্রও তেমনই মানব-প্রেম, সর্বভূতে সমদর্শন। পরাধীনতার মধ্যে জাতি গঠিত হয় না। জাতিকে স্বারাজ্য-সংসিদ্ধি লাভ করিতে হইলে পঞ্চবিধা মুক্তি অর্জন করিতে হইবে, ইহাই বৈষ্ণব দর্শনের বাণী। জাতিগঠনে এই পঞ্চবিধা মুক্তি অবশ্য প্রয়োজনীয়।

জাতিগঠনে প্রথম প্রয়োজন 'সাষ্টি'—সমান ঐশ্বর্য। অর্থনৈতিক ভিত্তিই ইহার মূল। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, সকলকে সমানভাবে সমাজের ঐশ্বর্য কোন নির্দিষ্ট দিনে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। বণ্টন করিয়া দিলেও সকলের রাখিবার সামর্থ্য সমান নয়, ব্যয়ের বুদ্ধিও সমান নয়, ন্যায়সঙ্গত নয়। সুতরাং সমাজের মধ্যে অর্থ-প্রবাহের নিয়মানুগত প্রণালী থাকা চাই, শ্রমের মর্যাদা চাই, বিনিময়ের বিধিসঙ্গত ব্যবস্থা চাই, আদান-প্রদানের শুভবুদ্ধি চাই, সহযোগিতা চাই। সমাজের মধ্যে সকলেই যেন প্রতিভা-প্রকাশের, যোগ্যতা প্রদর্শনের ক্ষেত্র পায়। সমাজে কেহ যেন উপেক্ষিত না হয়।

দ্বিতীয় মুক্তি 'সালোক্য'—সমান দেশ। একদেশের অধিবাসীকে লইয়া জাতিগঠনে যেমন সুবিধা হয়, ভিন্ন দেশের অধিবাসীকে লইয়া তেমনই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এই দিক দিয়া ভৌগোলিক ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হিন্দুগণ তীর্থের সৃষ্টি করিয়া যদিও খণ্ড ভারতকে অখণ্ড মহাভারতে পরিণত করিয়াছিলেন, তথাপি জাতিগঠনে সালোক্য মুক্তি অবশ্য প্রয়োজনীয়।

তৃতীয় মুক্তি 'সামীপ্য'—একদেশে বাস চাই, সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বন্ধনে বা অন্যবিষয়েও আদান-প্রদানে জাতির মধ্যে পরস্পরের নৈকট্য থাকা চাই। তীর্থযাত্রায়, পার্বণে, উৎসবে, নানা উপলক্ষে নানারূপ সম্মেলনেও এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। 'মেলা' এই উদ্দেশ্য সাধনের সর্বপ্রধান-সহায়ক।

চতুর্থ মুক্তি 'সারূপ্য'—জাতিগঠনে সমান রূপ চাই। কিন্তু আকার সকলের সমান হয় না, সুতরাং সবর্ণের আবশ্যকতা আছে। সেক্ষেত্রেও বৈষম্য ঘটিলে পরিধেয় সমান হওয়া আবশ্যক। এই জন্যই জাতীয় পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। আজিকার দিনে এই কথাটি বিশেষভাবে চিন্তনীয়।

পঞ্চম মুক্তি 'সাযুজ্য'— পঞ্চবিধা মুক্তির কোনটিই উপেক্ষণীয় নয়। জাতিগঠনে ভাব-সাযুজ্যের প্রয়োজনীয়তাও প্রচুর। একভাষা না হইলে ভাব-সাযুজ্য ঘটে না। দেশের ব্যবধান থাকিলেও যদি পরিচ্ছদ এবং ভাষার ঐক্য থাকে, তাহা হইলেও জাতিগঠনে ব্যাঘাত ঘটে না। এমন কি, এক ভাষার ঐক্যেই জাতীয়তা সংরক্ষিত হইতে পারে। সংস্কৃতিরক্ষার মূলেও আছে ভাষা। ভাষাই সাহিত্য সৃষ্টি করে, সংহতি রক্ষা করে, জাতিকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে। যে জাতি নিজস্ব ভাষা ভুলিয়াছে তাহার দুর্ভাগ্যের অন্ত নাই। বৈষ্ণব-সংস্কৃতি আমাদিগকে এই মহান্ শিক্ষা দান করিয়াছেন। বৈষ্ণব-সংস্কৃতির

মধ্যেও শুদ্ধির স্থান অপ্রধান নয়। শক, হূণ, এমন কি গ্রীক যবনেরাও বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।

সৌন্দর্যবোধ এবং রুচির দিক দিয়া বৈষ্ণব-সংস্কৃতির অবদান সুপ্রচুর। রাজনীতি, সমাজনীতি, কাব্য, সঙ্গীত, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষিও বৈষ্ণব-সংস্কৃতির ফলে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হইয়াছিল। এই সংস্কৃতিকে বাঙ্গালীর প্রেমের ঠাকুর, কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীমন্ মহাপ্রভু এমন এক দিব্যমহিমায় মণ্ডিত করিয়াছিলেন, বাস্তবতার এমন এক অমৃতলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যাহা পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন। মানুষের ইতিহাসে অভিনব।

দেশাত্মবোধ

অতীত কালে দেশাত্মবোধ শব্দটি হয়তো ছিল না। কিন্তু দেশও ছিল, দেশের প্রতি মমত্ববোধও ছিল। তবে বোধটার রকম ছিল ভিন্ন। কোন্ স্মরণাতীত কালে জানি না, ভারতের শক্তি-উপাসকসম্প্রদায় অনুভব করিয়াছিলেন এই মৃন্ময়ী ভূমি চিন্ময়ীর দেহসংস্রবে পবিত্র। তন্ত্রের ঋষি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন —হিঙ্গলাজ হইতে কামাখ্যা, কাঞ্চী পর্যন্ত ভূমি ব্রহ্মময়ীর দেহাংশ বক্ষে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। ভারতের সমগ্র ভূমিখণ্ডে অখণ্ড ব্রহ্মের খণ্ডাংশ ছড়াইয়া আছে। কন্যাকুমারিকায় অনন্ত নীলাম্বুধির তরঙ্গচুম্বিত ভূমিখণ্ডে প্রতীক্ষারতা কুমারী দেবীর পরিকল্পনা আর্যঋষির অন্তরেই প্রথম জাগ্রত হইয়াছিল।

কে অগ্রে কে পশ্চাতে জানি না, অখণ্ড ভারতের পরিকল্পনায় শৈব সম্প্রদায়ের অবদানেরও কি তুলনা আছে? সেতুবন্ধ হইতে চট্টল ইহারা এক সূত্রে গাঁথিয়াছিলেন। যেখানে যেখানে দেবীর দেহাংশ পতিত হইয়াছে, সেই সেই ক্ষেত্রেই দেবাদিদেব মহাদেব ভৈরবরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। বাহ্য-দৃষ্টিতে সম্প্রদায় পৃথক হইলেও শৈব এবং শাক্ততীর্থ বহুস্থানে প্রায় একত্রেই অবস্থিত দেখিতে পাই। তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাঁহারাই গিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়াছেন, কাশীধামে বিশ্বেশ্বরকে সকল সম্প্রদায়ই পূজা করিতেছেন। সেখানে আর্যাবর্ত দাক্ষিণাত্য বলিয়াও কোন প্রাদেশিকতা নাই।

পিতৃকৃত্য সম্পাদনের জন্য গয়াধামে গিয়াও দেখিয়াছি, সেখানেও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কোন পার্থক্য নাই। কোনরূপ প্রাদেশিকতাও নাই। বিষ্ণুপাদপদ্মে হাত রাখিতে গিয়া কাহার হাতে কাহার হাত ঠেকিল সে বিচারও কেহ করে না। প্রাচীন কলিঙ্গে যাজপুরে নাভিগয়া, দাক্ষিণাত্যে পাদগয়া আছে। পিতৃ-মাতৃঋণ পরিশোধকামীকে এই দুই গয়াতেও যাইতে হয়। ভারতে বৈষ্ণব-তীর্থও অসংখ্য। আজকাল শখের দেশভ্রমণকারীর সংখ্যাই বেশী। তীর্থকৃত্য সম্পাদনের জন্য খুব কম লোকই তীর্থে গমন করেন। সুতরাং তীর্থের মর্যাদাও শিক্ষিত সমাজের নিকট কমিয়া গিয়াছে।

মহাভারতে রাজসূয় যজ্ঞের উল্লেখ আছে। আপন আধিপত্য বিস্তারই এ যজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিল না। যতদূর সম্ভব একই অনুশাসনে সমগ্র ভারতকে একসূত্রে গাঁথাই ইহার গূঢ়তম উদ্দেশ্য ছিল। অতীতে এই উদ্দেশ্যেই অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত। যজ্ঞাশ্ব যথেচ্ছ ভ্রমণ করিত, কোন রাজ্যের মধ্যে এই অশ্ব উপস্থিত হইলে কোন বীরত্বাভিমানী রাজ্যেশ্বর, রাজকুমার অথবা সেনাধ্যক্ষ ইচ্ছা করিলে যজ্ঞাশ্ব ধরিতে পারিত এবং সেইজন্য যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিত। তথাপি কেবলমাত্র জিগীষাই অশ্বমেধের একমাত্র কারণ মনে করিলে অন্যায় হইবে।

আজকাল পুরাণপাঠ উঠিয়া গিয়াছে। যাঁহারা পুরাণ অথবা মহাভারত কিংবা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া বেড়াইতেন, তাঁহাদের বংশ লোপ পাইয়াছে। অর্থাৎ সেই কথকশ্রেণীর বংশধরগণ বাধ্য হইয়াই অন্য বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। কথকেরা যে মহান্ শিক্ষা গ্রামে গ্রামে বিলাইয়া বেড়াইতেন, সেই শিক্ষা দেশ হইতে লোপ পাইয়াছে, অথচ তাহার স্থান অধিকার করিতে পারে, এমন কোন বিকল্প ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয় নাই। একমাত্র কথকশ্রেণীর অভাবে দেশ যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, সে ক্ষতির তুলনা হয় না। সাধারণের ধারণা পুরাণগুলি অলীক গাল-গল্পে পরিপূর্ণ। ঐতিহাসিকগণ পাথুরে প্রমাণের সন্ধানে পুরাণ মাত্রকেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়াছেন। ইংরাজীনবীশগণের তো দুই চক্ষের বিষ পুরাণ। ইহাকে দেশের দুর্ভাগ্যই বলিব। পুরাণ না পড়িলে ভারতবর্ষকে জানা যাইবে না, চেনা যাইবে না, বুঝা যাইবে না। ভারতের সমাজতত্ত্ব, ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অর্থ বুঝিতে হইলে পুরাণ অবশ্যই পড়িতে হইবে। ধূয়া উঠিয়াছে, পুরাণ সব অর্বাচীনকালে রচিত, পুরাণে প্রক্ষেপ ঘটিয়াছে প্রচুর। কিন্তু ইঁহারা জানেন না, একখানি পুরাণ অন্য পুরাণের পরিপূরক। এক পুরাণে যে তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহারই

অনুশীলিত সুসার্থক ভাষ্য আছে অন্য পুরাণে। এক্ষেত্রে কালবিচারের কোন প্রয়োজন নাই। দেখিতে হইবে এক পুরাণের রহস্য অন্য পুরাণে কেমন উৎকর্ষের সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। হিন্দুসমাজের স্তরবিন্যাস ও জাতির মানসিক প্রকর্ষের পর্যালোচনায় ইহার উপযোগিতা শিক্ষিত সমাজের নিকট অবহেলিত হইয়াই রহিল। পুরাণে বিরোধ অপেক্ষা সমন্বয়ের, বৈচিত্র্যের মধ্যেই মহান্ ঐক্যের চিত্রই অধিকতর বিকাশ লাভ করিয়াছে।

আমি অন্যের দোষ দেখাইয়া নিজের দোষ ক্ষালনের চেষ্টা করিতেছি না। দুর্বলতা আমাদের মধ্যেও প্রচুর আছে। কিন্তু অন্য জাতির মধ্যেও তো এই দুর্বলতার অভাব নাই। উদাহরণস্বরূপ সিয়া-সুন্নীর দ্বন্দ্ব, ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টের দ্বন্দ্বের উল্লেখ করিতে পারি। কিন্তু ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য অধিকাংশ পুরাণই দ্বন্দ্ব অপেক্ষা ঐক্যের পথেই অগ্রসর হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে শৈব-বৈষ্ণবে দ্বন্দ্ব ছিল, বাংলায় শাক্ত-বৈষ্ণব দ্বন্দ্বে মাতিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিতেছি না। তাই বলিয়া পুরাণকে দোষ দিয়া ঢাকীসুদ্ধ বিসর্জনের সার্থকতা কি ?

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম দিকে একটা শ্লোক খুবই মুখস্থ ছিল। এতদিনে তাহার সবটা স্মরণ করিতে পারিতেছি না। প্রথম দুই ছত্র স্মরণ আছে—

যস্য প্রান্তে সমুদ্রাঃ সুবিষমচপলা শৈলমালা বিশালা।
রাজন্তে যত্র নদ্যা সুবিমলসলিলা শ্যামলা শস্যমালা ॥

সুবিশাল এবং সুবিচিত্র দেশ এই ভারতবর্ষ। সাগরাম্বরা, নদীমেখলা, কাননকুন্তলা—পর্বত-প্রান্তরব্যবধানবহুল এই ভারতবর্ষকে একতাসূত্রে গাঁথিয়াছিল ভারতের তীর্থক্ষেত্র। নূতন ব্যাখ্যায় তীর্থমাহাত্ম্যের যুগোপযোগী ভাষ্য আর রচিত হয় নাই। এমন কোন প্রচারক, এমন কোন ব্রতধারীকে দেখিলাম না, যিনি মানুষের মনে একাত্মতাবোধ জাগ্রত করিতে বদ্ধপরিকর। বাঙ্গালার সরকার দীঘার সৌষ্ঠবসাধনে ব্যগ্র, অর্থের অপব্যয়েও কুণ্ঠিত নহেন। ভারত সরকারের হয়তো দীঘা হইতে আরো আরো তা-বড় তা-বড় দীঘা গড়িবার পরিকল্পনা আছে। কিন্তু সেকুলার স্টেটের পক্ষে তীর্থসংস্কারে অর্থব্যয় বোধ হয় অমার্জনীয় অপরাধ। হউক বম্পাস টাউন, সেটা তবু বৈদ্যনাথধামের এলাকাতেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমি মূলেই ভুল করিতেছি। মানুষের মন হইতে ধর্মভাব চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে। নরনারী আর ধর্মের বন্ধনে বাঁধা থাকিতে চাহে না। তাহারা ধর্মত্যাগকেই বন্ধনমুক্তি বলিয়া মনে করে।

দুঃখ হয় আপন গৃহের রত্নভাণ্ডারের দিকে এখন কেহ ফিরিয়াও চাহে না। ছোট গল্প, উপন্যাস আর সিনেমা লইয়াই লোকে উন্মত্ত। যে দেশের কবি কোন্ স্মরণাতীত কালে উচ্চারণ করিয়াছিলেন—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' সেই দেশের লোককে আজ দেশাত্মবোধ বুঝাইতে হয়।

অপহৃতা জানকীকে উদ্ধারের জন্য শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছেন। সীতার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সাগরে সেতু বাঁধা হইয়াছে। বানরসৈন্য লইয়া শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ধার্মিক বিভীষণ আসিয়া রামচরণে শরণ লইয়াছেন। তুমুল যুদ্ধে রাবণের বংশ ধ্বংস হইয়াছে। শেষে রামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়া লঙ্কাসিংহাসনে বিভীষণের অভিষেকের উদ্যোগ করিতেছেন। বিভীষণ সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন, শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কাসিংহাসনে আরোহণ করিলেই বিভীষণ সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ লাভ করিবেন। ইহার প্রতি-উত্তরে রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন—

ইয়ং স্বর্ণপুরী লঙ্কা সখে মহ্যং ন রোচতে।
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ॥

সমাজ

ধর্মানুষ্ঠানের প্রধানতম ক্ষেত্রের নাম সমাজ। যেখানে কতকগুলি নরনারী পরস্পরের মুখাপেক্ষী হইয়া বসবাস করেন সেইখানেই সমাজ গঠিত হয়। হাটে বহু লোক একত্রিত হয়, গঞ্জে ব্যবসায়ের জন্য বহু লোক বাস করে, কিন্তু হাট ও গঞ্জকে কেহ সমাজ বলে না। মেলায় কয়েকদিন ধরিয়া বহু নরনারী একত্রে মিলিত হইয়া থাকে, কিন্তু মেলা কখনো সমাজ নামে অভিহিত হয় না। সমাজের কতকগুলি অবশ্য প্রতিপাল্য অনুশাসন থাকে। লিখিত ও অলিখিত, এই অনুশাসনের দ্বিবিধ রূপ। লিখিত রূপ শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ, আর পরস্পরের সম্মতিক্রমে অধিকাংশ মানুষের সুবিধার জন্য, মঙ্গলের জন্য যে প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে, অথচ যাহার লিখিত কোন দলিল নাই, তাহাই ইহার অলিখিত রূপ। পূর্বে এই উভয়বিধ অনুশাসনই সামাজিকগণ পালন করিতেন বলিয়া লোকচিত্তে সমাজের প্রভাব-প্রতিপত্তিও প্রচুর ছিল।

অনেকে আপন ইচ্ছাতেই ইষ্টাপূর্তের অনুষ্ঠান করিতেন। অনেকে আবার সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের জন্যই ঐ সমস্ত কার্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন। পশ্চিমবঙ্গে এমন অনেক গ্রাম দেখিয়াছি যে, গ্রামের বৃহৎ জলাশয়, উচ্চ দেব-মন্দির প্রভৃতি আজিও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রামের কেহ মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারে, অথবা রাজনগর রাজসরকারে উচ্চপদে কাজ করিতেন। সেকালের মানুষের সহরবাসের নেশা ছিল না। চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ পূর্বক তাঁহারা গ্রামে আসিয়াই বাস করিতেন। গ্রামে আসিয়া প্রথমেই তাঁহারা সমাজে পাংক্তেয় হইবার জন্যই প্রয়াস পাইতেন। আর তাহারই প্রধান উপায় ছিল গ্রামে জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা, কূপ-প্রতিষ্ঠা, দেবমন্দির-প্রতিষ্ঠা, চতুষ্পাঠী-স্থাপন প্রভৃতি ইষ্টাপূর্তের অনুষ্ঠান। আজ মানুষকে বৃক্ষরোপণের জন্য অনুরোধ জানাইতে হয়। সরকার উৎসব করেন বনমহোৎসব। হুজুগে পড়িয়া কয়েকটি বৃক্ষ রোপিত হয়। কিন্তু পরবর্তী বৎসরে তাহারা আর জন্মদিনের মুখ দেখে না। বড় বড় দীঘি মজিয়া ভরাট হইয়া গেল, পঙ্কোদ্ধার করিবার লোক নাই। কংগ্রেস সরকার যদি সমস্ত দীঘির সংস্কার-সাধন পূর্বক মাছের চাষের ব্যবস্থা করিতেন, বাঙ্গালীর কয়েক হাজার লোকই মাছ খাইতে পাইত। সরকারের তো জেলায় জেলায় অনেক বিভাগ আছে। শুনিয়াছি মৎস্যবিভাগও আছে। বিভাগের কর্তৃপক্ষ কি কাজ করিতেছেন জানি না। গ্রামের প্রাণকেন্দ্র ছিল যে দেবালয়, প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। দেবালয়ে দেবতা নাই। সকাল-সন্ধ্যায় কাঁসর-ঘণ্টা-শঙ্খধ্বনি আর শুনিতে পাই না। গ্রামের পবিত্র আবহাওয়াই বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সমাজ এবং সামাজিক শব্দ দুটি যে কত প্রাচীন, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। সামাজিক কথাটাই ছিল কত গৌরবের। বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারে নাই দেশ, জাতি পরাধীন হইয়াছে। কিন্তু এই পরাধীন জাতিটা যে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, সে শুধু ঐ সমাজেরই কল্যাণে। সমাজ ছিল বলিয়াই জাতিটা আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

মহামহোপাধ্যায় আচার্য হরপ্রসাদ একদিন গল্প করিয়াছিলেন—রাঢ়ের সিদ্ধল-গ্রামীন ভবদেব ভট্ট একটা বড় কাজ করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ববঙ্গের মহারাজ হরিবর্ম দেবের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। কিন্তু রাঢ়দেশকে বিস্মৃত হন নাই। শস্ত্র ও শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ অধিকার ছিল এবং তিনি বৌদ্ধগণকে দুই চোখে দেখিতে পারিতেন না। তাই দেশকে বৌদ্ধপ্রভাব-মুক্ত করিবার জন্য তিনি

বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। নবশাখ জাতি তাঁহারই সৃষ্টি, তিনি সমাজে ইহাদের বৃত্তি বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। আর বিশেষ কথা, তিনি ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের শাসনে আনিয়াছিলেন। দেখাদেখি শুঁড়ি, কলু, স্যাকরা এমন কি সেকালের যোদ্ধজাতি মল্ল বা বাগদীরাও পুরোহিত লাভের সম্মান পাইয়াছিল। আমি অনুসন্ধানে জানিয়াছিলাম শাস্ত্রী মহাশয়ের গল্পটার মূলে সত্য আছে। দেশে এখনো শুঁড়ির বামুন, কলুর বামুন, স্যাকরার বামুন, বাগদীর বামুন, মুচির বামুন প্রভৃতি উপবীতধারী ব্রাহ্মণ আছেন।

সমাজে প্রতি জাতির কুল ক্রমাগত অবলম্বনীয় সুনির্দিষ্ট বৃত্তি ছিল। আজি আর সে দিন নাই। বর্ণসঙ্করের সৃষ্টির সঙ্গে বৃত্তিসাঙ্কর্যও সমাজকে বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছে। লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে প্রবল বন্যার মত—বৈদেশিক সংঘাতে সমাজ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। বংশগত বৃত্তিতে এই দুর্দিনে কাহারো দিন গুজরান হয় না। বাধ্য হইয়া চট্ট চটির দোকান খুলিয়াছেন। সমাজজীবন লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছে। লঙ্কাকাণ্ডে সমাজ পুড়িয়া ছারখার হইয়াছে।

সমাজদেহে মুখ্য স্থান ছিল ব্রাহ্মণের, তিনি সমাজের মুখ ছিলেন। ক্ষত্রিয় ছিলেন বাহু, উরুযুগল বৈশ্য, আর পদদ্বয় ছিলেন শূদ্র। এই সমাজ বিন্যাসের অনেকেই নিন্দা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ জন্মিয়াছেন ব্রহ্মার মুখ হইতে, অনেকের মতে ইহা পক্ষপাতদুষ্ট কথা। এ কথা যাঁহারা বলেন তাঁহাদিগকে আর একটি বচন শুনাইতেছি। শ্রীভগবান ভক্ত উদ্ধবকে বলিতেছেন—

গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্যং হৃদোমম।
বক্ষঃস্থলাদ্ বনে বাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসিস্থিতঃ।

—শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৭।১২

আমার জঘন হইতে গৃহস্থাশ্রম, হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্যাশ্রম, বক্ষস্থল হইতে বানপ্রস্থাশ্রম এবং শিরোদেশ হইতে সন্ন্যাসাশ্রমের উদ্ভব হইয়াছে। জঘন তো পশ্চাদ্দেশ, তাহা হইলে গৃহস্থাশ্রমকে কি জঘন্য বলিব? সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই অপরিহার্য। চরিত্রম হিমায় কত শূদ্র যে আজিও ব্রাহ্মণের পূজা পাইতেছেন, ঐতিহাসিকগণ তাহার সাক্ষ্য দিবেন। গ্রামে পরস্পর পরস্পরের সহযোগী ছিলেন। প্রতিযোগিতা ছিল না, এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু তাহা ব্যাপক ছিল না। অনেক স্থলে প্রতিযোগিতা ছিল অন্য রকমের। তুমি একটা পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিলে, অতএব আমাকেও একটা পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা

করিতে হইবে। তুমি শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছ, আমি বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা করিব। অনেক সময় এইরূপ লোক-কল্যাণকর প্রতিযোগিতা ছিল।

আমরা না জানিয়া অনেক কথা বলি। বিধিনিষেধ শাস্ত্রেই আছে, আমরা কোন্‌টা পালন করি! শাস্ত্রে যেমন ব্রাহ্মণের প্রশংসা আছে, তেমনি ব্রাহ্মণের অপকর্মের নিন্দাও আছে। মহর্ষি অত্রি ব্রাহ্মণগণকে দশটি শ্রেণীতে স্থান দিয়া গিয়াছেন। দেব, মুনি, দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল ব্রাহ্মণ এই দশ শ্রেণীতে বিভক্ত।

১. সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, দেবপূজা, অতিথিসেবা ইত্যাদির অনুষ্ঠাতা দেবব্রাহ্মণ।

২. উপরোক্ত গুণযুক্ত যে ব্রাহ্মণ ফলমূলাশী বনবাসী, তিনিই মুনিব্রাহ্মণ।

৩. দেবব্রাহ্মণের সমস্ত গুণযুক্ত যিনি নিষ্কাম কর্মে রত হইয়া আত্মানুসন্ধান-পূর্বক বেদান্ত ও সংযোগাদি দ্বারা তাহার অনুশীলন করেন তিনিই দ্বিজব্রাহ্মণ।

৪. ক্ষত্রিয়াচাররত অস্ত্র ও শস্ত্রধারী ভোগাভিলাষী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণ।

৫. বৈশ্যোচিত আচারনিরত কৃষিজীবী গোপালক ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ বৈশ্যব্রাহ্মণ।

৬. লাক্ষা, লবণ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, মাংসাদি বিক্রয়কারী ব্রাহ্মণ শূদ্রব্রাহ্মণ।

৭. চোর (প্রবঞ্চক) তস্কর (পরস্ব-হরণকারী) মৎস্যমাংস-লোলুপ, পরের অনিষ্টকারী ব্রাহ্মণ নিষাদব্রাহ্মণ।

৮. ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকলাপ করে না, ব্রহ্মতত্ত্বও জানে না, অথচ উপবীত ধারণ করে, সে পশুব্রাহ্মণ।

৯. ব্রাহ্মণোচিত আচারবিরহিত শাস্ত্রজ্ঞানহীন যে ব্রাহ্মণ পরোপকারার্থ প্রদত্ত বাপী, কূপ, তড়াগ, আরামাদি অবরোধ করে সে ম্লেচ্ছব্রাহ্মণ।

১০. যে ব্রাহ্মণ ক্রিয়াহীন, শাস্ত্রজ্ঞানহীন, শঠ, সর্বপ্রকার বৈদিক ধর্ম-বর্জিত, শিশ্নোদরপরায়ণ সে চণ্ডালব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ জাতির অধঃপতন ঘটিয়াছে বলিয়াই আজ সমাজের এমন দুর্দশা। সমাজে তো এখন ম্লেচ্ছ ও চণ্ডালব্রাহ্মণেরই আধিক্য এবং আধিপত্য। কলকারখানায় যাহারা কাজ করে, তাহারা শৌচ-সদাচারের কোন সংবাদ রাখে না। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, আর যে কোন লোকের হাতে ভোজন এক কথা নয়। কিন্তু কর্মব্যপদেশে যাহাদিগকে দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় তাহাদের এত সব বিধিনিষেধ মানিবার অবসর কোথায়? আমার

বলিবার কথা, যাহা ছিল তাহা তো ভাঙ্গিয়াছ, কিন্তু তাহার শূন্য স্থানে কাহাকেও তো আনিলে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আপন বিবেকের দোহাই দিয়া মানুষ এত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে যে, দেখিলে ভয় হয়, পরিণাম চিন্তায় কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। গ্রামের গ্রামত্ব যাইতে বসিয়াছে, সেই সঙ্গে সমাজেরও গয়াপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহার পর? পাঁচজনকে মিলিয়া-মিশিয়া একত্রে বাস করিতে হইলে মিলনের একটা সূত্র চাই তো? তাহাকে বন্ধন বলিয়া ঘৃণা করিলে চলিবে কেন?

ভারতের প্রতিনিধি

ঋষি, সন্ন্যাসী এবং সম্রাট—স্মরণাতীত কাল হইতেই এই তিন সম্প্রদায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন। ইহাদের সে অধিকার এবং যোগ্যতাও ছিল সর্বজনস্বীকৃত।

অপৌরুষেয় বেদ ঋষিহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছেন। ঋষিগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন মন্ত্রমালাকে, তাই তাঁহাদের নাম হইয়াছে ঋষি বা দ্রষ্টা। ঋষিগণই এককে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বহু রূপে এবং বহুর মধ্যেই একের উপলব্ধি লাভ করিয়াছেন। ভারতের নদ-নদী অরণ্য-পর্বত পবিত্র, ভারতের ভূমি পুণ্যভূমি, ইহা ঋষিগণই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। ঋষিগণই বলিয়া গিয়াছেন—ভারতের মানব পৃথিবীর সর্বমানবের অগ্রজ, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নরনারী ভারতীয় মানবের আচরণ হইতেই শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

ঋষিই বেদকে বিভক্ত করিয়াছেন। বেদাঙ্গ, বেদান্ত ও দর্শনাদির প্রণয়নকর্তাও ঋষি। বেদার্থ উপবৃংহিত পুরাণ-ইতিহাসের রচয়িতাও ঋষিগণ। নানান্ আখ্যান ও উপাখ্যান সংকলনপূর্বক ঋষিগোষ্ঠীই সন্নিবেশিত করিয়াছেন পুরাণে। পুরাণকার গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী নদীকে নিত্য স্মরণীয় করিয়া রাখিলেন। হিংলাজ হইতে কামরূপ, রামেশ্বর হইতে চট্টল তীর্থ বলিয়া প্রচার করিলেন। শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে পবিত্রীকৃত গয়াধাম সর্বভারতীয় তীর্থগৌরব লাভ করিল। শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা, সুদামাপুরী, দ্বারকা মহাতীর্থরূপে পরিগণিত হইল। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা এবং দ্বারাবতী ভারতের সপ্তধাম কীর্তিত হইল মোক্ষদায়িকারূপে।

একটা উদাহরণ দিই। পুরাণ বর্ণনা করিলেন—প্রজাপতি দক্ষ শিবরহিত যজ্ঞ করিয়াছিলেন। শিব-সহধর্মিণী দক্ষ-দুহিতা বিনা নিমন্ত্রণেই পিতৃযজ্ঞে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পিতা দক্ষের মুখে শিবনিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিলেন। শোকোন্মত্ত শিব দক্ষযজ্ঞের ধ্বংসসাধনপূর্বক সতীদেহস্কন্ধে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেবগণের অনুরোধে বিষ্ণু সুদর্শনচক্রে ব্রহ্মময়ীর দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভারতের নানাস্থানে ভূতলে ফেলিলেন। যেখানে যেখানে সতীর দেহাংশ ভূপতিত হইল, সেই সেই স্থানই হইল মহাতীর্থ, মহাপীঠ। মৃন্ময়ীর সঙ্গে চিন্ময়ীর মিলন ঘটিল। এইরূপে পুরাণকার সমগ্র ভারতকে ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া ফেলিলেন। জ্যোতির্বিদগণ অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন এই উপাখ্যানের। তাঁহারা বলেন—পূর্বে নক্ষত্রসংখ্যা ছিল আটাশটি। আটাশ নক্ষত্রে মাস-গণনা বিজ্ঞানসম্মত হইতেছিল না। তাই দক্ষ-কন্যাগণের সাতাশটি নক্ষত্রের পাণিগ্রহণ করিলেন চন্দ্র। আর একটি অতিরিক্ত নক্ষত্র রহিল, নাম—অভিজিৎ। এক এক নক্ষত্রে চন্দ্রের স্থিতি অনুসারে মাসের গণনা হয়। আটাশটি নক্ষত্রে অসুবিধা হওয়ায় অভিজিতের বিলুপ্তির প্রয়োজন ছিল। এই অভিজিৎই 'সতী'। রামেশ্বরের সমুদ্রতীরে শ্রীরামচন্দ্র শিবারাধনা করিয়াছিলেন। এই শিবই রামেশ্বর। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব কেহই এ-কথা অস্বীকার করেন না। গাণপত্য, সৌর, আগ্নেয়, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব—ভারতের নানান্ সম্প্রদায়। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ ছিল না এমন নয়। কিন্তু সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত ঐক্যও ছিল। এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অবদান-পরম্পরাই ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে ভারত যে উন্নত স্তরে উন্নীত হইয়াছিল, সে ঐ ধর্মসম্প্রদায়েরই কল্যাণে। সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্যাদিও ধর্মকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, এমন কি রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যেও ধর্মের বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছিল। ইহার সমস্ত কৃতিত্বই ঋষিগণের প্রাপ্য।

ভারতের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের কথা এ পর্যন্ত কেহ আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া জানি না। আচার্য শংকর প্রায় দেড় হাজার বৎসরের কিছু কম পূর্বে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়কে একটি নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ করেন। অনেকের মতে দশনামী সম্প্রদায়ের তিনিই প্রবর্তক। গিরি, পর্বত, অরণ্য, বন, তীর্থ, সাগর, আশ্রম, পুরী, সরস্বতী, ভারতী—এই দশটি নাম কেহ বলেন শঙ্করাচার্যের সৃষ্টি, কেহ বলেন এই সমস্ত নাম পূর্ব হইতেই ছিল। এই সন্ন্যাসীর দল মরুতীর্থ হিংলাজে, তুষারতীর্থ অমরনাথে, মানস-সরোবরে, অরণ্যানী-সমাকুল কামরূপে,

কোথায় না গিয়াছেন ! প্রাণের মমতা নাই, দেহে ক্লান্তি নাই, আহারের ভাবনা নাই। গিরি নদী পার হইয়া সর্বত্র নিঃশঙ্ক এই সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় পুরাণবর্ণিত তীর্থাদির অনুসন্ধান করিয়াছেন। বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতকে ইঁহারা নতুন করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তীর্থের কথা, তীর্থের দর্শনীয় বস্তুর কথা, তীর্থের পথের কথা, পথের সুবিধা-অসুবিধার কথা ইঁহারাই লোকালয়ে প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। নিষ্কিঞ্চন সত্যসন্ধ সন্ন্যাসীর দলই লোক-কল্যাণের জন্য লোকালয়ে আসিয়া কাহাকেও লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম, কাহাকেও বাণলিঙ্গ শিলা, কাহাকেও দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ-আদি দানপূর্বক সাধারণকে ধর্মাচরণে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া ফিরিয়াছেন। ধর্মপ্রচারক সন্ন্যাসিগণও ভারতের মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মূল লক্ষ্য ছিল জাতিগঠন। জাতিগঠনে সাফল্য লাভের জন্য যে পঞ্চবিধা মুক্তি অর্জন করিতে হয়, তাহার একতম মুক্তির নাম সারূপ্য মুক্তি। সমান রূপ সকলের হয় না, অথচ জাতিগঠনে ইহার প্রয়োজনীয়তা প্রচুর। এইজন্য ধর্মপ্রচারকগণ স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত নরনারীর জন্য দুই-একটি বিশেষ চিহ্ন ধারণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই চিহ্নধারণের নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মধ্যে একতা স্থাপন। এইজন্যই সম্প্রদায়হীন ধর্মকে নিষ্ফলা বলা হইয়াছে। প্রত্যেক বিষয়েরই ভালমন্দ দুইটি দিক আছে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ ঘটিয়াছে, ইহা স্বীকার করিয়াও বলিতে হয় যে, সম্প্রদায়গঠনের ফলে জাতির মধ্যে বহুল পরিমাণে একতা সংসাধিত হইয়াছে। বিভিন্ন রুচির মানুষ একই গণ্ডির মধ্যে আত্মসমর্পণ না করিয়া আপন আপন স্বাধীন মতবাদের আশ্রয় খুঁজিয়া পাইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে। সুতরাং সন্ন্যাসিগণকে ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি বলিয়া অস্বীকার করিবার কোন সুযুক্তিসম্মত হেতু নাই।

ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি সম্রাটগণ। ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় চেতনা ছিল না—এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা যত বড় মনীষীই হউন, তাঁহাদের কথায় আস্থা স্থাপন করা যায় না। বাস্তব-বিমুখ ভারতবাসী ধ্যানস্তিমিত নেত্রে আকাশপানে চাহিয়া কেবল পরকালেরই চিন্তা করিয়াছে, এমন কথা বলার কোন অর্থ খুঁজিয়া পাই না। প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র তথা শুক্রনীতি প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় ভারতীয় মনীষিগণ কেমন সমাজ-সচেতন তথা রাষ্ট্রীয় চেতনায় সদাজাগ্রত ছিলেন। রাজার কথায় শাস্ত্র বলিয়াছেন—মহতী দেবতার নররূপে অধিষ্ঠান। রাজা অপত্যনির্বিশেষে প্রজা পালন করিতেন।

তাহাদিগকে চৌরাদির উপদ্রব হইতে রক্ষা করিতেন। পঞ্চবিধা মুক্তির প্রথম মুক্তির নাম সাষ্টি—সমান ঐশ্বর্য। সমান ঐশ্বর্য সকলের থাকিবে কিরূপে? এইজন্য তিনি রাজ্যে সকল শ্রেণীর গুণীদের সমান সমাদর করিতেন। তাহাদের শ্রমের মর্যাদা দিতেন। তাহারা যাহাতে নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে সমাজে ও রাষ্ট্রে অর্থ উপার্জনের সুযোগ প্রাপ্ত হন, মর্যাদা প্রাপ্ত হন, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। প্রজাদের উৎপন্নজাত শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাজকর রূপে গ্রহণ করিয়া দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির হাত হইতে পরিত্রাণের জন্য সেই সংগৃহীত শস্যই যথাসময়ে প্রজাদের মধ্যে বিলাইয়া দিতেন। দণ্ড অপ্রণীত থাকিলে রাজ্যে মাৎস্যন্যায় প্রবল হইয়া উঠে। এইজন্য রাজার অপর এক নাম দণ্ডধর। পূর্বকালে সম্রাটগণ যে রাজসূয় অশ্বমেধ-আদি যজ্ঞ করিতেন, তাহাদের মধ্যে কাহারো কাহারো জিগীষা এবং ঐশ্বর্যলোলুপতা থাকিলেও অনেকেই চাহিতেন সুশাসন, সুপালন। আপনার ছত্রছায়াতলে আনিয়া সমগ্র রাজ্যে ধর্মসংস্থাপন ও শৃঙ্খলা-বিধানই ছিল ভারতীয় রাজন্যমণ্ডলীর অধিকাংশেরই উদ্দেশ্য। এই সেদিনও শুঙ্গকাম্বংশীয় রাজগণের মধ্যে এই প্রবণতা দেখিয়াছি। মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী চাণক্যের অর্থশাস্ত্র পাঠ করিলেই রাজার রাষ্ট্রীয় চেতনার উদাহরণ মিলিবে। পালবংশীয় রাজগণ ধর্মে বৌদ্ধ হইলেও ইঁহারা গর্গদেব, কেদার মিশ্র, গুড়ব মিশ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর মন্ত্রণাকৌশলেই পরিচালিত হইতেন। সেনবংশীয় রাজগণের মন্ত্রী হলায়ুধ এই মন্ত্রিমণ্ডলীর ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক, অন্তিম প্রতিনিধি। ভারতের রাজনীতি ধর্মহীন ছিল না। রাজন্যমণ্ডলীর আচরণীয় একটি যজ্ঞের নাম ছিল বিশ্বজিৎ। এই যজ্ঞে দীক্ষিত সম্রাট ঋষি, সন্ন্যাসী ও প্রজাগণের মধ্যে রাজভাণ্ডার এমন কি আপনার পরিহিত সমুকুট রাজপরিচ্ছদ পর্যন্ত বিলাইয়া দিয়া অন্তত একটি দিনের জন্যও কমণ্ডলু ধারণ করিতেন। বিশ্বজিৎ যজ্ঞ না-করিলেও সম্রাট হর্ষবর্ধনকে এই প্রথা পালন করিতে দেখিয়াছি। প্রতি চারি বৎসর অন্তর তিনি এই ব্রত পালন করিতেন। ইতিহাসে লিখিত আছে—বাঙ্গালী প্রজা প্রায় হাজারখানেক বৎসর পূর্বে গোপালদেবকে রাজা নির্বাচিত করিয়াছিল। পুরাণেও এইরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে। ঋষিগণের নির্বাচিত রাজা সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন; পুরাণকারগণ সে কথা শুনাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং সম্রাটগণও যে ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি ইহা ইতিহাস-স্বীকৃত সত্য। ঋষি বলিতে আমি যেমন বৌদ্ধ জৈন শাস্ত্রকারগণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি, তেমনই সন্ন্যাসীশ্রেণীর মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধ শ্রমণগণকেও

গ্রহণ করিয়াছি। সম্রাটগণের ব্যক্তিগত ধর্মও আমার নিকট অবান্তর মনে হইয়াছে। আমার মতে ভারতের প্রকৃত প্রতিনিধি—ঋষি, সন্ন্যাসী ও সম্রাট।

বল্লালী প্রথা

তখনো উষার অরুণোদয়ে কথঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। পথতরু-শাখা পক্ষী কলরবে মুখর। পাখিরা এখনো কুলায় পরিত্যাগ করে নাই। শববাহকেরা দ্রুতপদে পল্লীপথ অতিক্রম করিতেছে। সারমেয়গণ তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিতেছে। পশ্চাতে এক গৌরকান্তি যুবক ধীরপদে অগ্রসর হইতেছে। গাত্রে অবিন্যস্ত উত্তরীয়, কিন্তু গলদেশে ক্ষুদ্র একটি বস্ত্রখণ্ড গ্রন্থিবদ্ধ রহিয়াছে। যুবকের স্কন্ধে উপবীত।

সহসা পথিপার্শ্বস্থ একটি কুটিরের দ্বার খুলিয়া গেল। বাহির হইলেন অনতিপ্রৌঢ়া এক ভদ্রমহিলা; এক হস্তে জলপূর্ণ কমণ্ডলু, অন্য হস্তে ক্ষুদ্র একটি গোময়পিণ্ড, উদ্দেশ্য গৃহদ্বার মার্জন। মহিলা সম্মুখবর্তী যুবককে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। এ কি, এ কাহার দ্বিতীয় প্রতিরূপ! প্রথা আছে—শববাহকগণকে ও শবানুগমনকারীকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে নাই। রমণী প্রথা ভঙ্গ করিলেন, 'কে? কে তুমি?' যুবক সসম্ভ্রমে উত্তর দিলেন, 'মা, বাড়ি আমার মঙ্গলডিহি, বীরভূম জেলায়।' 'কি তোমার নাম বাবা?' করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন পল্লীবাসিনী।

'নাম বনওয়ারীলাল মুখোপাধ্যায়'।

'কাকে নিয়ে চলেছ উদ্ধারণপুরে'?

'আমার পিতাঠাকুরকে'।

'তোমার বাবাকে? কি নাম ছিল তাঁর'?

'ধনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়'।

'তোমাদের পূর্ব বাড়ি কি সোনারুন্দী বনারীবাদ'।

'আজ্ঞে'।

'ওরে, আমি তোর মা। হতভাগিনী আমি, আমার কেন মরণ হল না!' রমণী আছাড় খাইয়া পড়িলেন। যুবক তো নির্বাক—পথের মাঝখানে

এ কি কাণ্ড! ক্ষণকাল পরে শোক সম্বরণপূর্বক রমণী বলিলেন, 'দাঁড়াও বাবা, হাতের এই লোহাগাছা নাও, তোমার বাবার চিতায় দিও। আমি চট্‌ করে স্নান সেরে আসি। তোমায় কিছু পয়সা দেব, উদ্ধারণপুরে চন্দনকাঠ আর ধুনো কিনে চিতায় দিও। আর বাবা আমার, ফেরবার পথে এখানে একদিন থেকে হবিষ্যি করে যেও।' পয়সা লইয়া যুবক উদ্ধারণপুরের পথে পা বাড়াইলেন। বাহকেরা অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে।

মঙ্গলডিহি গ্রামে এই নিয়ম আজিও চলিত আছে—উদ্ধারণপুরে যাইতে হইলে মুখাগ্নির পর ব্রাহ্মণের শবদেহও অন্য সম্প্রদায় বহন করিয়া লইয়া যায়।

দুই

শোকাপহতা রমণী গৃহমধ্যে গিয়া বসিলেন। ক্রন্দনরোলে সচকিতা প্রতিবাসিনী রমণীগণ আসিয়া কত প্রবোধ দিলেন। কৈশোর-যৌবনের কত না দৃশ্য একের পর এক রমণীর চক্ষের সমক্ষে ছায়াচিত্রের মত ভাসিয়া উঠিল! এমনই একটি দিনের কথা—শবদেহ নয়। স্বজন-পরিবেষ্টিত এক অশীতিপর বৃদ্ধ অন্তর্জলীর জন্য দোলায় চাপিয়া চলিয়াছেন উদ্ধারণপুরে। তাঁহাদের প্রতিবেশী এক ব্রাহ্মণ আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন দোলার আগে। মৃত্যুপথযাত্রী নাকি মহাকুলীন—স্বকৃত-ভঙ্গ! অতএব তিনি যদি কৃপা করিয়া তাঁহার পঞ্চাশোধ্ব-বয়স্কা ভগিনীর পাণিপীড়ণপূর্বক ব্রাহ্মণের কুলরক্ষা করেন। তাহাই হইল, ব্রাহ্মণ জরাকম্পিত হস্তে সেই প্রৌঢ়া কুমারীর সীমন্তে সিন্দূর লেপনপূর্বক তাহার হাতের গাঁথা মালা গলায় পরিয়া গঙ্গাযাত্রা করিলেন। শিহরিয়া উঠিলেন রমণী। যেঠে রামনারায়ণের কথা এ দেশে কে না জানে? রামনারায়ণ একেবারে নিকষ, তাই একে একে ষষ্ঠীসংখ্যকা কুমারীর কর-স্পর্শচিহ্ন অঙ্গে ধারণপূর্বক কুলীনকুলের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এই তো মনে হয় সেদিনের কথা। ও-পাড়ার চঞ্চলার ঠাকুমা আসিয়া আমাদের বাড়িতে মাকে বলিয়া গেলেন—"আর বল কেন মা, কাল রাত্রে কি হাঙ্গামা! রাত দুপুরে নাতজামাই এসে হাজির। বলে, 'অন্য গ্রামে খেয়ে এসেছি কিছু খাব না। কিন্তু পা-ধোয়ার টাকা চাই'। বলে, 'এক ঘটি জল খাব মাত্র। তারও ভোজন-দক্ষিণে চাই।' সমস্তই দেওয়া হল, তারপর চঞ্চলাকে সে কি আদর! বলে, 'কত বড়টি হয়েছ'! তা মা, এত জেদাজেদি ধরাধরি কিছুতেই

আটকানো গেল না। বললে, 'রাত পোয়ালেই অমুক গাঁয়ে যাব ; একটা কন্তেদায় খালাস করতে'। সে যে অ-নেক দূর। আমার পোড়া কপাল! অমন জামাই তোরা একনজরও দেখতে পেলি না। তারপরেই আটমাস যেতে না যেতে চঞ্চলা বেটা কোলে ঘর আলো করে বসল।" আবার কুঞ্চিত হইয়া উঠিল রমণীর সর্বদেহ।

রমণীর মনে পড়িয়া গেল—বাবা বলতেন, বল্লাল সেন নাকি এ দেশের রাজা ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ভালই ছিল। কিন্তু, কৌলীন্য বংশগত হওয়ায় দেশটার সর্বনাশ ঘটে গেল। একদিকে কুলীনের মেয়ের বিয়ে হয় না, অন্যদিকে শ্রোত্রীয়রা মেয়ে পায় না! পাপে পূর্ণ হল দেশ।

তিন

বনওয়ারীলাল ফিরিয়া আসিলেন। হবিষ্যগ্রহণের পর মাতাপুত্রে কথা আরম্ভ হইল। মা বলিল, "বাপ ছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। কয়েক ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ যজমান ছিল, দুই চারিটা নিমন্ত্রণও পেতেন। তাতেই কোন রকমে চলে যেত। আমার বয়স যখন বার বৎসর, হঠাৎ মা স্বর্গে গেলেন। বাবার শরীর ভেঙ্গে পড়ল। নিমন্ত্রণ পেলেও বড় যেতেন না। অচল সংসার একেবারে চরম অবস্থায় এসে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আমার বয়স তখন সতের। দুর্ভাবনায় বাবা শয্যা নিলেন। থালা-বাটি সব বন্ধক দিতে হল। মায়ের কাছে চরকা কাটা শিখেছিলাম। চরকাই দুঃসময়ে কিছুটা সাহায্য করেছিল।

"আমার বাবার সঙ্গে তোমার বাবার জানাশোনা বহুদিনের। সোনারুন্দী হতে মঙ্গলডিহি যাতায়াতের পথে এক-আধদিন তিনি আমাদের বাড়িতেই থেকে যেতেন। আমিই তাঁর সন্ধ্যে-আহ্নিকের জোগাড় থেকে সব ফাইফরমাশ খাটতাম। খেতেও দিতাম আমি। বাবার সামনে বসে গল্পও করতেন আমার সঙ্গে।

"মঙ্গলডিহি যাত্রার পথে এমনই একদিন এসেছেন। শয্যাগত বাবা তোমার বাবার দুটি হাত বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমার জাত রক্ষা কর, আমার মেয়েটিকে নাও, নইলে আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারব না।' তোমার বাবা রাজী হয়ে গেলেন। আমাদের তখন এমন অবস্থা—একখানা নূতন কাপড় কেনবারও সামর্থ্য নেই। তোমার মায়ের জন্ত কেনা শাড়ীখানা দিলেন তোমার বাবা।

'কনের রূপক-বস্ত্র' হল সেখানাই। রাত্রেই বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের অন্যান্য সামান্য খরচও তোমার বাবা দিয়েছিলেন। এরপর থেকে যাতায়াতের পথে তিন-চারদিন করে থেকে যেতেন এখানে। ইদানীং অনেকদিন আসেন নি। বাবার স্বর্গ-গমনের পর নিজে এসে দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে দিয়ে শ্রাদ্ধশান্তি করিয়েছিলেন। যাতায়াতের পথে খরচ কিছু কিছু দিয়ে যেতেন। মাঝে মাঝে গোপনে পরিচিত কারো হাতে, কখনো বা ডাকযোগে পাঠাতেন।

"বাবার স্বর্গলাভের পর কতদিন তাঁকে বলেছি আমায় মঙ্গলডিহি নিয়ে চল। সেখানে আমি দিদির দাসী হয়ে থাকব। রাজী হন নি। বলেছি মঙ্গলডিহিতে ঠাকুরবাড়ির রাসে তো খুব ধুম হয়। ঠাকুরদের কত শিষ্য-সেবক যায়। এমনই আমি কারো সঙ্গে একবার যাই না। দূর থেকে দিদিকে দেখে আসব। শুনলেন না সে কথা। আমি তাঁর কথা ঠেলে যেতে পারি নি। যেদিন এসে খবর দিলেন তুমি দিদির কোলে এসেছ, আমি তাঁর পায়ে ধরে কেঁদেছিলাম। তোমাকে দেখার, তোমাকে কোলে করার বড় সাধ ছিল। কিছুতেই তাঁকে সম্মত করান যায় নি। কিন্তু অভিমান করে কি করব। কোনদিন তো তিনি আমাকে আর কোন বিষয়ে হেনস্তা করেন নি। তোমার বাবার আরো দুটি বিয়ে ছিল। আমাদের কারো কোন সন্তানসন্ততি নেই। সব খবর বলতেন তিনি। তোমার জন্যেই তিনি মঙ্গলডিহিতে বাঁধা পড়েছিলেন। তোমাকে দেখার সাধ ছিল, সে সাধ ভগবান এমনি করেই মেটাবেন কে জানত! আমার কথা এবার গিয়ে বল তোমার মাকে, আমার প্রণাম জানিও। শ্রাদ্ধের খরচ আমার সাধ্যমত সামান্য কিছু দিই, নিয়ে যাও। আর একটা কথা—তোমার মাকে বলো তোমার বংশে তোমার ছেলেরা নাতিরা কেউ যেন কনের বিয়ের কাপড় রূপক-বস্ত্র কিনে না দেয়। বাবা, বলবার তো মুখ নেই; অভাগীর কি যে অদৃষ্টে হবে, শেষের দিনে তোমার হাতের আগুনটা যদি পেতাম। উদ্ধারণপুরে নিয়ে গিয়ে যদি তোমার বাবার চিতার পাশে আমার দেহটা পোড়াতে!"

বনওয়ারীলাল প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছিলেন। বাড়ি আসিয়া মাকে সব কথা বলিয়াছিলেন। মা তাহাকে মাঝে মাঝে পাঠাইতেন বিমাতার সংবাদ আনিতে। প্রতিবেশীর প্রেরিত লোকমুখে সংবাদ পাইয়া বনওয়ারীলাল সারারাত্রি পথ হাঁটিয়া বিমাতার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন। তাহার উপস্থিতির দুইদিনের দিন বিমাতা স্বর্গারোহণ করেন। নিজের হাতে অগ্নিসংস্কারপূর্বক উদ্ধারণপুরে লইয়া গিয়া

বনওয়ারীলাল পিতার চিতার পার্শ্বেই বিমাতার অন্তিম আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন। দশাহ অশৌচ পালনের পর বিমাতার শ্রাদ্ধকৃত্যও সম্পাদন করিয়াছিলেন বনওয়ারীলাল। বিমাতার পিতৃদেবের এক জ্ঞাতি আসিয়া কুটিরের ভার গ্রহণ করেন। বনওয়ারীলালের মাতৃদেবীর মুখে এই কাহিনী শুনিয়া প্রথম যৌবনেই একজন মাত্র লোক সঙ্গে পায়ে হাঁটিয়া সোনারুন্দী পর্যন্ত গিয়াও পুণ্যতীর্থ সেই গ্রামখানির সন্ধান করিতে পারি নাই। কনের বিবাহের কাপড় কিনিয়া না দেওয়ার প্রথা বনওয়ারীলালের বংশে আজিও পূর্ণাঙ্গ ঐতিহ্যরূপে প্রতিপালিত হয়।

খুশ্‌টিকুরি

হিন্দু-মুসলমানের মিলনপ্রচেষ্টা

প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসরের পুরানো কথা। শুনিলে কাহিনী বলিয়া মনে হইবে। আজকাল যেখানে-সেখানে যখন-তখন হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কথাই শুনিতে পাই—ধর্ম লইয়া ঝগড়া, চাকরির জন্য রেষারেষি, কৌন্সিলে গলাবাজীর আসরের দখল-বেদখলের মন-কষাকষি! এই সবের মিটমাট করিতে কত প্যাক্ট, কত শলা, কত সভা। বিরোধ সেকালেও ছিল; কিন্তু সেই বিরোধের মাঝেও দুই-একজন হিন্দু ও মুসলমান সাধু কি ভাবে, কোন্ পথে মিলনের চেষ্টা করিতেন বর্তমান প্রবন্ধে তাহারও একটা দিগ্‌দর্শন হইবে। মুসলমান বাদশাহ্, ওমরাহ্, জমিদার প্রভৃতির হিন্দুকে জমি দেওয়ার সনদ অনেক দেখিয়াছি, আজ হিন্দু ভূস্বামীর মুসলমান ফকিরকে ভূমিদানের দানপত্র দুই-একখানি দেখাইতেছি।

গ্রামের নাম খুশ্‌টিকুরি, অর্থাৎ আনন্দ-নিকেতন, আনন্দকে যেখানে পাকড়াও করা যায়। কেহ বলে খোশ-টিক্‌রী, অর্থ বোধ হয়; আনন্দের টুক্‌রা। কেহ কেহ কুশটিকুরিও বলে। বলে যে একটা উচু জায়গায় কুশের বন ছিল, সেইখানেই গ্রামের পত্তন হওয়ায় গ্রামের নাম কুশটিকুরি হইয়াছে। বীরভূমের সদর সিউড়ী হইতে প্রায় সাত ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে এই গ্রাম। গ্রামের প্রায় সকল অধিবাসীই মুসলমান, কয়েক ঘর মাত্র হিন্দু।

শুনিতে পাই, 'আরবের (?) অন্তঃপাতী কেরমান সহরের অধিপতি

সৈয়দ শাহ্ বড় খোরদার সাহেব' ইরাণের বাদশাহের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বাঙ্গালায় চলিয়া আসেন, এবং তদানীন্তন গৌড়েশ্বর হাব্শী বাদশাহের অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন। বড় খোরদার সাহেবের পুত্র হজরৎ সৈয়দ শাহ্ আবদুল্লাহ্ ওলিয়াল হোসেনিয়ান কেরমানী। ইনি তখন বালক, পিতার সঙ্গহারা হইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হন। একদিন প্রাতর্ভ্রমণের সময় দিল্লীশ্বর তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, এবং পূর্বোক্ত পরিচয় পাইয়া বালককে বয়সোচিত একটি কর্মে নিযুক্ত করিয়া দেন। কেহ কেহ বলেন বালক খাজাঞ্চীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এক দিন একজন খিদ্‌মদ্‌গার একটি বহুমূল্য পানপাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলায় সম্রাট তাহাকে কোতল করিবার হুকুম দেন। দেখিয়া আবদুল্লা চাকুরী ত্যাগের সংকল্প করেন। আবদুল্লার জিম্মায় কতকগুলি সুন্দর মাটির বাসন ছিল, একজন চাকর হোঁচট খাইয়া তাহার কয়েকটি ভাঙ্গিয়া ফেলে। কখনও কোন বাগানভোজ ইত্যাদির সময় সম্রাটের হুকুম হইলে ঐ সমস্ত মাটির বাসনগুলি হাজির করিতে হইত, বাসনগুলি নাকি সম্রাটের ভারি শখের জিনিস ছিল। একবার এক ভোজে সম্রাট বাসন আনিবার হুকুম দিলেন, আবদুল্লার খুব ভয় হইল, তিনি খোদার কাছে আরজ জানাইলেন, সম্রাট যেন বাসনের কথা ভুলিয়া যান। খোদার মর্জিতে তাহাই হইল। অতঃপর আবদুল্লা চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। তাঁহার মনে হইল এমনি করিয়া সামান্য কারণে নিজের গরজে যদি খোদাকে দিক্ করিতে হয়, সে চাকরির দরকার নাই।

দিল্লী হইতে আবদুল্লা পাটনার আজিমাবাদ সহরে আসিয়া কিছুদিন বাস করেন। তথা হইতে বাঙ্গালার পাণ্ডুয়ায় আসেন এবং ফকীর আরজান সাহেবের শাগ্‌রেদী করিতে থাকেন। আরজান সাহেব তাঁহাকে নানারূপে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। একদিন তরকারী না দিয়া অতি অল্প পরিমাণে ভাত দেন, আবদুল্লা কিছু না বলিয়া সেই ভাতকয়টি খাইয়াই খুশির সঙ্গে কাজ করিতে থাকেন। একদিন এক মেথরকে আবদুল্লার গায়ে ময়লা ঢালিয়া দিতে বলেন, আবদুল্লা কাহাকেও কিছু না বলিয়া জলে গিয়া ময়লা ধুইয়া ফেলেন। আর একদিন একটা ছেলে আরজান সাহেবের কথায় আবদুল্লার মাথার উপর থুথুভরা পিকদানীটা উপুড় করিয়া দেয়। এত সব করিয়াও আরজান যখন আবদুল্লাকে তাড়াইতে এমন কি রাগাইতেও পারিলেন না, তখন বলিলেন, 'এইবার তুমি কিছু পাইবে'।

আরজান সাহেবের পুত্রের নাম ছিল করিম আবদুল্লা। সেই জন্য আমাদের এই সৈয়েদ শাহ্‌ আবদুল্লাহ্‌ নিজেকে গোলাম আবদুল্লা বলিতেন। একদিন আরজানের মাংস খাইবার ইচ্ছা হওয়ায় করিম আবদুল্লাকে তাহা বলেন, এবং করিম নিকটবর্তী জঙ্গলে শিকার খুঁজিতে যান। দৈবদুর্বিপাকে শিকার খুঁজিয়া না পাইয়া দিনরাত্রির মধ্যে করিম আস্তানায় ফিরিতে পারিলেন না। পরদিন প্রাতঃকালে আরজান ডাকিলেন—'আবদুল্লা', সৈয়দ উত্তর দিলেন 'গোলাম আবদুল্লা হাজির'। তিনবার ডাকিয়া একই উত্তর পাইয়া আরজান গোলাম আবদুল্লাকে এক মসক পানি আনিয়া দিতে বলিলেন। গোলাম আবদুল্লা জল আনিতে গেলে একটি স্ত্রীলোক জল চাহিলেন। আবদুল্লা জল দিলে সেই জলে স্নান করিয়া স্ত্রীলোকটি একটি সন্তান প্রসব করিয়া চলিয়া গেলেন। সদ্যপ্রসূত ছেলেটি প্রবীণের মত আবদুল্লাকে স্নেহের সহিত ডাকিয়া শুধাইলেন, 'কিছু পাইলে?' আবদুল্লা বলিলেন, 'বার বৎসর আছি, কিছুই পাই নাই'। তখন ছেলেটি তাঁহাকে ফকিরী দিলেন, সাধন দিলেন। ছেলেটি পরিচয় দিলেন, 'আমি খেজের পয়গম্বর,—লোকে বলে দরিয়ার পীর।' আরও বলিলেন, 'তোমার পিতা হাব্‌শী বাদশাহের দরবারে চাকরি করিতেছেন। তিনি (বর্ধমানে) পরগণে মজফরশাহীর মালিক হইয়া আসিবেন। তোমার ভ্রাতা দিল্লীর পশ্চিমে এক জঙ্গলে খোদার নাম জপিতেছেন, তিনি শাহ্‌ ফরিদ দফরগঞ্জ হইবেন। তুমি সেনভূমে জঙ্গলে ঘুরিতে ঘুরিতে যেখানে আনন্দ পাইবে সেইখানে গিয়া বাস কর। সেখানে এক কালী দেবী আছেন। তাঁহাকে গিয়া মান্য করিও। অন্য ফকির গিয়া তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিলে তিনিই তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবেন'। অতঃপর আবদুল্লা আরজান সাহেবের নিকট ফিরিয়া আসিলে তিনি তাঁহাকে 'জায় নামাজ, পাগড়ী, দাঁতন, খড়ম, কোরান শরীফ এবং তসবী (মালা)' দিলেন। বলিলেন, 'আমি সন্ধ্যার পর দেহ রাখিব, তুমি হুজরাতে নমাজ পড়িয়া আমাকে দফন করিও'। তাহাই হইল, তাহার পর তিনি পদ্মার উপর হাঁটিয়া এপারে আসেন। এদিকে করিম আবদুল্লা শিকার হইতে ফিরিয়া সব দেখিয়া শুনিয়া গোলাম আবদুল্লার পিছনে ছুটিলেন। গোলাম আবদুল্লা তখন পদ্মার এপারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। করিম আবদুল্লা তাঁহাকে ডাকিলে গোলাম আবদুল্লা 'পাগড়ী' ফেলিয়া দিলেন, 'মুরীদ' করিলেন। তা ছাড়া তিনি আরজান সাহেবের একগাছি ছড়ি, পাঁচটি তসবী-দানা এবং একপাটি খড়ম ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, 'তোমার ওপার, আমার এপার'।

শাহ্ আবদুল্লা প্রথম বড় গ্রাম ফলিয়ালপুরে আসেন। সেখান হইতে মজফরশাহীতে গিয়া পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ফিরিয়া আসিলে বড়গ্রামের লোক তাঁহার উপর অত্যাচার করায় তিনি তাহাদিগকে অভিশাপ দিয়া খুশ্‌টিকুরির জঙ্গলে আসিয়া উপস্থিত হন ঘুরিতে ঘুরিতে এই জঙ্গলে আসিবা মাত্র তাঁহার মন যেন এক অপার্থিব আনন্দে পূর্ণ হয় এবং কালীদেবী আসিয়া দর্শন দেন। তখন শাহ্ আবদুল্লা বুঝিতে পারেন যে তাঁহাকে ওইখানেই থাকিতে হইবে। কালীদেবী অন্যান্য ফকিরদের তাড়াইয়া দিয়া শাহ্ আবদুল্লাকে বলেন, 'এখানে তুমি আর আমি, আমরা দুইজন থাকিব'। শাহ্ আবদুল্লা আপন আস্তানার দরজায় কালীর স্থান করিয়া দেন। আস্তানার ভিতরে যাইতে হইলে আগে কালীর কাছে মাথা নোয়াইয়া যাইতে হয়। আস্তানার দরজার চৌকাঠ আজিও 'কালীচৌকাঠ' নামে প্রসিদ্ধ। এ অঞ্চলের বহু হিন্দু তাঁহার নিকট মুসলমান ধর্মে দীক্ষা লইয়াছিলেন। তাঁহার এক হিন্দু চাকর গঙ্গাস্নানে যাইতে চাহিলে তিনি তাহাকে আস্তানার সম্মুখের একটি পুষ্করিণীতে স্নান করিতে বলেন। স্নান করিয়া উঠিয়া আসিলে লোকে জিজ্ঞাসা করায় সে কাটোয়া সহর ও গঙ্গাঘাটের কথা হুবহু বলিয়া গেল। অথচ সে ইতিপূর্বে একবারও কাটোয়ায় যায় নাই। তদবধি পুষ্করিণীর নাম হইয়াছে 'গঙ্গা গড়ো'। শাহ্ আবদুল্লা কোথায় বিবাহ করিয়াছিলেন জানা যায় না। তাঁহার দুই পুত্র, এক পুত্রের নাম আবদুল রসুল, আর এক পুত্রের নাম শাহ্ অলিমুল্লা।

এক ফকিরকে তাঁহার পুত্র সেলাম না করায় ফকির খুব রাগ করেন। শাহ্ আবদুল্লা তজ্জন্য ছেলেকে কিল মারিতে থাকেন। চৌদ্দ কিল মারিলে পত্নী তাঁহাকে নিষেধ করেন, তখন শাহ্ আবদুল্লা বলেন 'আমার বংশে চৌদ্দজন বংশধর হইবে'। বর্তমানে এই বংশের চৌদ্দপুরুষ চলিতেছে। ৯০৫ হিজরায় ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হজরৎ সৈয়দ শাহ্ আবদুল্লা দেহ রক্ষা করেন। সমাধির পূর্বে তিনি বলেন 'আমি দেহ রাখিব; এক ফকির আসিবে। আমার নমাজ তাঁহার দ্বারাই পড়াইবে। এই আস্তানার ভিতরে আমাকে কবর দিও। গোরাচাঁদ ফকির বাহিরে কবর দিবার জন্য জেদ করিবে, তাহার কথা শুনিও না'। নিকটস্থ একটি তেঁতুল গাছকে লোকে 'দাতনকাঠির গাছ' বলে। শাহ্ আবদুল্লা, আরজান সাহেবের যে দাঁতন সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাই পুঁতিয়া দেওয়ায় নাকি ঐরূপ গাছ হইয়াছে। গাছটির চেহারাও সাধারণ গাছের মত নহে।

এই সৈয়দ শাহ্‌ আবদুল্লাহ্‌ খুশ্‌টিক্‌রির জমিদার বংশের আদি পুরুষ। বিবি ফাতেমার গর্ভে আলির ঔরসে যে তিন পুত্রের জন্ম হয়, তন্মধ্যে ইহারা এমাম হোসেনের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই বংশে সৈয়দ শাহ্‌ হজরত মৌলানা মহম্মদ হোসেন এবং তাঁহার পুত্র সৈয়দ শাহ্‌ মৌলভী মহম্মদ হাফেজ বর্তমান আছেন। ইহারা হিন্দু-মুসলমান প্রজাকে সমান প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ইহারা আজিও প্রজার হাল বা বকেয়া খাজনার কোনরূপ সুদ গ্রহণ করেন না। ধান দাদন দিয়া তাহার ব্যাজ গ্রহণও এ বংশের রীতিবিরুদ্ধ।

পাণ্ডুয়া হইতে আসিতে কোথায় পদ্মা পার হইতে হয়, কোন্‌ পথে শাহ্‌ আবদুল্লা পদ্মা পার হইয়াছিলেন জানা যায় না। তিনি যে সম্রাটের নিকট দিল্লীতে চাকরি স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমরা বহ্‌লোল লোদী বলিয়া মনে করি। ইনি খ্রী: ১৪৫১-১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। আবদুল্লার পিতা যে 'হাব্‌শী বাদশাহের দরবারে চাকরি করিতেন, তাঁহার নাম মালিক আন্দিল হাব্‌শী। ইনি সৈফউদ্দীন ফিরোজশাহ্‌ নাম গ্রহণ করিয়া ১৪৮৬ খ্রী: হইতে ১৪৮৯ খ্রী: পর্যন্ত গৌড়সিংহাসন দখল করিয়া ছিলেন। ইহার রাজ্যগ্রহণের কৌতূহলজনক ইতিহাস স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলার ইতিহাস, ২য় খণ্ড হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ সুলতান জলালউদ্দীন ফতেশাহ্‌কে হত্যা করিয়া ক্রীতদাস বারবগ্‌ সিংহাসন গ্রহণ করিলে মালিক আন্দিল তাহাকে বধ করেন। রাখালবাবু লিখিয়াছেন—

'জলালউদ্দীন ফতেশাহের হত্যার দুই অথবা ছয় মাস কাল পর্যন্ত প্রভুহন্তা বারবগ্‌ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। ফতেশাহের পত্নী ও শিশুপুত্র প্রাসাদ হইতে তাড়িত হইয়া গৌড় নগরে সামান্য ব্যক্তির ন্যায় বাস করিতেছিলেন। সিংহাসন অধিকৃত করিয়া ক্রীতদাস বারবগ্‌ 'সুলতান শাহজাদা' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিল, এবং অন্যান্য খোজা ও নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণকে অর্থপ্রদানে বশীভূত করিয়াছিল। ফতেশাহের মৃত্যুকালে গৌড়রাজ্যের প্রধান অমাত্য মালিক আন্দিল হাব্‌শী রাজকার্যে সীমান্তে গমন করিয়াছিলেন। বারবগ্‌ তাঁহাকে বশীভূত না করিতে পারিয়া হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। মালিক আন্দিল বারবগ্‌কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ফতেশাহের পুত্রকে গৌড়সিংহাসনে স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। মালিক আন্দিলকে বিনাশ করিবার জন্য বারবগ্‌ অবশেষে তাঁহাকে রাজধানীতে আসিতে আদেশ করিল।

মালিক আন্দিল সসৈন্যে গৌড়নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলে বারবগ্ তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে সাহস করিল না, কিন্তু মালিক আন্দিল কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতে বাধ্য হইলেন যে, বারবগ্ যতক্ষণ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিবে, ততক্ষণ তিনি তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিবেন না।

একদিন গভীর রাত্রিতে প্রভুহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের মানসে মালিক আন্দিল অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে বারবগ্ সুরাপানে অচেতন হইয়া সিংহাসনের উপর নিদ্রিত রহিয়াছে। পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া মালিক আন্দিল তখন বারবগ্‌কে স্পর্শ করিলেন না। কিন্তু দুরদৃষ্টবশত মত্ততাপ্রযুক্ত বারবগ্ সিংহাসন হইতে ভূমিতে পতিত হইল। তখন মালিক আন্দিল তাহাকে তরবারী দ্বারা আঘাত করিলেন। সে আঘাতে প্রভুহন্তা নিহত হইল না। বারবগ্ মালিক আন্দিলকে ভূমিতে পাতিত করিয়া তাঁহার বক্ষের উপর উপবেশন করিল। এই সময়ে তুরস্ক জাতীয় য়গ্রশ্ খাঁ ও মালিক আন্দিলের অন্যান্য হাব্‌শী অনুচর কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের আঘাতে হীনবল হইয়া বারবগ্ মৃতবৎ পড়িয়া রহিল, এবং এই সময়ে কক্ষের প্রদীপ নির্বাপিত হওয়ায় সে ভূগর্ভস্থিত একটি কক্ষে পলায়ন করিয়া আত্মগোপন করিল। মালিক আন্দিল, য়গ্রশ্ খাঁ ও অন্যান্য হাব্‌শীদিগের সহিত অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে তাওয়াচী বাশী নামক জনৈক কর্মচারী সেই কক্ষে আসিয়া দীপ প্রজ্বলিত করিল। সে ভূগর্ভস্থিত কক্ষে প্রবেশ করিলে বারবগ্ তাহাকে দেখিয়া মৃতবৎ পতিত রহিল। কিন্তু পরক্ষণেই মিষ্ট কথায় প্রতারিত হইয়া সে তাওয়াচী বাশীকে প্রাসাদের বাহিরে গিয়া রাজ্যের প্রধানগণকে ডাকিয়া আনিতে অনুরোধ করিল। তাওয়াচী বাশী অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়া মালিক আন্দিলকে বারবগের কথা জানাইল, তখন তিনি দ্বিতীয় বার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বারবগ্‌কে হত্যা করিলেন।'

অতঃপর প্রধান মন্ত্রী খাঁ জহান, ফতেশাহের বিধবা পত্নী এবং গৌড়রাজ্যের অপরাপর প্রধানগণ একমত হইয়া মালিক আন্দিলকে সিংহাসন গ্রহণে অনুরোধ করেন। মালিক 'সৈফ্‌উদ্দীন ফিরোজশাহ্' উপাধিসহ বাঙ্গালার মসনদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিই হাব্‌শী বাদশাহ্ নামে পরিচিত।

খুশ্‌টিকুরির নিকট মঙ্গলডিহি গ্রামে সৈয়দ শাহ্ আবদুল্লার সমসাময়িক এক ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার নাম পর্ণগোপাল ঠাকুর। পান বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন বলিয়া ঐ নাম; লোকে তাঁহাকে পানুয়া

ঠাকুর' বলিত। পান্নুয়া ঠাকুর মঙ্গলডিহি ঠাকুর বংশের আদি পুরুষ। ইনি শ্যামচাঁদ ও বলরাম বিগ্রহের সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার বংশধরগণ আজিও দেবসেবা নির্বাহ করিতেছেন। এই পর্ণগোপালের সঙ্গে সৈয়দ শাহ্‌ আবদুল্লার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। আজিও লোকের মুখে মুখে তাঁহাদের সম্প্রীতি ও সিদ্ধাইয়ের নানা রকম গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। পান্নুয়া ঠাকুর যেমন তদানীন্তন হিন্দু-মুসলমান বহু জমিদারের নিকট দানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ শাহ্‌ আবদুল্লাও হিন্দু জমিদারগণের নিকট হইতে তদপেক্ষা আরও অধিক ভূ-সম্পত্তি-আদি লাভ করিয়াছিলেন। আমরা শাহ্‌ আবদুল্লা সাহেবের সময়ের কোন সনন্দ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। পরবর্তী কালের যে সমস্ত সনন্দের প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার কয়েকটি শাহ্‌ আবদুল্লা সাহেবের দানপ্রাপ্ত ভূমির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর পুনঃ স্বত্ব-সাব্যস্তের পাট্টা ইত্যাদি। নিম্নে কয়েকখানি সনন্দের প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। নদীয়ার মহারাজার দেওয়া মৌজা আলি-বাজার ও প্রতিহারপুরের সনন্দ পাওয়া যায় নাই। সনন্দের প্রতিলিপির মধ্যে ছেদচিহ্নাদি আমরা যোগ করিয়াছি। বানান প্রায় অবিকল রাখিয়াছি।

[১] পঞ্চকোটাধিপতির দানপত্র—

শ্রীশ্রী ছোট মহারাজা বাহাদুর আজ্ঞা। হজরৎ খোন্দকার সাহেব ওয়ালা দফর আলিসান ফয়েজ রসান শ্রীযুক্ত হজরৎ সৈয়দ সাহ মৌলানা আল্লা হাফেজ সাহেব মদ্দ জোল্ল হসামী। আপনি নিবেদন করিলেন যে আপনার মৌরসান আমার মৌরসানকে পঞ্চকোটি চাকলার মৌজে ঘুসরা ও মৌজে রাণীপুর এই দুই গ্রাম প্রদান করিয়াছেন। আমার কুলে যে ব্যক্তি গদ্দিতে প্রধান হইয়া শ্রীশ্রীকে চেরাগবত্তী অর্পণে ও খানকা খরচ দেওনে প্রবর্ত্ত থাকেন, ঐ মৌজা তাহারই ভোগ দখল হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে আমি গদ্দীনসীন হইয়া পূর্ব্বাপরের রীতিমত উল্লিখিত বিষয়ে প্রবর্ত্ত আছি। প্রার্থনা যে আপনার মৌরসানের দত্ত উক্ত মৌজাদ্বয়ে দখলীকার থাকিয়া সাজ্জাদানসীনিতে শ্রীশ্রীকে চেরাগবত্তী অর্পণ করিয়া খানক, খরচ দিয়া আপনাকে দোয়া গোর্দ্দি করিতে থাকি। অতএব আপনার প্রার্থনা অনুযায়ী হুকুম সনন্দ দেওয়া যাইতেছে যে আপনার কুলে উক্ত গদ্দীতে যে যখন প্রবর্ত্ত হইয়া সাজ্জাদানসীনিতে কায়েম থাকিয়া শ্রীশ্রীতে চেরাগবত্তী অর্পণ ও খানকা খরচ দিতে থাকিবেন, আমার মৌরসানের প্রদত্ত মৌজাদ্বয় তাঁহারই শাসনে থাকিবে। ইতি সন ১২৫২ সাল তারিখ ২৬ পৌষ।

[১১৭৮ সালের চাকলে পাককোটার ফিরিস্তী হইতে এই নকল দেওয়া গেল। খএরাত খোনকার সাহেব, পরগণে চৌরাশী মোং রাণীপুর]

[২] বিষ্ণুপুরাধিপতির দানপত্র—

শ্রীশ্রীহরি

শ্রীযুক্ত সৈয়দ শাহ হুসেন আলী হজরৎ সাহেব সত চরিত্রেষু

[পার্শ্বেOমোহর] রাজা জয়গোপাল সিংহ ৺পীরত্তর সনন্দ পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে মোতালকে পরগণে বিষ্ণুপুর ও গয়রহ তরফ ভালসাগর মহল থানাবাড়ী সামীল মৌজে রাধা-দামোদরপুর মধ্যে জনকপুরের জঙ্গল। চতুঃসীমা—সুবল হালদারের জমার জমির উত্তর মৌজে কাকিটার হাসিল জমির পশ্চিম বেচারাম দালালের জমার জমির পূর্ব্ব-বীরমিহা হইতে পাত্রসায়র যাইবার রাস্তার দক্ষিণ এই চতুঃসীমা মধ্যে উত্তর × × জমা খারিজ জঙ্গল পতিত জমি ১২৫/ এক শত পঁচিশ বিঘা আপনকাকে সাহাবদুল্লা ওলি কেরমানীর ফাতিহা × × দেওয়া গেল। জমি তরদুদাবাদ করিয়া ও সেবা করিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিবেন। সন ১১২৪।১১ই মাঘ

[৩] বর্দ্ধমানাধিপতির দানপত্র—

৺শ্রীশ্রীহরি শ্রীরাজা তিলকচন্দ্র বাহাদুর পরগণে চম্পানগরী তহশীল বৃদ্ধপাল মৌজে কাশীপুর, ও গয়রহ মথদুম কর্মচারী সুচরিতেষু—

লিখিতং কার্য্যঞ্চাগে শ্রীশ্রী৺খোসটিকুরীর সাহেবের চেরাগী জমি মৌজা হায়ে যে আছে সন ১১৪৮ সালের পর নাগাইত সন ১১৬৭ সাল দস্তখতে খাস দস্তখতে দেওয়ান সদর জমাবন্দী বাহাল মবলুক হস্তবুদে জমাজমি যে হইয়াছে এই সকল জমি বাহাল হইয়া ৺ইহার হুকুমনামা পূর্ব্বে পাইয়াছে। ভোগ পরিমাণ জমির ফসল ছাড়িয়া দিবে ইতি—সন ১১৭২ সাল তারিখ ২৮ মাঘ

(নিং শ্রীরাজা তিলোক)

[৫] রাজনগর-রাজের সনন্দ—

(ক) পার্শ্বেOমোহর রাজা মহম্মদ তকি খাঁ

রাজনগর

সাহা আবদুল্লা সাহেবের দরগাহার হিঙ্গন সাহা শ্রীঅভয়াচরণ বাড়ুজ্যা সিকদার সুচরিতেষু।

আগে তরফ × × সাহেব তোমার এতনাম পরগণে জৈহজাল দক্ষণ মৌজে শিরসা ও মৌজে পলাশী মৌজে সুলতানপুর ও মৌজে খুটীকুড়ীতে বাগাত ও

পুষ্করিণী শ্রী৺উহাতে নজর পান। ×× আটক হইয়াছিল, পুনহ বাহাল করা গেল। বদস্তুর সাবিক লেখ মাফিক লেখা দিবা। তাহার বিতং

মাফিক জমিদারের সনন্দ ১১৫৭ সাল ২৩ কার্ত্তিক
বাগাত ১৮০/বিঘা
নিজ খোষ্টীকুরী পুষ্করিণী ৭/বিঘা
মৌজে সীরশা ৬০/বিঘা
মৌজে পলাশী ৫০/বিঘা
মৌজে সুলতানপুর ৭০/বিঘা
সন ১১৬৭ সাল ২৭ মাঘ

(খ) রাজা মহম্মদ তকি খাঁ
রাজনগর

শ্রীঅভয়াচরণ বাড়ুজ্যা শিকদার সুচরিতেষু

আগে নিজ খুষ্টীকুরী ৺চেরাগী ও গয়রহ সাবিক যে সুরতে আছে এখন তা খুষ্টিকুরী সাবিক মালগুজারী মামুলী বাহাল রাখিল। তোমরা সাবিক দস্তুর খাজনা সমঝা লইবা। রেজায় তলব না করিবে। ইতি সন ১১৬৭। ২রা ফাল্গুন

[৬] ছাতনারাজের দানপত্র

সস্তি সামস্তাবনীনাথ রাজা শ্রীবলরাম নারায়ণ দেব মহোগ্রপ্রতাপানাং

শ্রীযুক্ত সাহসেন আলি সাহেব স্বচরিত্রেষু

ছাড়ি সনন্দ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে পরগণে ছাতন আমার জমিদারী মধ্যে মৌজে ছুবসরা আপনকার সাবেক পিরত্তর আটক হইয়াছিল। আপনার তরফ লোকের যাহেরে ও তসদিগাতে জানা গেল যে মৌজা মজকুর আপনকার সাহেব পিরত্ত। অতএব ছাড় সনন্দ দিলাম যে মাফিক সুদামত ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন আমাকে দোয়া করিয়া সেই মাফিক ভোগ দখল করিবেন। ইহাতে পঞ্চম ১৲ টাকা আছে তাহা সন সন দিবেন। এতদার্থে ছাড় সনন্দ দিলাম। ইতি সন ১২২৬।২৮ জ্যৈষ্ঠ।

বিবাহ আদি শুভকার্যে, অথবা কোন স্থানে পুত্রকন্যাদের কিম্বা নিজেদের যাতায়াতে ইঁহারা যেমন মৌলভীদের উপদেশ গ্রহণ করিতেন, তেমনি ব্রাহ্মণপণ্ডিতদেরও পরামর্শ লইতেন। এই কার্যের জন্য সেকালের কোন কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিত ইঁহাদের দেওয়া লাখরাজ ভোগ করিতেন, অথবা বৃত্তি প্রাপ্ত

হইতেন। উৎসবাদিতে ইহারা যেমন মঙ্গলডিহি ঠাকুরবাড়ীতে 'সিধা' পাঠাইতেন, তেমনি ঠাকুরবাড়ীর প্রেরিত উপহারাদিও ইহারা সাদরে গ্রহণ করিতেন। স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানগণ পরস্পরে যাহাতে প্রীতিতে বাস করিতে পারে খুশ্‌টিকুরির জমিদার-বংশ তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। আজিকার দিনেও সেখানে কাঠমোল্লার বিশেষ প্রতিপত্তি আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না।

মুলুক

(বৈষ্ণব ও শাক্তের মিলনপ্রচেষ্টা)

জলন্দার গড়ের জলন্দীর কথা বলিতেছি। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পুণ্যাবির্ভাবে দেশে নবজাগরণের অরুণোদয় হয়। বাঙ্গালার—বিশেষ পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়ের নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কৃতি-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অনুবর্তিগণ জাতিগঠনে অগ্রবর্তী হন। বীরভুম জেলার জলন্দার গড় জলন্দী এইরূপ একটি সংস্কৃতির কেন্দ্র। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সমসাময়িক মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ ধনঞ্জয় পণ্ডিতের একজন শিষ্য জলন্দার গড়ে আসিয়া বাস করেন। সে আজ প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বের কথা। জলন্দার গড়ের ঠাকুরগণ বলেন—ধনঞ্জয় পণ্ডিতের এই শিষ্য ও আত্মীয়ের নাম সঞ্জয় পণ্ডিত। প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্বে সঞ্জয় পণ্ডিতের বংশে যদুচৈতন্য ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। জলন্দার গড়ের ঠাকুরগণ ধনঞ্জয় পণ্ডিতের পরিবার ও সঞ্জয় পণ্ডিতের বংশ বলিয়া পরিচিত। ধনঞ্জয় পণ্ডিতের পূজিত শ্রীনরসিংহ বিগ্রহ জলন্দার গড়ে আজিও পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। যদুচৈতন্য ঠাকুর জলন্দায় শ্রীরাধাবিনোদ যুগলবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। যদুচৈতন্যের তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ রামজয়, ইহার বংশধরগণ জলন্দায় আছেন। মধ্যম পর রাম, ইঁহার দৌহিত্রগণ শ্রীরামপুরে বাস করেন। কনিষ্ঠ কানুরাম বা রামকানাই মুলুকে চলিয়া যান। মুলুক রামকানাই ঠাকুরের পাট নামে পরিচিত। বীরভূমে মুলুকের ঠাকুরবাড়ি সুপরিচিত। বীরভূমের বাহিরেও নানাস্থানে মুলুকের ঠাকুরবাড়ির শিষ্য আছে। বীরভূম-বোলপুরের একক্রোশ পূর্বে মুলুক গ্রাম। গ্রামে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সৎগোপ, বেনে, নাপিত, তাম্বূলী,

গোয়ালা, কলু, ধোপা, বাগ্দী, মুচি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি জাতির বাস। লোকসংখ্যা হাজারের কম হইবে না। বীরভূমের নানাস্থানে ঋষিমুনিদের আশ্রম ছিল এইরূপ প্রবাদ আছে। জলন্দার গড়ের কিছু দূরে আঙ্গোরায় অঙ্গিরার আশ্রম ছিল, মুলুকের নিকটবর্তী শিয়ান গ্রামে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম ছিল, মুলুকের অনতি উত্তরে ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা বিভাণ্ডকের আশ্রম ছিল ইত্যাদি নানারকমের প্রবাদ লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। শিয়ান গ্রামের পশ্চিমে পতিত ডাঙায় একটি বৃক্ষলতা সমাকীর্ণ স্থান ঋষ্যশৃঙ্গের এবং মুলুকের উত্তরে যেখানে মুনিকুণ্ড নামে একটি শীতপ্রস্রবণ আছে, সেই স্থানে বিভাণ্ডকের আশ্রম ছিল। আঙ্গোরাতেও দুইটি শীতপ্রস্রবণ আছে। শিয়ানের আশ্রমে পৌষ সংক্রান্তির মেলা হয়। মুনিকুণ্ডে অনেক লোক সে সময় স্নান করিয়া পুণ্যার্জন করে।

প্রবাদ আছে, শিয়ানে শ্বেতবসন্ত নামে এক রাজা ছিলেন। যাঁহারা সতের জন অশ্বারোহীর নবদ্বীপ বিজয়ের গুলির আড্ডার গালগল্পে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা রাঢ়ের পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিলে দেখিতে পাইবেন হিন্দুবীরের স্মৃতিজড়িত অসংখ্য ধ্বংসস্তূপ, মাঝে মাঝে মুসলমান শহীদ পীরের আস্তানা এবং শুনিবেন শ্বেতবসন্তের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার মর্মন্তুদ পরিণামের করুণ কাহিনী। বাঙ্গালা, এমন কি পশ্চিমবঙ্গে রাঢ়দেশও একদিনে বিজিত হয় নাই। সমগ্র দেশ অধিকার করিতে মুসলমানের বহুদিন গত হইয়াছিল। রাজধানী অধিকারের পরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাটোয়াল বা ঘাটরক্ষকগণ, সমৃদ্ধ পল্লীর ভূস্বামিগণ কিছুদিন এই বিদেশীদের বাধাদান করিয়াছিল। মুসলমানগণ ধর্মপ্রচারকের বেশে বা ভাগ্যান্বেষী সৈনিকরূপে এই সমস্ত ঘাটোয়াল বা ভূস্বামীর অধিকারে প্রবেশ করিয়া বিরোধ বাধাইয়াছে, পরে সেই বিরোধের ছল ধরিয়া গৌড়েশ্বরের বা নিকটবর্তী শাসনকর্তার নিকট নালিশ করিয়া সৈন্যের সাহায্য লইয়া সেই সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। কোথাও বা নিজে হত হইয়া শহীদ গাজিরূপে সম্মানিত হইয়াছে। এই বিরোধের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা এবং ষড়যন্ত্রের কাহিনীরও অসদ্ভাব নাই।

শিয়ানের শ্বেতবসন্ত রাজা মঙ্গলকোটের শ্বেতরাজার বংশধর। এই শ্বেতরাজাই অন্যতম বিক্রমাদিত্যরূপে পরিচিত। বীরভূমে বক্রেশ্বর তীর্থ মঙ্গলকোট বা উজানীর শ্বেতরাজারই প্রতিষ্ঠিত। সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইয়ুজের সেনাপতি মুলুকখান শ্বেতরাজাকে পরাজিত করিয়া গয়েসপুর ও মুলুকগ্রাম প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রবাদ আছে শ্বেতরাজার নিকট দুই জোড়া পায়রা ছিল।

রাজা অন্তঃপুরে রাণীকে বলিয়া গিয়াছিলেন, সাদা পায়রা উড়িয়া আসিলে বুঝিও জয় হইয়াছে, কাল পায়রা আসিলে জানিও কপাল ভাঙিয়াছে, তখন আপনার মর্যাদা আপনি রক্ষা করিও। যুদ্ধ জয়পূর্বক রাজা অন্তঃপুরে আসিয়া দেখিলেন পুররক্ষিগণ নীরবে দাঁড়াইয়া অশ্রুবিসর্জন করিতেছে। সংবাদে জানিলেন, কাল পায়রা উড়িয়া আসিয়াছিল। বুঝিতে পারিলেন, বিশ্বাসঘাতক পারাবত-রক্ষক মুলুক খানের উৎকোচে বশীভূত হইয়া কাল পায়রা উড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু তিনি আর শোক করিবার অবসর পাইলেন না। পরাজিত মুলুকখান সসৈন্যে রাজাকে আক্রমণ করিলেন। রাজা রণক্লান্ত দেহে পুররক্ষীদের লইয়াই রুখিয়া দাঁড়াইলেন এবং সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দিয়া বীরগতি প্রাপ্ত হইলেন। মুসলমান অধিকারের দুইশত বৎসরের মধ্যেই মুলুকের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। মারী-ভয়ে গ্রাম উজাড় হইয়া যায়। কতকগুলি গোয়ালা কিন্তু সেই দুর্দিনেও রক্ষা পাইয়াছিল। ইহারা লোয়ার, খয়রা, বাগদী, ভল্ল, ডোম প্রভৃতির সঙ্গে শ্বেত-রাজার সৈন্যদলে কাজ করিত। মুলুক খানের সঙ্গে যুদ্ধে ইহাদেরই পূর্বপুরুষ অকুতোভয়ে শ্বেতরাজার অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় বিধি বাম হইলেন। রাজ্য গেল, সৈন্য থাকিবে কোথায়? রাজা নাই, সৈন্য রাখিবে কে? অবশেষে সেকালের বীরের জাতি একালে কৃষি এবং পশুপালন জীবিকার অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিল। ইংরাজ পুলিশ এবং ম্যালেরিয়ার তাহাও সহ্য হইল না। দুইয়ে মিলিয়া ইহাদিগকে নির্বংশের পথে পাঠাইয়া দিল। মুসলমান যাহা করে নাই বা করিতে পারে নাই, ইংরাজ আমলে অতি সহজেই তাহার সুরাহা হইয়া গেল।

গোয়ালারা গরুমহিষের পাল লইয়া মাঝে মাঝে দুই দশদিনের মত গ্রাম ছাড়িয়া গ্রামান্তরে চলিয়া যাইত। একদিন তাহারা ঘরে ফিরিতেছে, শুনিল বনান্তরাল হইতে মধুর কীর্তনের সুর ভাসিয়া আসিতেছে। কাছে গিয়া দেখিল, গোধূলি-ধূসর বনচ্ছায়াতলে বসিয়া আছে এক ব্রাহ্মণ যুবক, তাঁহার চোখে জল, কণ্ঠে গান। মুখমণ্ডলের দিব্য কান্তি সন্ধ্যার অন্ধকারেও দেখা যাইতেছে। গোয়ালারা আদর করিয়া যুবককে গৃহে লইয়া গেল এবং মুলুকে বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিল। এই যুবকই জলন্দীর যদুচৈতন্য ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রামকানাই ঠাকুর। রামকানাই পিতার নিকট সংস্কৃত কাব্য-ব্যাকরণাদি এবং সঙ্গীত শিক্ষা করিতেন। শিক্ষায় অবহেলার জন্য পিতার নিকট তিরস্কৃত হইয়া গৃহত্যাগ করেন। পলাইবার পথে সন্ধ্যা আসিতেছে দেখিয়া তিনি মুলুকের নিকটবর্তী

জঙ্গলে এক বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। হৃদয় ভাবপ্রবণ, কণ্ঠও মধুর ছিল। আসন্ন সায়াহ্নে বনপথে গোরুর পাল গৃহে ফিরিতেছে দেখিয়া তাঁহার বৃন্দাবনের স্মৃতি মনে জাগে, তাই তিনি উত্তরগোষ্ঠের পদ গাহিতেছিলেন। সেই অবস্থায় গোয়ালাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ইহা প্রায় আড়াই শত বৎসরের কথা। বাড়ী তৈরীর জন্ত জঙ্গলের মধ্যে কতকটা স্থান মনোনীত করিয়া মাটি খুঁড়িতে গিয়া তিনি একটি দেবীমূর্তি প্রাপ্ত হন। দেবী দ্বিভূজা, উৎকুটুকাসনে উপবিষ্টা, হস্তদ্বয়ে অভয় ও বর মুদ্রা। একখানি অতি ছোট পাথরে মূর্তিটি ক্ষোদিত। রামকানাই অপরাজিতা নামকরণপূর্বক দেবীকে স্বগৃহে স্থাপনা করেন। শরতে নবম্যাদি কল্পারম্ভের দিন হইতে দেবীর নিকট চণ্ডীপাঠের এবং দুর্গাপূজার বিধিমত সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী এই চারিদিন দেবীর বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে। রামকানাই নিজ নামে শিব প্রতিষ্ঠাও করিয়াছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অনুবর্তিগণের মধ্যে পরবর্তীকালে যাঁহারা হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠায় অগ্রবর্তী হন, তাঁহাদের মধ্যে বীরভূম মঙ্গলডিহির পর্ণগোপাল ঠাকুর প্রধান ছিলেন এবং শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব নিরসনে যাঁহারা মনোনিবেশ করেন, তাঁহাদের মধ্যে মূলুকের রামকানাই ঠাকুর, এবং (বর্তমানে) বর্ধমান জেলার অজয়তীরস্থিত কোন্দা গ্রামের ঘনশ্যাম গোস্বামীর নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ-যোগ্য। দেশের লোকে রামকানাই ঠাকুরের অপরাজিতা পূজা দেখিয়া ছড়া গাঁথিয়াছিল—

মূলুকে অপরাজিতা মঙ্গলডিহে রাস।
ভুরকুণ্ডায় ডেঙ্গো ঠাকুর শুনতে উপহাস॥

বৈষ্ণবের গৃহে অপরাজিতা দুর্গাপূজা। মঙ্গলডিহির পাহুয়া ঠাকুরের বংশধরগণ সখ্যভাবের উপাসক; কিন্তু শ্রীশ্রীশ্যামচাঁদ, মদনগোপাল ঠাকুরের রাসযাত্রাই সেখানে প্রধান উৎসব। ভুরকুণ্ডায় ঠাকুরের বামে শ্রীমতী নাই। কোন্দার সম্বন্ধেও তেমনই ছড়া আছে—

ন্যাড়া নাচে পাঁঠা কাটে।
দেখে এলাম কোন্দার পাটে॥

অপরাজিতা প্রতিষ্ঠার পর রামকানাই শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ, শ্রীরাধাবল্লভ যুগলবিগ্রহ, শ্রীগোপাল বিগ্রহ এবং কতকগুলি শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য পূজা ও ভোগাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দেববিগ্রহের উদ্দেশ্তে তিনি নিত্য ষোল সের চাউলের অন্নভোগের ব্যবস্থা করেন। মূলুকে প্রথম প্রবেশের দিনের

সেই গোষ্ঠের স্মৃতি তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তাই গোষ্ঠযাত্রাই মুলুকে প্রধান উৎসব। এই উৎসবে নামকীর্তন ও লীলাকীর্তনের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন গন্ধাধিবাস। ঐদিন সন্ধ্যায় ঘটস্থাপন ও পূজাদির পর প্রতি-প্রভাতে প্রভাতী গান ও সন্ধ্যায় আরত্রিক গান হয়। গোষ্ঠাষ্টমী হইতে দ্বাদশী পর্যন্ত মেলা বসে, তবে উত্থান একাদশীর দিন মেলা জমে ভাল। দশমীর দিন প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত নামকীর্তন চলে। একাদশীর দিন পূর্বাহ্ণ হইতে লীলাকীর্তন আরম্ভ হয়। গোষ্ঠ, বনপর্যটন, বনভোজন, উত্তর-গোষ্ঠ, বাসকসজ্জা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা প্রভৃতি সারারাত্রি বিবিধ রসের গানের পর দ্বাদশীর দিন দ্বিপ্রহরে কলহান্তরিতায় মিলনগানে রসকীর্তনের পরিসমাপ্তি ঘটে। মেলায় নানা স্থান হইতে বহু যাত্রী, বহু কীর্তন গায়ক ও ন্যাড়া নেড়ী আউল বাউল দরবেশ প্রভৃতির সমাগম ঘটে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন হইতে ঠাকুরবাড়ীর সকলকেও বিশেষ সংযমে থাকিতে হয়। দ্বাদশীর দিন পর্যন্ত তাঁহাদের ক্ষৌরকর্মাদিও নিষিদ্ধ।

রামকানাইয়ের পৌত্র (গৌরচরণের পুত্র) বিশ্বম্ভর ঠাকুর যশস্বী কীর্তনগায়ক ও দেশপ্রসিদ্ধ পদকর্তা ছিলেন। ইঁহার কোন পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছিল কিনা বলা যায় না। পদকল্পতরুতে বিশ্বম্ভর ভণিতার দুইটি পদ আছে। আমরা কবির নিজের হাতের লেখা কাগজে কবির কয়েকটি গান পাইয়াছিলাম। একটি গান—

জাগিহো কিশোরী গোরি রজনী ভৈ ভোরে।
রতি অলসমে নিন্দ যাওত রসরাজহি কোরে॥
নীলবসন মণি অভরণ ভৈ গেয়ো বিথারে।
শাসু ননদী এ্যায়সে বিবাদি মনমে নাহি তেরে॥
নগরক লোক জাগি বৈঠল ক্যায়সে যাওব পুরে।
অরুণ উদয় হোই আওত শারী শুক ফুকারে॥
শুনি নাগর উঠি বৈঠল নাগরি করি কোরে।
বিশ্বম্ভর দাস ঝারি পুরি লেই ঠারি রহত দ্বারে॥

মুলুকে আর একজন কীর্তনীয়া ছিলেন—মহানন্দ দাস। জাতিতে বৈরাগী। পিতার নাম দিগম্বর দাস। ঠাকুরবংশের মহানন্দ ঠাকুর অল্প বয়সেই কীর্তন-গানে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। দাস মহাশয় তাঁহার নিকটই প্রথম শিক্ষা প্রাপ্ত হন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বত্রিশ বৎসর বয়সে সর্পাঘাতে মহানন্দ ঠাকুর

লোকান্তরিত হইলে মহানন্দ দাস বেড়গ্রামের দ্বারিক দাসের নিকট শিক্ষা শেষ করিয়া নিজে কীর্তনের দল করেন। মহানন্দ দাসের দলে খোল বাজাইতেন সেকালের দেশবিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক বীরভূম পায়র গ্রামের স্বনামধন্য জটে কুঞ্জ দাস। মুলুকের স্বর্ণপাতর (গোয়ালা) কুঞ্জ দাসের নিকট বাজনা শিখিয়া পরে মহানন্দ দাসের দলে খোল বাজাইতেন।

গল্প আছে—রামকানাই ঠাকুর কৃষাণদের জন্য মাঠে ভাত লইয়া গিয়াছিলেন। মুসলমান জমিদার সেই সময় তাঁহাকে ব্রহ্মত্র দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় ঠাকুর এক স্থানে দাঁড়াইয়াই কতকগুলি ভাত ছড়াইয়া স্থান চিহ্নিত করিয়া দেন। সেই বহুবিস্তৃত ভাতুরিয়ার মাঠ এখনো ঠাকুরবংশের লোকে ব্রহ্মত্র ভোগ করিতেছেন। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণ, গ্রহাচার্য ও তাঁহাদের পূজিত দেব-বিগ্রহের উদ্দেশে মুসলমান জমিদারের দেওয়া বহু নিষ্কর ভূমি আজিও পাকিস্তানকে বিদ্রূপ করিতেছে।

রাঢ়াপুরী

কৃষ্ণ মিশ্র প্রণীত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকে 'রাঢ়াপুরী'র নাম পাওয়া যায়। নাটকের অন্যত্র 'রাঢ়া' জনপদেরও উল্লেখ আছে। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রবেশক অহঙ্কার বলিতেছে—"গৌড়রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি 'রাঢ়া পুরী' ভূরিশ্রেষ্ঠিক নাম ধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা।" চতুর্থ অঙ্কের বিষ্কম্ভকে শ্রদ্ধার উক্তি—"দেব্যা এষ দেবমুক্তম্। অস্তি 'রাঢ়া'ভিধানো জনপদ। তত্র ভাগীরথী পরিসরালঙ্কারভূতে চক্রতীর্থে বিবেক উপনিষদ্দেব্যাঃ সঙ্গমার্থং তপস্তপস্ততীতি।"

রাঢ়াপুরী, ভূরিশ্রেষ্ঠী, চক্রতীর্থ প্রভৃতি নাম কাল্পনিক নহে। ভারতচন্দ্রের কল্যাণে ভূরিশ্রেষ্ঠী ভুরশুটের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। 'ভুরশুটে মহাকায় নৃপতি নরেন্দ্র রায়' ভারতচন্দ্রের মহিমায় অমর হইয়া গিয়াছেন। রাঢ়ের গৌরবের দিনে ভাগীরথী-প্রবাহ যে পথ দিয়া প্রবাহিত হইত, এই দুর্দশার দিনেও সে ধারা হয়তো সেই পথেই বহিয়া চলিয়াছে। ভাগীরথী পরিসরালঙ্কারভূত চক্রতীর্থের কথা বোধ হয় ধোয়ীর পবনদূতেও পাওয়া যায়।

'ভাগীরথ্যাস্তপনতনয়া যত্র নির্যাত দেবী

... ...

সংসর্পন্তীং প্রকৃতিকুটিলাং দর্শিতাবর্তচক্রাং

তামালোক্য ত্রিদশসরিতো নির্গতামম্বুগর্ভাৎ'

আমাদের মনে হয় ত্রিবেণীর পরবর্তী কোন স্থান চক্রতীর্থ নামে খ্যাত ছিল, এবং 'দর্শিতাবর্তচক্রাং' কথায় তাহারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে মুর্শিদাবাদ জেলার বর্তমান 'চাকৃটা আনখোনা' পাশাপাশি দুইটি গ্রামের 'চাকৃটা' গ্রাম প্রাচীন চক্রতীর্থের স্মৃতি বহন করিতেছে। চাকৃটা হইতে গঙ্গা অধিক দূরবর্তী নহে।

প্রবোধচন্দ্রোদয়ের পঞ্চমাঙ্কের প্রবেশকের ঘটনাস্থলও চক্রতীর্থ। ষষ্ঠাঙ্কে মন্দর শৈলস্থ মধুসূদন-মন্দিরের উল্লেখ আছে। এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয়

নাট্যকার ঘটনাস্থলগুলির কাল্পনিক নাম ব্যবহার করেন নাই। তিনি এতদঞ্চলের জনপদ ও তীর্থাদির নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং রাঢ়াপুরী বা রাঢ়া জনপদও নাট্যকারের কল্পনাপ্রসূত নহে। 'রাঢ়াপুরী' তবে কোথায়? আমরা রাঢ়দেশের কথাই জানি। বর্তমানে রাঢ়াপুরী নামে কোন জনপদ রাঢ়দেশে নাই। অবশ্য এখন নাই, কিন্তু তখন নিশ্চয়ই ছিল। কোথায় ছিল?

এলাহাবাদ হইতে ঝান্সী যাইবার রেলপথে 'মহোবা' অন্যতর স্টেশন। মহোবার 'কীর্তিসাগর' 'মদনসাগর' প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সরোবর এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ধ্বংসস্তূপগুলি তাহার অতীত গৌরবের পরিচয়। অদূরে ইতিহাস-বিখ্যাত কালঞ্জরের সুপ্রাচীন গিরিদুর্গ, এবং কিছুদূরে চন্দেল্লরাজগণের কীর্তিভূষিত মধ্যভারতের শিরোভূষণ খাজুরাহো। এই সমস্ত স্থান—সমগ্র বুন্দেলখণ্ডই এক সময় একই নরপতির শাসনাধীন ছিল। কৃষ্ণ মিশ্র এই মহোবার অধিপতি চন্দেল্লরাজ কীর্তিবর্মার সভাকবি ছিলেন। কীর্তিবর্মার ব্রাহ্মণ সেনাপতি গোপাল যুদ্ধে দিগ্বিজয়ী চেদীরাজ কর্ণকে (জব্বলপুরের নিকটবর্তী নর্মদাতীরস্থিত ত্রিপুরী ইহার রাজধানী ছিল) পরাস্ত করিলে গোপালের অভ্যর্থনার জন্যই 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' রচিত হয়। ঐতিহাসিকগণ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগ এই নাটকের রচনাকাল নির্দেশ করিয়া থাকেন। চন্দেল্লরাজগণ গৌড় এবং রাঢ়ের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কীর্তিবর্মার পূর্ববর্তী রাজা ধঙ্গ ও তৎপূর্ববর্তী যশোবর্মার রাঢ় ও গৌর অভিযানের কথা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। সুতরাং কৃষ্ণ মিশ্রের নাটকে এদেশের পুর, জনপদাদির কোন কাল্পনিক নাম ব্যবহারের কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

'বীরভূম বিবরণ' ১ম খণ্ড সংকলনকালে (১৩২৩ সাল) আমরা অনুমান করিয়াছিলাম যে জয়দেব-কেন্দুলী হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ দক্ষিণস্থিত 'আড়া' গ্রামই প্রাচীন রাঢ়াপুরীর স্মৃতি বহন করিতেছে। (শ্যামারূপার গড়কাহিনী, ২৩৭ পৃঃ) দীর্ঘকাল অতীত হইল এ বিষয়ে কোনো আলোচনা হয় নাই। সত্য নির্ণয়ের জন্য বিষয়টি ঐতিহাসিকগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি। দামোদর নদের উত্তরতীরবর্তী রেলওয়ে স্টেশন দুর্গাপুর হইতে কিছু কম প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরে 'আড়া' নামে গ্রাম আছে। গ্রামের পূর্বপ্রান্তে জঙ্গলাকীর্ণ একটি অনতিবিশাল ধ্বংসস্তূপ পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুর্গাপুর হইতে যে রাজপথ এই ধ্বংসস্তূপের পাশ দিয়া অজয়ের দক্ষিণতীরস্থিত শিবপুর গ্রাম পর্যন্ত

আসিয়াছে, সেই পথের উপরেই 'আড়া' গ্রামের প্রসিদ্ধ 'রাঢ়েশ্বর' শিবের মন্দির। সাধারণ লোকে গ্রামকে যেমন 'আড়া' বলে, শিবকেও তেমনি 'আড়েশ্বর' শিব বলিয়া থাকে। আমাদের মনে হয় এই 'আড়া'ই প্রবোধচন্দ্রোদয়ের 'রাঢ়াপুরী'।

এই গ্রামের চতুষ্পার্শ্ববর্তী ধ্বংসস্তূপ হইতে বহু মন্দির ও আবাসবাটির প্রস্তরময় ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইতোমধ্যেই স্থানীয় লোকে একটি নদীর সেতু প্রস্তুতের কাজে এবং নিজেদের গৃহাদিতে ব্যবহার জন্য এইরূপ ভিত্তি খুঁড়িয়া প্রচুর প্রস্তর সংগ্রহ করিয়াছে। পাথরগুলি চৌকা করিয়া কাটা। এই জাতীয় পাথর বাঁকুড়ার শুশুনিয়া কিংবা সাঁওতাল পরগণার তরুণী পাহাড় প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত বলিয়া মনে হয়। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে একটি স্থান গড়দুয়ার নামে পরিচিত। পূর্ব প্রান্তে কতকটা স্থানকে লোকে বাজীগড় বলে। গড়দুয়ারে প্রাচীর বা দুয়ারের কোন ধ্বংসাবশেষ নাই। বাজীগড়ের নিকটে কিছু কিছু প্রস্তর ও প্রাচীরের অবশেষ পড়িয়া আছে। পরিখা ও প্রাচীরের ক্ষীণ চিহ্ন দেখিয়া ইহার প্রাচীনত্ব অনুমিত হয়। গ্রামে ও তাহার চারিপাশে কতকগুলি বড় বড় দীঘি আছে। প্রবাদ শুনিতে পাই, শতাধিক বৎসর পূর্বে এই গ্রামে সাহজাদ রায় নামক একজন জমিদার বাস করিতেন। তিনিই কয়েকটি দীঘির পঙ্কোদ্ধার করাইয়াছিলেন, অপর কয়েকটি তাঁহারই ব্যয়ে খনিত।

সাহজাদ রায়ের সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, "তিনি এক সন্ন্যাসীর কৃপায় তন্ত্রমতে সাধনা করিয়া নায়িকা-সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইঁহার পূর্ব নাম ভুবন রায়। ইনি অতি দীনাবস্থা হইতে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়া নবাবের নিকট সাহজাদ উপাধি লাভ করেন। একদিন বীরভূমের সিঙ্গুর গ্রামনিবাসী সাধক বিরূপাক্ষ সাহজাদের সিদ্ধিলাভের কথা শুনিয়া আড়ায় গিয়া উপস্থিত হন। সাহজাদ প্রত্যহ নিজ ইষ্টদেবীর দর্শন পাইতেন। বিরূপাক্ষ সাহজাদের ইষ্টদেবীর দর্শন প্রার্থনা করিলে ইষ্টদেবী বলেন যে, আমি বিরূপাক্ষের উপাস্যা অম্বিকা নহি, আমি অম্বিকার দাসী মাত্র। অতঃপর নায়িকা গিয়া অম্বিকাকে বিরূপাক্ষের কথা বলিলে দেবী বলেন যে, 'বিরূপাক্ষের গুরুদত্ত মন্ত্র অশুদ্ধ। শুদ্ধ মন্ত্র আমি লিখিয়া দিতেছি; এই মন্ত্রে উপাসনা করিলে আমি তাহাকে দর্শন দিব'। শুনিয়া বিরূপাক্ষ বলেন যে 'আমার গুরুদত্ত মন্ত্রই শুদ্ধ, আমি দেবীর দর্শন চাহি না'। তাঁহার গুরুভক্তি দেখিয়া দেবী তাঁহাকে দর্শন দেন, বিরূপাক্ষ তখন একটি শিলাসনে বসিয়া মন্ত্র জপ করিতেছিলেন। গুরুদত্ত মন্ত্র অশুদ্ধ বলায় তিনি দেবীর উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। দেবী বর প্রার্থনা করিতে বলিলে তিনি প্রার্থনা করিলেন যে

আমি যখন যেখানে জপে বসিব তুমি এই শিলাসনখানি বহিয়া দিবে। কিছু দিন এইরূপে আসনখানি বহিয়া দেবী সাহজাদকে উক্ত প্রস্তরখণ্ড চাহিয়া লইতে বলেন। সাহজাদ বিরূপাক্ষের নিকট হইতে পাথরখানি লইয়া তদ্দ্বারা একটি শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করাইয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। লোকে বলে সেই শিবলিঙ্গই রাঢ়েশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। পাথরখানি লওয়ার জন্য বিরূপাক্ষের পুত্র কবীন্দ্রের শাপে সাহজাদ শ্রীহীন হন।"

কবীন্দ্র কেন্দুলা জগন্নাথপুর গ্রামে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। কেন্দুলায় মহিষমর্দিনী দেবী কবীন্দ্রের প্রতিষ্ঠিতা। আড়া ও কেন্দুলা গ্রাম অধুনা বর্ধমান জেলার অন্তর্গত। কাহারও কাহারও মুখে শুনিয়াছি, ভুবন রায় বাল্যে গরু চরাইতেন। তিনি জঙ্গলের মধ্যস্থিত কোন (পূর্বোক্ত ধ্বংসস্তূপে) স্থানে প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই অর্থেই তাঁহার অবস্থার উন্নতি হয়। তিনি বিষয়-সম্পত্তি খরিদ করিয়া জমিদার হইয়া বসেন। অবস্থার উন্নতির সঙ্গে তাঁহার ধর্মভাব বর্ধিত হয়, তিনি প্রাচীন রাঢ়েশ্বর শিবের মন্দির ও দীর্ঘিকাদির সংস্কার সাধন করেন। সাধনার কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু শিব প্রতিষ্ঠার কথায় সন্দেহ হইতেছে; কারণ লোকে নিজ নামেই শিব প্রতিষ্ঠিত করে। শিবের রাঢ়েশ্বর নাম দেখিয়া মনে হয় তিনি পুরানো শিবলিঙ্গের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং মন্দিরাদি প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। মন্দিরের নিকটস্থিত একটি দীঘি 'মহাকাল দীঘি' নামে পরিচিত। আর একটি দীঘির নাম 'রমণা'।

গ্রামের দক্ষিণে এক গ্রামদেবী আছেন, নাম 'অখিলেশ্বরী'! মূর্তিটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কে বা কাহারা মূর্তির সম্মুখ-ভাগ চাঁছিয়া তুলিয়া দিয়াছে। মূর্তির দুই পার্শ্বে দুইটি কদলীবৃক্ষ, মাথার উপরে সর্পের সাতটি ফণা ছত্রাকারে সজ্জিত। দেবী দ্বিভুজা, ভগ্ন পাদপীঠে একটি হস্তী খোদিত রহিয়াছে। বেদীর উপরে বৃক্ষমূলে আরও কয়েকটি ভগ্ন মূর্তি, একটি বাসুদেব-মূর্তি, একটি তারামূর্তি এবং অপর দুই একটি অজ্ঞাত মূর্তির ভগ্নাবশেষ। তারামূর্তির দুই পার্শ্বে দুই ছত্র লিপি ছিল, এক ছত্র একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, অপর ছত্রের একটি কি দুইটি অক্ষর পড়া যায় মাত্র। তাহার দুই পার্শ্বে পঞ্চ মহাভয়ের মূর্তি প্রায় অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। মূর্তির ভাস্কর্য-ধারায় পালরাজত্বের প্রথম ভাগের শিল্পরীতির প্রভাব লক্ষিত হয়। গ্রামের মধ্যে ধর্মরাজতলায় পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের মূর্তিযুক্ত একটি ভগ্নমূর্তি ধর্মরাজ নামে পূজা পাইতেছেন। গঠনপ্রণালী দেখিয়া এ মূর্তিগুলিও পালরাজাদের সময়ের পুরানো বলিয়া মনে হইয়াছে।

চন্দেলরাজ ধঙ্গ যখন রাঢ়দেশ জয় করেন, সেই সময় যাঁহারা এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই কাহারো নিকট হইতে কৃষ্ণ মিশ্র বোধ হয় রাঢ়াপুরী ভূরীশ্রেষ্ঠী প্রভৃতি নগরীর বিবরণ অবগত হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণের মতানুসারে ধঙ্গ খ্রীষ্টীয় ১০০২ অব্দে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই অঙ্গদেশ ও রাঢ় জয় করেন।

মধ্যভারতের খাজুরাহোর বিশ্বনাথ-মন্দিরে ধঙ্গের যে লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায়, তিনি যুদ্ধে রাঢ়ের রানীকে বন্দিনী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

'কাত্বং কাংচী নৃপতিবনিতা কা ত্বমন্ধ্রাধিপত্নী
কা ত্বং রাঢ়া-পবিবৃঢ়বধূঃ কা তমঙ্গেন্দ্রপত্নী।
ইত্যালাপাঃ সমরজয়িনো যস্য বৈরিপ্রিয়াণাং
কারাগারে সজলনয়নেন্দীবরাণাং বভূবুঃ ॥'

এপিগ্রাফিক ইনডিকা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৫

এই রাঢ়াধিপ কে? ধঙ্গ কাহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন? প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন 'এদিকে রাঢ়দেশে সমরে পরাজিত হইয়া হয় ত বিগ্রহপাল ধঙ্গের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন এবং হয়ত কিছুদিনের জন্ত তাঁহাকে সস্ত্রীক চন্দেল্ল কারাগারে বাস করিতে হইয়াছিল।' (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ড ১৭২ পৃঃ)। 'রাজন্যকাণ্ডের ১৭৪ পৃষ্ঠায় কিন্তু লেখা আছে—'প্রায় ৯৮০ হইতে ৯৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কম্বোজ দলন করিয়া তিনি (মহীপাল) সমস্ত উত্তরবঙ্গ উদ্ধারে সমর্থ হন'। ৯৯০ মধ্যে মহীপাল যদি উত্তরবঙ্গ উদ্ধারে সমর্থ হইলেন, তাহা হইলে ১০০২ খ্রীষ্টাব্দে ধঙ্গ আর বিগ্রহ-পালকে বন্দী করিতে পাইলেন কোথায়? বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর না মহীপাল অনধিকৃত বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন?

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহীপালের মৃত্যু হইয়াছিল। কারণ মহীপালদেবের রাজ্যকালে (?) সারনাথে ১০৮৩ সংবতে (১০২৬ খ্রীঃ) যে লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল তাহাতে 'প্রবর্ধমান' বা 'কল্যাণ বিজয় রাজ্যে' ইত্যাদি কোন পদ ব্যবহৃত হয় নাই (বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২৫৭-২৫৮)। মজঃফরপুর জেলায় ইমাদপুরে মহীপালদেবের ৪৮শ রাজ্যাঙ্কে কতকগুলি পিত্তলমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া রাখালবাবু লামা তারানাথ-কথিত

মহীপালের বায়ান্ন বৎসর রাজ্য করিবার কথা ঐতিহাসিক সত্যরূপে মানিয়া লইয়াছেন। এই হিসাবে খ্রীষ্টীয় ৯৭৫ অব্দে মহীপালের রাজ্যারোহণ সাল নির্ণয় করিতে হয়। সুতরাং তিনি যে বলিয়াছেন দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বের শেষ ভাগে অথবা প্রথম মহীপালের রাজ্যারম্ভকালে রাঢ় ও অঙ্গ ধঙ্গদেব কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয় (বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম খণ্ড নবম পরিচ্ছেদ) সে কথাও গ্রহণ করা চলে না। তাহা হইলে ধঙ্গ কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ?

ইতিহাসে খোদিত লিপিমালায় এ পর্যন্ত আমরা দুইজনকে রাঢ়াধিপরূপে দেখিতে পাইয়াছি ; একজন ১ম মহীপালদেব, রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলৈ লিপিতে ইনি উত্তর রাঢ়ের অধিপতিরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে মহীপাল তখন গৌড়েশ্বররূপেই পরিচিত। কারণ যে "কম্বোজান্বয়জ-গৌড়পতি" দ্বিতীয় বিগ্রহপালকে পরাস্ত করিয়া মহীপালের পিতৃরাজ্যে অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছিলেন, সিংহাসন গ্রহণের নবম রাজ্যাঙ্কের পূর্বেই তিনি সেই গৌড়পতিকে পরাস্ত করিয়া পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। কম্বোজান্বয়জ-গৌড়পতির বাণগড় স্তম্ভলিপি হইতে জানা যায়—

দুর্বারারি বরূথিনী প্রমথনে দানে চ বিদ্যাধরৈঃ
সানন্দং দিবি যস্য মার্গণগুণ গ্রামগ্রহো গীয়তে।
কম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দু মৌলেরয়ং
প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ ভূভূষণঃ ॥

"যাঁহার দুর্বার শত্রুসৈন্য বিনাশ, দান এবং ধনুর্গুণ গ্রহণের দক্ষতার কথা বিদ্যাধরগণ সানন্দে স্বর্গলোকে গান করে, সেই কম্বোজান্বয়জ-গৌড়পতি 'কুঞ্জরঘটাবর্ষ' কর্তৃক ভুবনের অলঙ্কারস্বরূপ এই ইন্দুমৌলির (শিব) মন্দির নির্মিত হইল।" ইতঃপূর্বে ঐতিহাসিকগণ কেহ কেহ কুঞ্জরঘটাবর্ষ শব্দের অন্য অর্থ ধরিয়াছেন। আমাদের মনে হয় রাষ্ট্রকূট রাজ্যের অধিপতিগণের যেমন ধারাবর্ষ, অকালবর্ষ, অমোঘবর্ষ, প্রভূতবর্ষ প্রভৃতি উপাধি ছিল, ইঁহারও সেইরূপ 'ঘটাবর্ষ' উপাধি ছিল। কম্বোজান্বয়জ-গৌড়পতি সম্বন্ধে নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের মতের মোটামুটি মর্ম এইরূপ, দক্ষিণ পশ্চিম ভারতে অধুনা 'কাম্বে নামে পরিচিত স্থানই গরুড় পুরাণোক্ত কম্বোজ, এবং ইহা রাষ্ট্রকূট রাজ্যের সামন্তরাজ্য ছিল। কম্বোজান্বয়জ-গৌড়পতি (কুঞ্জরঘটাবর্ষ ?) এই কম্বোজেরই অধিবাসী এবং ইনি রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্রের সামন্তরূপে

কিছুদিন গৌড় শাসন করিতে আসিয়া পরে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরা ইহা সম্ভব বলিয়া মনে করি। মনে হয় স্বাধীনতা অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে ইনি 'ঘটাবর্ষ' উপাধিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দেল্লরাজ যশোবর্মা দেবের গৌড় আগমনের (৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের) পরে আমরা এই ঘটনার সময় নির্দেশ করি। রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের পৌত্র তৃতীয় ইন্দ্র যে সময় কান্যকুব্জ আক্রমণ করিয়া রাজধানী বিধ্বস্ত করেন এবং তাঁহার মহাসামন্ত নরসিংহ যে সময় পলায়নপর কান্যকুব্জরাজ মহীপালের (ইনি বঙ্গের পালসম্রাট ১ম মহীপাল নহেন) অনুসরণে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হন, সেই সময়ে এই কুঞ্জরঘটাবর্ষ কর্তৃক গৌড় অধিকৃত হয়।

যে বাণগড়ে এই কম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, মহীপালদেব সমগ্র উত্তরবঙ্গ জয় করিয়া বাণগড়ের সমীপবর্তী (?) পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তঃপাতী কোটিবর্ষ বিষয়ে 'গোকলিকা' মণ্ডলে কুরটপল্লিকা গ্রাম কৃষ্ণাদিত্য নামক এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। এই দানের তাম্রশাসন বাণগড় হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং ইহাই প্রথম মহীপালের 'বাণগড় লিপি' নামে পরিচিত। এই লিপি হইতেই জানিতে পারি, রাজ্যের নবমবর্ষের পূর্বেই তিনি—

> "হত সকল বিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহু দর্পাদনধিকৃত বিলুপ্তং
> রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যং।
> নিহিত চরণপদ্মো ভূভৃতাং মূর্দ্ধ্নি তস্মাদভবদবনীপাল
> শ্রীমহীপালদেবঃ॥"

"যুদ্ধে বিপক্ষ সকলকে বাহুদর্পে হত ও অনধিকৃত বিলুপ্ত-পিতৃরাজ্যের উদ্ধার-সাধনপূর্বক অপরাপর ভূমিপতিগণের মস্তকে চরণপদ্ম স্থাপন করিয়া শ্রীমহীপালদেব অবনীপাল হইয়াছেন।" সুতরাং বলিতে হয় প্রথম মহীপাল তখন গৌড়েশ্বর রূপেই খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, ধঙ্গ যে ইহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, কিম্বা ইহাকে রাঢ়াধিপ বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। চন্দেল্ল রাজবংশ পূর্ব হইতেই গৌড়ের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু রাজেন্দ্র চোলের ইতিহাস অন্যরূপ। তিনি পাল সম্রাটের কয়েকজন সামন্তকে জয় করিয়া গঙ্গা পার হইবার পথেই উত্তর রাঢ়ে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কি জন্য জানি না তিনি মহীপালকে গৌড়েশ্বর বলিয়া উল্লেখ করাও আবশ্যক মনে করেন নাই। তিনি যে মহীপাল কর্তৃক পরাজিত

হইয়াছিলেন, 'চণ্ডকৌশিক' নাটক হইতেই তাহা অনুমিত হয়। এই নাটকে কর্ণাটকগণ নবনন্দ এবং মহীপাল চন্দ্রগুপ্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন—

যং সংশ্রিত্য প্রকৃতি গহনামার্য চাণক্যনীতিং
জিত্বা নন্দান্ কুসুমনগরং চন্দ্রগুপ্তো জিগায়।
কর্ণাটত্বং ধ্রুবমুপগতানদ্য তানেব হন্তুং
দোর্দ্দিপাঢ্যঃ স পুনরভবৎ শ্রীমহীপালদেবঃ॥

এখানে কর্ণাটক বলিতে রাজেন্দ্র চোল ও তাঁহার সেনাগণকে বুঝাইতেছে ইহা মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। চাণক্যনীতি অবলম্বনেই গৌড়েশ্বর তাঁহাকে উত্তর রাঢ়ে গিয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন। (আর্য্য ক্ষেমীশ্বর-প্রণীত) চণ্ডকৌশিক নাটক মহীপাল দেবের বিজয়োৎসব উপলক্ষেই রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় 'রাঢ়াধিপ' 'মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের বৃদ্বপ্রপিতামহ'। ঈশ্বর ঘোষ ইহাকে রাঢ়াধিপ বলিয়াছেন, অথচ নাম করেন নাই। তিনি পিতা, পিতামহ প্রপিতামহের নাম করিয়াছেন, প্রত্যেকের কিছু কিছু বিশেষণও লিখিয়াছেন, কিন্তু যিনি ইঁহাদের সকলের অপেক্ষা সম্মানিত পদবীতে আরূঢ় ছিলেন, তাঁহার নাম না করিবার হেতু কি? আমাদের মনে হয় এই অজ্ঞাতনামা রাঢ়াধিপই ধঙ্গের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিলেন। তাই ঈশ্বর ঘোষ তাম্রশাসনে তাঁহাকে রাঢ়াধিপ মাত্রই বলিয়াছেন, নিজের গৌরবের দিনে স্বীয় বংশের বিস্মৃতপ্রায় পরাজয়কাহিনীর স্মারক তাঁহার নাম গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করেন নাই। রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয়ের পথে পাল সামন্তচক্রের প্রত্যেকেই—দণ্ডভুক্তিপতি ধর্মপাল, দক্ষিণ রাঢ়ের রণশূর এবং বঙ্গের গোবিন্দচন্দ্র যেমন সম্মুখ সংগ্রামে বাধা দিয়াছিলেন, তেমনই ধঙ্গ যখন কাঞ্চী এবং অন্ধ্রদেশ জয় করিয়া রাঢ়ের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন ঈশ্বর ঘোষের বৃদ্ধপ্রপিতামহ হয়ত রণক্ষেত্রে তাঁহার গতি প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। এই সময়ে অঙ্গদেশে কোন্ ব্যক্তি পালবংশের সামন্ত নরপতি ছিলেন তাহা জানা যায় না। মহীপালদেবের রাজ্যের ৪৮শ বৎসরে যে তীরভুক্তি তাঁহার অধিকারে ছিল, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। তৎপূর্বেই মগধ এমন কি কাশী পর্যন্ত তিনি অধিকার করিয়াছিলেন। এই সমস্ত দেশ যে মহীপালের রাজ্যকালে তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল, আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত কোন দেশের কোন তাম্রশাসন বা শিলালিপি হইতে তাহা প্রমাণিত হয় নাই। মাত্র দেখিতে পাই যে চেদীরাজ গাঙ্গেয়দেবের সঙ্গে যুদ্ধে ১০১৯ খ্রীষ্টাব্দের দিকে মিথিলার কিয়দংশে

মহীপালদেব অধিকারচ্যুত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া মনে হয় রাঢ়াধিপের সঙ্গে যুদ্ধের পর স্বদেশে ফিরিবার পথে রাঢ়াধিপের মত অঙ্গরাজ্যের কোন সামন্তের সঙ্গেও তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। আমাদের অনুমান, ঈশ্বর ঘোষের বৃদ্ধপ্রপিতামহ রাঢ়াপুরীরই অধীশ্বর ছিলেন এবং এই জন্যই তিনি রাঢ়াধিপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। অনধিকৃত বিলুপ্ত-পিতৃরাজ্য প্রথম মহীপাল যখন রাঢ়ের নিভৃত প্রদেশে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন হয়ত ঈশ্বর ঘোষের ঐ বৃদ্ধপ্রপিতামহ মহীপালকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন তাই তিনি সম্মানিত রাঢ়াধিপ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এরূপ বিশ্বস্ত, রাজভক্ত এবং বীরত্বাভিমানী ছিলেন বলিয়াই তিনি বোধ হয় গৌড়ীয় সেনা সাহায্যার্থে আসিবার পূর্বেই ধঙ্গকে বাধা দিয়াছিলেন, কিংবা বৃদ্ধবয়সে অতর্কিত আক্রমণে পরাস্ত হইয়াছিলেন। হয়ত সে সময় গৌড়েশ্বর অন্যত্র যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। তথাপি যে ধঙ্গ গৌড় আক্রমণ করেন নাই, নিশ্চয় তাহার অন্য কোন কারণ ছিল।

অথবা এমনও হইতে পারে যে, এই রাঢ়াধিপ কম্বোজান্বয়জ-গৌড়পতি কুঞ্জরঘটাবর্ষের অনুরক্ত ও গুপ্তসহায়ক ছিলেন। কুঞ্জরঘটাবর্ষের পরাজয়ের পর গৌড়েশ্বর আর রাঢ়াধিপকে আক্রমণ করা উচিত মনে করেন নাই। অথবা কোন রাজনৈতিক কারণে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াই চলিতেছিলেন। এমন সময় ধঙ্গ আসিয়া রাঢ়দেশ আক্রমণ করিলেন। গৌড়েশ্বর গৌড়-সীমান্ত সুরক্ষিত করিয়া রাঢ়যুদ্ধের পরিণাম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে রাঢ়াধিপ বন্দী অথবা নিহত হইলেন। রাঢ়যুদ্ধে ক্লান্ত চন্দেল্লরাজ আর গৌড় আক্রমণে সাহস করিলেন না। তিনি প্রত্যাবর্তনপথে পাল-সামন্তচক্রের অঙ্গাধিপতিকে জয় করিয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন। মনে হয়, এই যুদ্ধের পরই রাঢ়াধিপের পুত্র ধূর্ত ঘোষ রাঢ় পরিত্যাগপূর্বক কিছুদিনের জন্য অন্যত্র প্রস্থান করিয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর অনুকূল থাকিলে তিনি দেশত্যাগ করিতেন কি না সন্দেহ এবং তিনি রাঢ়দেশে বর্তমান থাকিলে আমরা নিশ্চয়ই তাঁহাকে রাজেন্দ্র চোলের সম্মুখে উপস্থিত দেখিতে পাইতাম। কারণ সেকালে রাঢ়দেশবাসী বা বঙ্গবাসী কেহ শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ বা বিনাযুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতেন না। আমাদের মনে হয়, রাঢ়াধিপের পতনের পর গৌড়েশ্বর উত্তর রাঢ়ের সীমা দামোদরের তীর পর্যন্ত বাড়াইয়া দেন, এবং আরও দক্ষিণে দক্ষিণ রাঢ়ে (গড় মান্দারণে) রণশূরকে ও দণ্ডভুক্তিতে (মেদিনীপুরে) ধর্মপালকে সীমান্তরক্ষক সামন্তরূপে বরণ করেন। রাজেন্দ্র চোলের অভিযানের সময় তাই তাঁহার প্রতিরোধকরূপে আমরা রণশূর

ও ধর্মপালকেই দেখিতে পাই এবং এই দুই সামন্তের বাধা অতিক্রমপূর্বক রাজেন্দ্র চোল অগ্রসর হইয়া আসিলে স্বয়ং গৌড়েশ্বরকে উত্তর রাঢ়ের রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে দেখি। অবশ্য এ সমস্তই আমাদের অনুমান মাত্র। আশা করি, পাঠকগণ সমস্ত দিক আলোচনাপূর্বক বিষয়টির যুক্তিযুক্ততা বিচার করিবেন। আমরা অতঃপর ঈশ্বর ঘোষের কুলপরিচয় উদ্ধৃত করিতেছি।

ঈশ্বর ঘোষের কুলপরিচয় এইরূপ—

বভূব রাঢ়াধিপ লব্ধজন্মা তিগ্মাংশু চণ্ডো নৃপবংশকেতুঃ। শ্রীধূর্তঘোষো নিশিতাসিধারা নির্বারিতারিব্রজগর্বলেশঃ॥ আসীত্ততোঽপি সমরব্যবসায়সার বিস্ফূর্জিতাসিকুলিশক্ষত বৈরীবর্গং। শ্রীবালঘোষ ইতি ঘোষ-কুলাব্জজাত মার্ত্তণ্ড মণ্ডলমিব প্রথিত পৃথিব্যাং॥

তস্মা ভবদ্ধবলঘোষ ইতি প্রচণ্ডঃ সুতো জগতি গীত মহাপ্রতাপঃ। যেনেহ যোধ তিমিরৈক দিবাকরেণ বজ্রায়িতং প্রবলবৈরিকুলাচলেষু॥

ভবানী বা পরা মূর্ত্যা সীতেব চ পতিব্রতা
সম্ভাবা নাম তস্যাভূদ্‌ভার্যা পদ্মেব শার্ঙ্গিণঃ॥

তস্মা ঈশ্বর ঘোষ এষ তনয়ঃ সপ্তাংশুধামা জয়ত্যেকো দুর্দ্ধর সাহসঃ কিমপরং কান্ত্যা জিতেন্দ্রদ্যুতিঃ যস্য প্রোর্জিত শৌর্য নির্জিতরিপোঃ প্রৌঢ়প্রতাপশ্রুতে রাস্যবাষ্পজলপ্রণামমলিনং শক্রস্ত্রিয়ো বিভ্রতি॥

[স খলু ঢেক্করীতঃ। মহামাণ্ডলিকঃ শ্রীমদীশ্বর ঘোষঃ কুশলী ইত্যাদি] রাঢ়াধিপ হইতে লব্ধজন্মা সূর্যের ন্যায় প্রচণ্ড শ্রীধূর্ত ঘোষ শাণিত অসিধারায় শত্রুকুলের গর্বলেশ নাশ করিয়া নৃপবংশের কেতুস্বরূপ হইয়াছিলেন। তাঁহা হইতে সমরব্যবসায় কুশল, বিস্ফূর্জিত তরবারীবজ্রে বৈরীবর্গ নিধনকারী ঘোষ-কুল-কমলের মার্তণ্ডরূপে পৃথিবীপ্রথিত শ্রীবাল ঘোষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধবল ঘোষ নামে এক পুত্র জন্মে। তাঁহার প্রচণ্ড শাসনদণ্ডের মহাপ্রতাপ জগতে গীত হইত এবং তিনি প্রতিযোদ্ধারূপ অন্ধকারের দিবাকর ও বৈরী-কুলাচলের বজ্রস্বরূপ ছিলেন। তিনি নারায়ণের লক্ষ্মীর মত, সীতার ন্যায় পতিব্রতা, ভবানীর অপরা মূর্তি স্বরূপিণী সম্ভাবা নাম্নী ভার্যা লাভ করিয়াছিলেন। অগ্নির ন্যায় জয়শীল, দুর্ধরসাহস অপরের কথা কি কান্তিপ্রভায় ইন্দ্রদ্যুতিকেও পরাজয়কারী ঈশ্বর ঘোষ তাঁহার পুত্র—যিনি প্রদীপ্ত শৌর্যে রিপুগণকে পরাজিত করিয়াছেন এবং যাঁহার প্রৌঢ় প্রতাপের পরিচয় শুনিয়া অশ্রুবাষ্পমলিন-মুখমণ্ডল শত্রুরমণীগণ বিভ্রান্তা হয়।]

এই তাম্রশাসন দ্বারা ঢেক্করী হইতে মহামাণ্ডলিক শ্রীমৎ ঈশ্বর ঘোষ মার্গ-সংক্রান্তি দিনে জটোদায় স্নান করিয়া পিপোল্ল মণ্ডলান্তঃপাতী গাল্লিটিপ্যক্ বিষয় সম্ভোগ দিগ্‌ঘা সোদিকা গ্রাম নিব্বোক শর্মা নামক ব্রাহ্মণকে দান করেন। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় 'জটোদয়া' পাঠ ধরিয়া 'গঙ্গা' অর্থ করিয়াছিলেন। পাঠ আছে 'জটোদায়াং স্নাত্বা'; 'জটোদয়াং স্নাত্বা' পাঠ প্রকৃত হইলে 'গঙ্গায় স্নান করিয়া' অর্থই হইবে। তাহা হইলে 'রাঢ়াপুরী' হইতে নিকটবর্তী কোন স্থানেই দানকৃত গ্রামের অনুসন্ধান করিতে হয়। রাঢ়াপুরী হইতে আন্দাজ আট-দশ ক্রোশ দূরে আধক্রোশেরও কম ব্যবধানে 'দিঘা সোয়ারা' নামে পাশাপাশি দুইটি গ্রাম আছে। তাহারই কিছু দূরে 'গোল্লিষ্ঠা' নামে গ্রাম। এই 'গোল্লিষ্ঠা' 'গাল্লিটিপ্যক' নামের অপভ্রংশ এবং 'দিঘা সোয়ারা' দিগ্‌ঘা সোদিকা নামের রূপান্তর কি না ঐতিহাসিকগণ বিচার করিবেন। এগুলি মিলিয়া গেলে অজয় নদের তীরে ঢেক্করী বা ঢেক্কর গড়ও পাওয়া যাইবে।

গ্রাম্য গাথা ও প্রবচন-প্রসঙ্গ

যে সমুদয় গীত, গাথা ও প্রবচনমালা বঙ্গের পল্লীসমূহে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, উপেক্ষায় লোপ পাইতে বসিয়াছে, তৎসমস্ত সংগৃহীত হইলে বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডার যে এক বহুমূল্য সম্পদের উত্তরাধিকার লাভ করিতে পারেন, এ কথা একটু দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারা যায়। নব্যবঙ্গের অবশ্য সংগৃহীতব্য এই শ্রুতিস্মৃতিসমূহ, বাণীমন্দির-সজ্জার এই স্বভাবসুন্দর উপকরণরাজি বাঙ্গালার গৌরবের সামগ্রী। কত মহাপুরুষের জীবনকথা, কত আদর্শের মহনীয় চিত্র, কত দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, বিগ্রহ, সন্ধি প্রভৃতি ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক ঘটনাসমূহের বিচিত্র কাহিনী, অতীতের কত সর্বজনপ্রিয় মহোৎসবাদির বিবরণ, কত সূক্ষ্ম, জটিল দর্শন-বিজ্ঞান গণিত-জ্যোতিষের সরল মীমাংসা, কত ধর্মোপদেশ যে এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাথার মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা ভাবিলে সত্যসত্যই বিস্মিত হইতে হয়। মানবের নৈতিক চরিত্র-গঠনে, তাহাকে কর্তব্যপথে পরিচালিত করিতে সমাজ বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বিষয়াবলির সুশিক্ষা প্রদানে, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা হইতে প্রভাত

পর্যন্ত অশন-শয়নাদি দৈনন্দিন অনুষ্ঠানের নিয়মনির্দেশে, ঝঞ্ঝা মেঘ বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপ্লবের আরম্ভ ও সমাপ্তির ইঙ্গিতে, এইগুলি যে কিরূপ কার্যকরী অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। আধুনিক বিদ্যামন্দিরে অধ্যয়ন না করিয়াও, অতীতের তথাকথিত অশিক্ষিত, পল্লীবাসী জনসাধারণ, যে আপনাদের শান্তিপূর্ণ মধুময় জীবন প্রায় নিষ্কলঙ্কভাবে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, এই সমস্ত প্রবচনমালাই তাহার একতম কারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

১. নরা, গঙ্গাবিশে শয়,
তার অর্ধেক ঘোড়া বয় ;
বাইশ বলদা, তের ছাগলা
ভেবে ভেবে বরা পাগলা।

২. কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা, মন্দ মন্দ দিচ্ছে বা
যাও শ্বশুর বাঁধগে আল, আজ নয় ত হবে কাল।

৩. খেটে খাটায় লাভের গাঁতি, তার অর্ধেক কাঁধে ছাতি ;
ঘরে বসে পুছে বাত, এ বছর যেমন তেমন আর বছরে হা ভাত

৪. মুখ হলসা ভেতর গুজো' দীঘল ঘোমটা নারী
পানা পুকুরের ঠাণ্ডা জল অতি মন্দকারী।

৫. পূবে হাঁস পশ্চিমে বাঁশ, দেখে শুনে করগে বাস

ইত্যাদি খনার বচন ও ডাকের কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো বর্গী এলো দেশে
শুয়ো পোকাতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে

ইত্যাদি ছড়াগুলি সর্বজনপরিচিত। আমাদের বীরভূমে একটি ছড়া প্রচলিত আছে—রেতের ঠাকুর কেদার রায়, রেতে আসে রেতে যায়। এই কেদার রায়ের নিবাস ছিল সিউড়ি মহাম্মদাবাদের নিকটবর্তী আঙ্গারগড় গ্রামে। ইনি মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে চাকরি করিতেন। জননীর গঙ্গাস্নানে গমনের সুবিধার জন্য স্বীয় বাসগ্রাম হইতে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত এক পথনির্মাণ সেকালে ইহার অক্ষয় কীর্তি। দিবাভাগে নবাব-দরবারে কার্য করিয়া রজনীযোগে অশ্বারোহণে বাটীতে প্রত্যাগমন করিতেন এবং রাস্তার কার্যাদি পরিদর্শন ও মজুর বিদায় করিয়া প্রাতে পুনরায় মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিতেন। তাই জনসাধারণ তাঁহার পরিচয় দিয়া গিয়াছে, 'রেতের ঠাকুর কেদার রায়'!

রায় মহাশয়ের নির্মিত পথের শেষ নিদর্শন স্থানে স্থানে এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। বীরভূমে এমন শত শত গাথা নিত্য গীত হইয়া থাকে। আর একটির উল্লেখ করিতেছি।

আলিনকী বাহাদুর পাগড়ীমে বাঁধে তলোয়ার
এক ঘড়িমে লুঠ লিয়া কলকেত্তা বাজার।

প্রবাদ, রাজনগরের যুবরাজ আলিনকী খাঁ কিছুদিন নবাব সিরাজউদ্দৌলার অধীনে কার্য করিয়াছিলেন। নবাবের কলিকাতা আক্রমণের সময় সেনাপতি আলিনকীও তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন এবং কলিকাতার যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। কেহ কেহ এমনও বলেন যে 'আলিপুর' তাঁহারই নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হৃতবৈভব, বিগতগৌরব রাজনগরের—বীরভূমের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজধানী লক্ষুরের রাজবংশীয় মুসলমানগণ আজিও একখানি জীর্ণবস্ত্র লুঠের কাপড় বলিয়া দেখাইয়া থাকেন; বস্ত্রখণ্ড বৎসরের মধ্যে একবার মহরমের সময় তাজিয়ায় বাঁধিয়া দিয়া গৌরবোৎফুল্ল হৃদয়ে অতীত স্মৃতি তর্পণ করিয়া কৃতার্থ হয়েন।

রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে ডাকের কথায় কোন ধর্মভাবমূলক গাথার সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ধর্মভাবমূলক নিম্নোক্ত গাথাটি পঞ্জিকার পৃষ্ঠায়ও আশ্রয়লাভ করিয়াছে দেখিতে পাই।—

আশমোড়া পাশমোড়া, তার সাক্ষি ভীমে ছোঁড়া,
অষ্টমী নবমী দুটি, ছেলে দুটোর জনমতিথি,
ক্ষ্যাপার চৌদ্দ ক্ষেপীর আট, বুঝে সুঝে কাল কাট,
ইথে যদি করিস হেলা, চলে যাস্ ঠুঁটোর মেলা,
তাও যদি না পারিস্, ভগার খালে ডুবে মরিস্।

প্রথমত শয়ন, উত্থান, পার্শ্বপরিবর্তন ও ভৈমী একাদশীর কথা তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ও শ্রীরামনবমী; অনেকে ইহার মধ্যে রাধাষ্টমী এবং সীতানবমীর উল্লেখ করিয়া থাকেন। ক্ষ্যাপার চৌদ্দ, ক্ষেপীর আট—শিব-চতুর্দ্দশী এবং শারদ শুক্লাষ্টমী, (যাহা বীরাষ্টমী বা দুর্গাষ্টমী নামে খ্যাত)। ঠুটোর মেলা শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্র এবং ভগার খাল হইতেছেন শ্রীগঙ্গাদেবী। যাঁহার 'গোদা জম' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ দেখিলেই গীতি-গাথাগুলি বৌদ্ধভাব-দ্যোতক বলিয়া মনে করেন—ক্ষেপার চৌদ্দ ক্ষেপীর আট, ঠুঁট্টোর মেলা ও ভগার খাল প্রভৃতি শব্দ তাঁহাদের অনুধাবনযোগ্য। শিব, দুর্গা, জগন্নাথ

এবং গঙ্গাদেবী ঐরূপ অভিধানে অভিহিত হইয়াছেন, অথচ এই ছড়াটি আনুষ্ঠানিক হিন্দুর কতকগুলি অবশ্য-প্রতিপাল্য ধর্মানুষ্ঠানের উপদেশ দিতেছে।

জীবনে বহু ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তিকেই প্রায় বলিতে শুনি, বাবা! আমার জীবন দুঃখেই গেল, আমার এই দুঃখের জীবনে 'যাবৎ সীতে তাবৎ পরীক্ষে'! এই একটিমাত্র ছোট কথায় তাঁহাদের জীবনব্যাপী রোদনের বেদন-ব্যথা যেন মুহূর্তের মধ্যে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেয়। মনে পড়িয়া যায় সেই সীতা বিবাহের জন্য মিথিলা যাত্রা, পথে তাড়কা-বধ, সেই হরধনুর্ভঙ্গ, সেই রাজ্যাভিষেক দিবসে রাম-বনবাস; মনে পড়িয়া যায়, পঞ্চবটীর সেই করুণ কাহিনী, অশোকবনের সেই মর্মন্তুদ ক্রন্দন, সেই রাম-রাবণের যুদ্ধ, সেই অগ্নি-পরীক্ষা; তার পর প্রজারঞ্জনের জন্য রামচন্দ্র কর্তৃক সেই রাজ-রাজেশ্বরীর নির্বাসন, শেষে পাতাল-প্রবেশ। জানি না কোন অজ্ঞাতনামা মণিকারগণ এই পরশমণিগুলি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহারা কাঁদাইতেও জানিতেন, হাসাইতেও পারিতেন; তাই সে কালের পল্লীজীবন এত সুখের ছিল। এদেশের গানওয়ালারা এমনি সুরবোদ্ধা ছিলেন—জাতীয় জীবনের মূলতন্ত্রীটিতে তাঁহারা এমন এক সুর বাজাইয়া তুলিতেন, যাহাতে সমগ্র দেশময় একটা সাড়া পড়িয়া যাইত, সমগ্র জাতির হৃদয়ে একটা ভাবের স্পন্দন জাগিয়া উঠিত। আধুনিক কালের সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাকর স্বর্গত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট ভিন্ন আমরা পল্লীবাসিগণ অপর কাহারও নিকট এই সুর শুনিতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না।—

যে পদ-প্রভাবে পাণ্ডবের জয়
যে পদের গুণে বলী বদ্ধ হয়।

গানের এক একটি চরণে জাতীয় জীবনের এক একটা অধ্যায়, এক-একখানা পুরাণ মানসপটে চিত্রিত হইয়া যায়!

একটা জিজ্ঞাসার কথা আছে—'মধুক্ষপেও না?' পল্লীগ্রামের কথায় কথায় ব্যবহৃত হয়। রাম আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'শ্যামের সহিত আপনার এখন একটা কথাও হয় না?' আমি বলিলাম, 'না'। রাম হয় তো আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিবে, 'মধুক্ষপেও না?' এই 'মধুক্ষপা' যে কোন্ মধুরজনীর, কোন্ মিলনপূর্ণিমার ইঙ্গিত করিতেছে, কে বলিবে? পল্লী-প্রচলিত কত উৎসবই যে লোপ পাইতে বসিয়াছে, বক্রেশ্বর, কেন্দুবিল্বের মত কত বৃহৎ বৃহৎ মেলা ক্ষেত্র যে কেনা-বেচার ক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে, কত ব্রহ্মদৈত্যের মেলা, কত

সাধুসন্ন্যাসীর স্মৃতিপীঠ, কত সংক্রান্তির গাজনও কেবল কেনাবেচার আড্ডায় পরিণতি লাভ করিয়াছে, কে তাহার সংবাদ রাখে? কে সেগুলির সংস্কারসাধন করে? শিক্ষণীয় বিষয়ের সমাবেশে কে সেগুলির উন্নতিবিধান করিয়া দেয়, পবিত্রতা আনিয়া দেয়? অন্তত সেগুলিকে একটি আনন্দপূর্ণ মিলনমেলায় পরিণত করে? প্রতিধ্বনি বোধ হয় উপহাস করিতেছে—কে? অথচ এ সবে তেমন পরিশ্রম নাই, ব্যয়বাহুল্য নাই, উপস্থিতির জন্য অনুরোধ নাই, টিকিট বিক্রয় নাই, বিজ্ঞাপন বিলি নাই, নূতন পঞ্জিকা আনিয়া নূতন নূতন দিন স্থির করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। সমস্তই প্রস্তুত আছে, চিরকালের জন্য তাহার দিন বাঁধা, সে দিন সকলেই জানে, নির্দিষ্ট দিনে ক্রেতা-বিক্রেতা, দর্শক আপনা-আপনি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইবে। হইবে সব! কেবল হইবে না আমাদের দ্বারা কোন কাজ! আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই ডুবিয়া রহিব। যথাসর্বস্ব হারাইয়া পরানুকরণপ্রিয়তাই যাহারা আত্মগত করিয়াছে, এ তিমির দূর করিতে তাহাদের জীবনে সে 'মধুক্ষপা' আর আসিবে না। কোন্ মিলন-মেলার কোন্ মধুরজনী সে, যে-মেলায় শত্রুমিত্র ভেদাভেদ থাকিত না, ঈর্ষা দ্বেষ দ্বন্দ্ব কলহ স্থান পাইত না, যে-মিলন মধুক্ষপার মতই অম্লান, সুন্দর ও মধুময় ছিল, যে-উৎসব বিধাতার বিশ্বসৃজন-স্মৃতির আদিম মহোৎসব, যে-রজনী মানবের নবজীবনলাভের 'ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভিদ্ধাৎ, তপসোঽধ্যজায়ত, ততো রাত্র্যজায়ত' মন্ত্রের জননী? হায়! আজি তাহা স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, বাসন্তী উৎসবের ক্ষীণ চিহ্ন আজিও বহুস্থানেই বর্তমান আছে। এই প্রবচনের মূলে সেই বাসন্তী উৎসব।

কিছুদিন পূর্বে সুপ্রসিদ্ধ 'সাহিত্য' পত্রে ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদের দেশে প্রচলিত—

'একনেড়ে কুলে বেঁড়ে তাল গাছে থাকে ;
যে ছেলেটা কাঁদে তার কানে ধরে নাচে।'

ছড়াটিকে

'কাঁধকাটা বলে আমি তাল গাছে থাকি
যে ছেলেটা কাঁদে তার কাঁধে ধরে নাচি'।

ইত্যাকার সংস্কৃত রূপে পরিবর্তিত করিয়া তৎপ্রসঙ্গে 'তাল কলিঙ্গ দেশ' 'কন্ধকাটা জাতি' ইত্যাদি বহু বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন। আমাদের শিশুকালের সেই একনেড়ে ভীতি কিন্তু এখনও সময়ে সময়ে মনে পড়ে। জানি

না, ঠাকুর মহাশয় ইহাকে সুদূর অতীতের বৌদ্ধ বা মুসলমান-ভীতির পরিচায়ক বলিয়া মনে করিবেন কি না। 'কুলে বেঁড়ে' বোধ হয় কুলহীন বা জাতিভ্রষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। জাতিত্যাগী হিন্দু, বৌদ্ধ (বৌদ্ধ শ্রমণগণ মস্তক মুণ্ডন করিতেন অর্থাৎ নেড়ামাথা ছিলেন) যে কালাপাহাড়ের অভিনয় করিবে তাহা আশ্চর্য নহে; কিন্তু তালগাছের মীমাংসা করিতে পারিলাম না।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রত্যেক হিন্দুপ্রধান পল্লীতে পৌষসংক্রান্তির পূর্বরাত্রিতে 'পৌষ আগলাইবার' প্রথা প্রচলিত আছে। স্থানভেদে এ সম্বন্ধে নানারকমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাথা গীত হইয়া থাকে। আমাদের বীরভূমি অঞ্চলে নিম্নোক্ত ছড়াটি প্রচলিত আছে—

পৌষ মাসে পৌষ আগোলা, ধান কাপাসে ঘর আলা,
এস পৌষ যেও না, জন্ম জন্ম ছেড়ো না,
পৌষ মাস লক্ষ্মী মাস, না যাও ছাড়িয়ে,
গাল ভরে পান দেবো কটোরা পুরিয়ে,
আঁদারে পাঁদারে পৌষ, বড় ঘর চেপেই বোস্।

পৌষ মাস 'ধান কাপাসে ঘর আলো' করিলেও বৈশাখ, অগ্রহায়ণ প্রভৃতি পুণ্য মাস থাকিতে পৌষকে ধরিয়া রাখিবার জন্য এত আগ্রহ কেন? পল্লীগ্রামের লোক বৈশাখ মাসকে বিশেষ পুণ্যপ্রদ বলিয়া মনে করে। অশ্বত্থ, তুলসী প্রভৃতি বৃক্ষমূলে জল সেচন, দেবদ্বিজে সমধিক সম্ভ্রম-প্রদর্শন, প্রতি রজনীতে হরিনাম-সংকীর্তন প্রভৃতি কার্য বৈশাখ মাসে অতিশয় যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এদিকে শ্রীভগবানের নিজ মুখের বাক্য—'মাসানাং মার্গশীর্ষোহহমৃতূনাং কুসুমাকর' কবিকঙ্কণ খুল্লনার বারমাস্যা বর্ণনায় বলিতেছেন—

মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ নিজে ভগবান
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান।

এ সব তো প্রাচীনকালের 'মানপত্র'। তথাপি ছত্রিশ অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া 'ঠ'-এর মাথায় মাত্রা দেওয়ার মত এই পৌষের এত আদর কেন? আমাদের অনুমান হয়, 'মাঘী পূর্ণিমার' সহিত ইহার কিছু সংস্রব আছে। পঞ্জিকায় দেখিতে পাই 'মাঘী পূর্ণিমায়াং কলিযুগোৎপত্তি'। এই জন্যই বোধ হয় কলি-ভয়ভীত নরনারী মাঘের অব্যবহিত পূর্ববর্তী পৌষমাসকে সম্মান দেখাইয়া কলির প্রতি আপনাদের আন্তরিক অপ্রীতির পরিচয় প্রদান করে।

পল্লী-প্রচলিত কিংবদন্তীগুলির মূলে যে কিছু সত্য নিহিত আছে তাহা

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সে সত্য ঐতিহাসিক না হইলেও তাহার মূল্য আছে। হইতে পারে, কোন ঘটনার সম্বন্ধে হয়ত এমন এক প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, ইতিহাসের সহিত যাহার এতটুকুও মিল হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া সে প্রবাদ হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। একটু শ্রদ্ধার সহিত অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রবাদোল্লিখিত ঘটনাটি দেশের চক্ষে কিরূপভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল, দশজনে তাহার কতটুকু অংশ কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছিল উক্ত প্রবাদের মধ্যেই তাহার একটি সুন্দর চিত্র বর্তমান রহিয়াছে। সুতরাং আমাদের মনে হয়, ইতিহাসের কঙ্কালমালা অপেক্ষা ক্ষেত্রবিশেষে এই সজীব জিনিসগুলির সাহায্যে অন্তত দেশকে চিনিয়া লওয়া সহজ হইতে পারে। 'সু' হউক আর 'কু' হউক, দেশের আচার-ব্যবহার, ধর্ম-সংস্কারের বেষ্টনি পরিত্যাগ করিয়া তথ্য-নির্ণয়ের চেষ্টা যে সেই দেশের সমস্তটা দেখিবার পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, ইহা বলা বাহুল্য মনে করি। কবি যে বলেন 'রটে যা তা সব সত্য নহে' এবং কবির মনোভূমি 'রামের জনমভূমি অযোধ্যায়' চেয়েও সত্য, কতকগুলি অতি-কল্পনা-পল্লবিত মনোভূমিকে পরিত্যাগ করিয়া কথাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করিতে পারা যায়। সমস্তগুলিই যে 'সাত নকলে আসল খাস্তা' হইয়া যায়, তাহার কোন মাথার দিব্য-দেওয়া নিয়ম নাই। যাহা ঘটে নাই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাহা ঘটিতে পারিত বা যাহা সংঘটিত হওয়া উচিত ছিল, প্রবাদের মধ্যে এমন অনেক জিনিসও পাওয়া যায়। সুতরাং আদর্শ গড়িবার পক্ষে সেগুলির উপযোগিতা আছে বলিতে হইবে।

আবার এমন অনেক সঙ্গীত বা কবিতা আছে, যাহার কোন ধারাবাহিক অর্থ-সঙ্গতি বা উদ্দেশ্য নাই। যাহা পবিত্র শিশু-হৃদয়ের সরল উচ্ছ্বাসের মতই সরল, মধুর এবং কৌতুকাবহ। জানি না কোথায় পল্লীমায়ের সেই চিরশিশু সন্তানগণ, কোথায় প্রকৃতিদেবীর সেই আদরের দুলালেরা, যাঁহারা এই সমস্ত গীতি-গাথা রচনা করিয়া গিয়াছেন! একটি ক্ষুদ্র কবিতার উল্লেখ করিয়া প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। শীতের প্রভাতে অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট আমরা পল্লীবালক-বালিকাগণ মিলিয়া প্রায় প্রতিদিনই সমস্বরে এইছড়াটি আবৃত্তি করিতাম।

সে বৌ কই ? শাকে জল দিচ্ছে ; সে শাক কই ?
গরুতে খেয়েছে ; সে গরু কই ? বনে গিয়েছে ;
সে বন কই ? পুড়ে গিয়েছে ; সে ছাই কই ? উড়ে গিয়েছে ;
কলা গাছের আড়ে, বুড়ি মলো জাড়ে
কলা পড়ে দুপ দাপ্ বুড়ি খায় কুপ কাপ্
খেঁক শিয়ালীর লোটাকান দুব্বো ভরা রোদ' আন।'

এ ছড়ার অর্থ-সঙ্গতি কি থাকিতে পারে ? প্রথমত 'ছটা ফটা রোদ' আসিলে 'গোটা গোটা ছাগল' দেওয়ার কথাটায় একটু খট্কা থাকিয়া যায়। আমাদের মনে হয়, সম্মুখস্থ অগ্নিদেবকে উত্তেজিত করিয়া তাঁহার ক্রোধবহ্নি উদ্দীপ্ত করিবার জন্যই হয়ত বলা হইয়াছে, 'রোদ' আসিলে অগ্নিদেবের বাহন 'গোটা গোটা ছাগল'-গুলি রৌদ্রদেবের উদ্দেশে নিবেদন করিয়া দেওয়া যাইবে। যেহেতু অগ্নিদেবও বোধ হয় শীতের ভয়ে বেশ জমকালো রূপে জাঁকিয়া উঠিতে পারিতে-ছিলেন না। এদিকে পরক্ষণেই সূর্যদেবকে ক্রোধান্বিত করিবার জন্য ইন্ধন সংগ্রহ করিতে প্রেরণ করা হইয়াছে তাঁহার বৃদ্ধা জননীকে ! 'সূয্যির মা বুড়ি, কাঠ কুড়াইতে গেলি' সর্বনাশ ! একে বুড়ি তায় কত বড় লোকটার মা ! বোধ হয় 'দানে' কার্যোদ্ধার না হওয়ায় এদিকেও এই 'দণ্ডের' প্রয়োগ। কিন্তু দুঃখের বিষয় 'মা'কে কাঠ কুড়াইতে পাঠাইয়া সত্যিকার কাঠকুড়ানির ছেলের সস্ত্রীক বাবু-সজ্জায় পরিভ্রমণ আজিকার দিনে সম্ভবপর হইলেও সেকালের সূর্যদেবের পক্ষে (পত্নী ছায়ার সহিত) লোকসমাজে বাহির হওয়া কিরূপ লজ্জাজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কবি তাহা অনুধাবন করেন নাই। যাহা হউক, 'সূয্যির মা' তো 'ছ' খানা কাপড় পাইয়া বসিলেন এবং প্রাপ্তিমাত্রেই ছয় বধূকে দান করিয়া ফেলিলেন। কাপড়গুলি বোধ হয় শীত-নিবারণের উপযোগী ছিল। কবি এতক্ষণ নীরব ছিলেন। কাঠ কুড়াইতে গিয়া বনের মধ্যে কাপড়-প্রাপ্তির সম্ভাবনা কতটুকু, বুড়ির কয় পুত্র ছিল, সকলেরই বিবাহ হইয়াছিল কি না, এতগুলি শীতাতুর বালক-বালিকাকে উপেক্ষা করিয়া বধূদিগকে বস্ত্রদান বুড়ির পক্ষে মার্জনীয় হইতে পারে কি না, ইত্যাদি কোন বিষয়েরই কৈফিয়ৎ দেওয়া তিনি সমিচিন মনে করেন নাই। হঠাৎ কাহার যেন বধূ দেখিবার খেয়াল চাপিল। কে যেন জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন 'সে বৌ কই ?' কোন বিষয়ে বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া বধূ দেখিবার এই আগ্রহ বুড়ির বোধ হয় তেমন পছন্দ হইল না। তিনি একটা ওজর দেখাইয়া দিলেন 'শাকে জল দিচ্ছে'। 'সে শাক কই' ? বুড়ি—

কতকালের বুড়ি, তিনি জানিতেন 'কাঙ্গালকে' শাকের ক্ষেত দেখাইলে তাহার পরিণাম কিরূপ হয়! বুড়ি বলিলেন 'গরুতে খেয়েছে'। 'সে গরু কই?' সেই অদৃশ্য ভদ্রলোকের বধু দেখিবার ইচ্ছাটা কিরূপে পরিবর্তিত হইয়া গেল? বধুর সহিত এই গরুর পার্থক্য উপলব্ধি করা কি এতই কঠিন কবির বা তাহার পক্ষে? যে জিজ্ঞাসা করিলেন 'সে গরু কই?' আমরা আর কি বলিব? বুড়িই উত্তর দিলেন 'বনে গিয়েছে'। 'সে বন কই'? 'পুড়ে গিয়েছে'। 'সে ছাই কই'? 'উড়ে গিয়েছে'। বুড়ির সঙ্গে এই আলাপটা কোথায় দাঁড়াইয়া চলিতেছিল, পূর্বাহ্নে তাহা কেহই জানিতে পারেন নাই। এখন দেখিতেছি সেটা যেখানেই হক, কথাপ্রসঙ্গে বুড়ি বোধ হয় এক কদলীকাণ্ডের মূলে গিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং জাড়ে অর্থাৎ শীতে মরমর হইলেন। আর যায় কোথায়, —কবি অমনি গাহিয়া উঠিলেন—'কলা পড়ে দুপ দাপ, বুড়ি থায় কুপ কাপ্'! অপবাদ দেওয়া বৈ কি!

ব্যাপার দেখুন ত, কি কাণ্ডটাই না হইয়া গেল! সেই ছয় বধু, শাকের ক্ষেত, এবং গরু যে কোথায় গেল, তাহার ঠিকানাই নাই। একটা বনই পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। এমন কি তাহার ছাইগুলি পর্যন্ত পাওয়া যাইতেছে না। কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই, কবি দিব্য নিশ্চিন্ত! যেমন তিনি বুড়িকে কলা-গাছতলায় যাইতে দেখিলেন, অমনি আওড়াইয়া গেলেন—কলা পড়ে দুপ দাপ ইত্যাদি!

অতঃপর খেঁকশিয়ালীর লোটাকান (আদৌ তাহার কানই কিরূপ জানি না) যে কিরূপে দূর্বাভরা রৌদ্র আনয়ন করিবে আমরা তাহার মীমাংসা করিতে অক্ষম। সুতরাং ইতি করিতে বাধ্য হইলাম।

গ্রাম্য ক্রীড়া

একটি অতি বড় প্রাচীন ও সভ্যজাতি বহু বহু শতাব্দীর মধ্য দিয়া এক সর্বাঙ্গসুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। যে কারণেই হউক এক নব্য জ্ঞানদৃপ্ত বৈদেশিক সভ্যতা তাহার অনুষ্ঠান ও সাধনা লইয়া যখন এই প্রাচীন দেশে উপস্থিত হইল তখন আমরা এক দারুণ মোহ ও বিস্মৃতিতে অভিভূত হইলাম। আমাদের কি আছে অন্বেষণ করিয়া দেখিলাম না, প্রত্যহ যাহা দেখিতেছি তাহার

অর্থ কি তাহা ভাবিবার অবসর পাইলাম না। একেবারে নিজত্ব বর্জন করিয়া আত্মপ্রকৃতি হইতে সর্বতোভাবে বিচ্যুত হইয়া অন্ধ অনুকরণের স্বপ্নে আত্মহারা হইলাম। একেবারেই মৃত্যুর দিকে ছুটিয়াছিলাম, মৃত্যুকেই জীবন বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলাম। ইহাই গত এক শতাব্দীর নব্য ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস।

বিধাতার কৃপায় চক্র ঘুরিয়াছে, চিন্তার স্রোত বিপরীত দিকে বহিতেছে। আজ আমাদের স্বদেশ ও স্বজাতির সভ্যতা ও ধর্ম আমাদের গৌরব ও প্রেমের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। আজ এই মহাজাতির বিশাল সাধনরাজ্যের মধ্যে যে সমস্ত মহৎ রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে, তৎ সমুদয় শ্রদ্ধান্বিতভাবে উপলব্ধি করিবার একটা আকাঙ্ক্ষা আমাদের চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। প্রাচীন ও কীটদষ্ট জীর্ণ পুথির উদ্ধার, প্রবাদ-প্রবচন সংগ্রহ, কোন্ স্মরণাতীত কাল হইতে যে সমস্ত আচার নিয়ম অনুষ্ঠান ও ব্যবস্থা আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে সে সমস্তের মর্ম নিরূপণের চেষ্টা এই চিত্ত-চঞ্চলতারই পরিচায়ক মাত্র। নবীন সভ্যতার নিকটে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত নগরসমূহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম আমাদিগের প্রাচীন ও তপস্যানিরত ভারতবর্ষ তথা হইতে নির্বাসিত হইয়াছে। জ্ঞান ও শিক্ষার নামে যে আলোক নগর হইতে বহির্গত হইয়া বিহগকলকণ্ঠমুখরিত ছায়াশীতল শান্ত পল্লীগুলিকে ক্রমে ক্রমে অধিকার করিতেছে, সেই ইন্দ্রজালময় শিক্ষালোক আমাদের নিভৃত নির্জন পল্লীকুটীরেও ভারতবর্ষকে থাকিতে দিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ়।

যাঁহারা যথার্থ স্বদেশপ্রেমিক, তাহাদিগকে আজ এই ভয়াবহ সমস্যার পুরোদেশে বীরের মত দাঁড়াইতে হইবে। পল্লীগ্রামে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গ্রাম্য বালকদিগের ক্রীড়া দেখিতেছিলাম। ইস্কুল কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত সভ্যবেশধারী নব্য যুবকসম্প্রদায় অবকাশকালে নগর হইতে গ্রামে আসিয়াছে। সঙ্গে আনিয়াছে ফুটবল, টেনিস খেলিবার জাল, ক্রীকেট ও পিংপং প্রভৃতি। আরও কত প্রকার নূতন নূতন খেলার উপকরণ ও ব্যবস্থাপত্র লইয়া তাহারা উপস্থিত। পল্লীবালকরা নূতন খেলায় মুগ্ধ হইতেছে, প্রাচীন খেলা উঠিয়া যাইতেছে। তবুও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রাচীন ক্রীড়ার অবশিষ্ট চিহ্নটুকু চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলাম। প্রত্যেক ক্রীড়ার অন্তরালে প্রাচীন ভারতবর্ষ সমাধিমগ্ন হইয়া উপবিষ্ট। ভারতবর্ষীয় সাধনায় যাহা বিশিষ্টতা, ভারতবর্ষ তাহার প্রাচীন দর্শনসাহিত্য কাব্য স্থাপত্য ভাস্কর্য গৃহস্থালীর মধ্য দিয়া যে সমস্ত সত্য যুগ যুগান্ত

ধরিয়া প্রচার করিতেছে, এই অতি প্রাচীন গ্রাম্য ক্রীড়াগুলির মধ্যেও সেই সমস্ত মহাসত্যের অপূর্ব সমমাবেশ। শৈশবের মোহস্মৃতি-বিজড়িত, কৈশোর স্বপ্নের নন্দন মন্দার-সুরভিত, কোটি কোটি কোমলকণ্ঠের কৌতুক হাস্যরোল-মুখরিত হে আমার শান্ত পল্লীর ক্রীড়াক্ষেত্রগুলি! আজ তোমাদিগকে তীর্থ বলিয়া মনে হইতেছে। তাই আপনাকে ধন্য করিবার জন্য এই সামান্য পুষ্পাঞ্জলির আয়োজন।

শিশু যেমন দেখে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তেমনই শেখে। যাহা তাহার মনে ধরে, সে প্রায়ই তদনুরূপ অনুকরণের চেষ্টা করে। তাই দেখিতে পাই বামুনের ছেলে ঠাকুর গড়িয়া খেলে, শাক্ত ঘরের ছেলে তালপাতার খাঁড়া দিয়া মাটির পাঁঠা কাটে, গোঁসাই ঘরের ছেলেরা হরি-কীর্তনের দল বাঁধে। ক্ষেত্র বিশেষে ব্যতিক্রমও ঘটে। পুতুল খেলা, পুতুলের বিয়ে দেওয়া, রান্নাবান্না করা—এ-সব কিন্তু মেয়েদেরই নিজস্ব, সব জাতির মধ্যে, সব ঘরেই প্রায় দেখা যায়। তাছাড়া দোকান করা, 'কুলি'র জলে পাতার ঠোঙা কিংবা ডোঙা ভাসাইয়া ছুটাছুটি, এ-সব খেলায় বালক-বালিকা দুই দলেরই মেলামেশা চলে। কিন্তু এমন কতকগুলি খেলা আছে, যেগুলি শিখাইয়া না দিলে শিশু শিখিতে পারে না। গ্রামে গ্রামে একদিন এমন খেলাও ছিল। আজকাল সহরে যেমন ফুটবল, টেনিস, হকি, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি বাঙ্গালীর জাতীয় খেলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পল্লীগ্রামেও তেমনই ছেঁড়া ন্যাকড়ার পোঁটলা এবং সস্তা জাপানী 'বল' গ্রাম ছাইয়া ফেলিয়াছে। আজকালকার গ্রাম দেখিলে বাঙ্গালীর যে নিজস্ব খেলা কিছু ছিল, তাহা জানা যায় না। গ্রামের খেলা গ্রাম হইতে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

যে-সব খেলা না শিখাইলে শিশুরা শিখিতে পারে না, সেগুলির কোন্ সময়ে কিরূপে সৃষ্টি হইয়াছিল জানিবার উপায় নাই। এই সব খেলার সৃষ্টিকর্তাদের নামও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। লুপ্তপ্রায় খেলাগুলির পুনরায় প্রচলন করা চলে কি-না, ঐ সমস্ত খেলার কোন উপকারিতা আছে কিনা, দেশের ব্যায়ামকুশলী চিন্তাশীলগণ বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। খেলাগুলির পুনঃপ্রচলন যদি একান্তই অসম্ভব মনে হয়, তাহার মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া দুই-চারিটি খেলার একটা মোটামুটি বিবরণ সংগ্রহ করিয়া রাখা দরকার। কারণ এই সমস্ত খেলার মধ্যে সেকালের পল্লীর আচার-ব্যবহার ও রীতিনিতির একটা ভগ্নাংশ, বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের একটা শৈশব-চিত্র এবং গ্রাম্য শিশু-মানসের একটা কৌতুহলোদ্দীপক

প্রতিচ্ছবির আভাস পাওয়া যাইবে। কিন্তু এ কার্য একক কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। বাঙ্গালার বিস্মৃতপ্রায় গ্রামের খেলাগুলির বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইলে সমবেতভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। কোন্ জেলার কোন্ কোন্ খেলা কি আকারে প্রচলিত ছিল অথবা আছে, প্রতি জেলা হইতে তাহার বিস্তারিত বিবরণ সংগৃহীত হইলে তখন সেগুলির আলোচনা চলিতে পারিবে। এইরূপে বাঙ্গালার পুরানো খেলাগুলির একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হইতে পারে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ এ বিষয়ে উদ্যোগী হইলে ভাল হয়। (বাংলায় ব্রতচারীর যেরূপ হুজুগ উঠিয়াছে, তাহাতে আমাদের এই আবেদন কতটুকু ফলপ্রসূ হইবে জানি না।) বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বিষয়ে কিছু করণীয়, কিংবা চিন্তনীয় আছে কিনা কর্তৃপক্ষ তাহার বিচার করিবেন। বহুদিন পূর্বে বীরভূম হইতে প্রকাশিত 'বীরভূম' মাসিক পত্রে আমরা দুই-একটি খেলার বিবরণ প্রকাশপূর্বক এদিকে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। কিন্তু কি শিক্ষিত সমাজ, কি সাধারণ সম্প্রদায় কাহারও নিকট হইতে কোনরূপ সাড়া পাওয়া যায় নাই। ভরসা করি এতদিন পরে হাওয়ার গতি ফিরিয়াছে, সুতরাং এবার অন্তত 'অরণ্যে রোদন' হইবে না।

এক

এ দেশের পুরাতন কাব্যে সেকালের খেলায় বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বাল্য-লীলায় স্নানরত বালক নিমাইয়ের একটি পরিষ্কার চিত্র আছে। নিমাইয়ের ঔদ্ধত্যে উত্ত্যক্ত হইয়া নদীয়ার লোক জগন্নাথ মিশ্রের নিকট নালিশ করিতে আসিয়াছেন—

কেহ বলে সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া।
ডুব দিয়া লৈয়া যায় চরণে ধরিয়া॥

* * *

কেহ বলে মোর পৃষ্ঠ দিয়া কান্ধে চড়ে।
মুঞিরে মহেশ বলি ঝাঁপ দিয়া পড়ে।

বালিকারা শচীমায়ের নিকট আসিয়া বলিতেছে—

ওকড়ার বিচি দেয় কেশের ভিতরে।
কেহ বলে মোরে চাহে বিভা করিবারে॥

কিন্তু এ-সব খেলা নহে !

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে যদিই বা কালকেতুর প্রসঙ্গে 'খেলে দাণ্ডাগুলি ভাঁটা'র উল্লেখ পাই, কিন্তু শ্রীমন্ত সওদাগর একেবারেই প্রহ্লাদ! সে বাল্যখেলায় শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলার অনুকরণ করে। ব্যাধের ছেলে কালকেতু—

লইয়া ফাউড়া ডেলা যার সঙ্গে করে খেলা
তার হয় জীবন সংশয়।
যে জনে আঁকড়ি ধরে পড়য়ে ধরণী পরে
ভয়ে কেহ নিয়ড়ে না রয় ॥

তাছাড়া লক্ষ্যভেদ, বাঁটুল ছুড়িতে শেখা, খেদাইয়া শজারু ধরা ও বাঁটুল ছুড়িয়া পাখি মারা প্রভৃতি খেলাগুলি সাধারণ নহে। 'ফাউড়া ডেলা' (ছোট বাঁশের লাঠি লইয়া পোড়া মাটির ঢিল তাক করিয়া ছুড়িয়া মারা)। পশ্চিমবঙ্গে কোন কোন স্থানে লাঠিকে 'ফাবড়' বলে। একটি নির্দিষ্ট স্থানকে বা গরু ছাগল কি মানুষকে লক্ষ্য করিয়া ঐ লাঠি ছুড়িয়া দেওয়ার নাম 'ফাবড় মারা' বা 'ফাবড়ানো'। বীরভূমের রাখাল-বালকদের মধ্যে 'ফাবড় মারার' পাল্লামূলক একটি খেলা আছে। যাহার 'ফাবড়' সর্বাপেক্ষা বেশী দূর যাইবে সেই জিতিবে। 'ডেলা' বা ঢিল ছোড়ারও পাল্লা চলে। পোড়ামাটির ঢেলা বা ঘুটিং ফাবড় দিয়াও ছুড়িয়া দেওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলায় কয়েক প্রকার খেলার উল্লেখ আছে। 'রামকৃষ্ণ কখন ভ্রমণ, কখন উলম্ফন, ক্ষেপণ, আস্ফোটণ, বিকর্ষণ ও বাহুযুদ্ধ দ্বারা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কখন অন্য গোপগণ নৃত্য করিলে নিজে গান-বাদ্য ও প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কখন বিল্ব, কখন কুম্ভ বৃক্ষের ফল, কখন বা আমলক দ্বারা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কখন অস্পৃশ্য হইয়া অন্যকে স্পর্শ করিবার নিমিত্ত দৌড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কখন অন্ধরূপ ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কখন মৃগাদির বা পক্ষীর ন্যায় বিচরণ ও শব্দাদি করিতে লাগিলেন। কখন ভেকের ন্যায় জলে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। কখন দোলায় দুলিতে লাগিলেন। কখন বা রাজা হইয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন।' (শ্রীমদ্ভাগবত, দশম, স্কন্ধ বঙ্গবাসীর অনুবাদ)

শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত 'নিজে অস্পৃশ্য হইয়া অন্যকে স্পর্শ করিবার নিমিত্ত দৌড়াইয়া বেড়ানো' এবং 'অন্ধরূপ ধারণ করিয়া' খেলা পশ্চিমবঙ্গে আজিও প্রচলিত আছে। স্থানভেদে এই খেলার প্রকারভেদ দেখিতে পাই। আমাদের

অঞ্চলে অস্পৃশ্যকে 'হাড়ি' বলে। একজন বুড়ি গোপনে হাতের কোন একটি আঙুল মট্‌কাইয়া সব আঙুলগুলিই বাহির করিবে। এক একজন বালক বা বালিকা বুড়ির এক একটি আঙুল ধরিবে। যে মটকানো আঙুলটি ধরিবে, সেই হাড়ি হইবে। বুড়ি তখন 'তেলি, হাত পিছলে গেলি' বলিয়া অপরাপর বালক বালিকাকে ছাড়িয়া দিয়া হাড়িকে আটকাইবে এবং তাহার চোখ দুইটি চাপিয়া ধরিবে। শুধাইবে—'ভাত কেমন ?' হাড়ির উত্তর—'টগবগ'। 'ডাল কেমন ?' —'ভুর ভুর'। 'তরকারী কেমন ?'—'ছ্যাঁক ছ্যাঁক। বুড়ি তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিবে—'আয় ফুল ঝিঙের ঝোল, যাকে পাবি তাকেই ছোঁ।' হাড়ি যাহাকে ছুঁইতে পারিবে, সেই হাড়ি হইবে। খেলার শেষে হাড়িত্ব ঘুচাইয়া দিতে হয়। হাড়ির হাতে একগাছি ঘাস কি একটা পাতা দিয়া বুড়ি শুধাইবে 'এটা কি' ? হাড়ি বলিবে—'বিছে'। বুড়ি বলিবে—'হাড়ি গেল তোর ঘুচে'। খেলা শেষ না করিয়া হাড়ি যদি চলিয়া যায়, সকলে তাহাকে গালি দিবে—'তাল গাছে জল পড়ে টপর টপর। হাড়ি হয়ে ঘরে যায় মুচির চাকর'। আরও, দুই একটি খেলায় অস্পৃশ্য হওয়ার রীতি আছে। 'অন্ধরূপ ধারণ করিয়া ভ্রমণ' —বোধহয়, চোর চোর খেলা, বা কানামাছি খেলা। স্থানভেদে এই খেলা নানারূপে প্রচলিত আছে। পশ্চিমবঙ্গে একজনের চোখ বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সে পার্শ্ববর্তী বালকদের ছুঁইবার চেষ্টা করে। বালকের দল ছুটিয়া পালায়। যাহার চোখ বাঁধা আছে, সে যাহাকে ছুঁইবে, পুনরায় তাহারই চোখ বাঁধা পড়িবে এবং পূর্ববর্তীকে মুক্তি দিতে হইবে।

কম বেশী প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে রচিত বাৎস্যায়নের কামসূত্রে কয়েক প্রকার খেলার উল্লেখ রহিয়াছে। বাৎস্যায়ন ['কন্যা সম্প্রযুক্তক অধিকরণের তৃতীয় অধ্যায়'] নায়িকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াইবার জন্য নায়ককে উপদেশ দিতেছেন—'আকর্ষ ক্রীড়া, পট্টিকাক্রীড়া, মুষ্টিদ্যূত, ক্ষুল্লকাদিদ্যূতানি মধ্যমাঙ্গুলি গ্রহণং ষট্‌ পাষাণকাদীনি' খেলা করিবে।

'আকর্ষ ক্রীড়া'—পাশা, দশ-পঁচিশ আদি। 'পট্টিকা'—একজনের চোখ বাঁধিয়া তাহার মস্তকে বা কপালে এক একজন আঙুলের টোকা মারিবে, যাহার চোখ বাঁধা আছে, সে উহাদের নাম বলিবে। না বলিতে পারিলে হারিবে। বলিতে পারিলে যাহার নাম বলিবে, তাহার চোখ বাঁধিয়া পূর্ববৎ খেলা চলিবে। 'মুষ্টিদ্যূত'—হাতের মুঠার মধ্যে কিছু লুকাইয়া প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করা। যে বলিতে পারিবে সে ঐ লুকানো জিনিস পাইবে। না বলিতে পারিলে তাহাকে

সেই পরিমিত জিনিস দিতে হইবে। 'ক্ষুল্লদ্যূত'—কড়ি খেলা। একটি গর্তে বা একটা নির্দিষ্ট স্থানে কতকগুলি কড়ি রাখিয়া এক একজনে নির্দিষ্ট ব্যবধান হইতে নিজের কড়ি ঐ কড়িগুলির উপর ছুঁড়িয়া মারিবে। নিজের কড়ি যদি চিৎ হইয়া পড়ে তবে যতগুলি কড়ি চিৎ হইয়াছে, সবগুলিই সে পাইবে। এইরূপ নিজের কড়ি উপুড় হইলে উপুড় হইয়া পড়া কড়ি তাহার হইবে। কিন্তু যদি নিজের কড়ি চিৎ বা উপুড় হয় এবং অন্য কড়িগুলি উপুড় বা চিৎ হয় তবে যত কড়ি উপুড় চিৎ হইয়াছে তত কড়ি তাহাকে দিতে হইবে। 'মধ্যমাঙ্গুলি গ্রহণ'—মধ্যমাঙ্গুলি ধরিতে বলিয়া আঙ্গুল দোলাইতে দোলাইতে অনামিকা বা তর্জনী বা কনিষ্ঠাঙ্গুলি ধরাইয়া দেওয়া। 'ষট্ পাষাণ'—ছয়টি গুটি লইয়া খেলা। প্রথমে একটি গুটি তুলিয়া উপরে ছুঁড়িয়া দিয়া নীচের আর একটি গুটি তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপরের গুটিকে হাতের পীঠে ধরিতে হইবে। এমনি করিয়া ক্রমে ছয়টি গুটিই হাতের পীঠে ধরিয়া আবার একটি একটি করিয়া মাটিতে নামাইয়া রাখিতে হইবে। ইহার সব কয়টি খেলাই পশ্চিমবঙ্গে এই সেদিন পর্যন্তও প্রচলিত ছিল।

যে সকল খেলায় অঙ্গের ব্যায়াম হয়, বাৎস্যায়ন এইরূপ কয়েকটি খেলারও নাম করিয়াছেন। যেমন—'সুনিমীলিতকা'—কানা মাছি বা চোর চোর খেলা। শ্রীমদ্ভাগবতে এই খেলাই 'অন্ধরূপ ধারণ' করিয়া খেলারূপে উল্লিখিত হইয়াছে। 'আরব্ধিকা'—কিৎ-কিৎ বা হা-ডু-ডু খেলা। কোন একটি শব্দ করিয়া খেলা আরম্ভ করিতে হয়, তাই নাম আরব্ধিকা। টীকাকার বলেন, কুষ্ণফল-ক্রীড়া। এদেশে এই নাম অপ্রচলিত। 'লবণ বীথিকা'—টীকাকার ইহাকে 'লবণ হট্ট' বলিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে 'নুন পালা' এক রকম খেলা আছে। 'অনিল তাড়িতকা' পক্ষীর ন্যায় বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া চক্রের ন্যায় ভ্রমণ। পশ্চিমবঙ্গে এই খেলাটির নাম 'আনি মানি' খেলা। দুটি হাত সমানভাবে দুই দিকে সোজা করিয়া চক্রাকারে ঘুরিবার সময় ছেলেরা ছড়া কাটে—'আনি মানি জানি না, পরের ছেলে মানি না'। 'গোধূম পঞ্জিকা'—ধান, কলাই বা গমের মধ্যে পয়সা লুকাইয়া সমানভাবে ভাগ করিয়া দিবে। যাহার খুশি ইচ্ছামত ভাগ ডাকিয়া লইবে। যাহার ভাগে পয়সা থাকিবে না সে সেই অংশ পরিমাণ পয়সা মূল ব্যক্তিকে দিবে। খেলাটি ঠিক জুয়া খেলার মত। পশ্চিমবঙ্গে এই আকারের জুয়া খেলা প্রচলিত নাই। 'অঙ্গুলি তাড়িতকা'—টীকাকার বলিয়াছেন—একজনের চক্ষু ঢাকিয়া তাহার কপালে বা মস্তকে টোকা মারা এবং কে মারিয়াছে জিজ্ঞাসা

করা। আমাদের মনে হয় পূর্বে আঙ্গুল মটকাইয়া সমস্ত আঙ্গুল ধরিতে দেওয়ার যে খেলার কথা বলিয়াছি ইহা সেইরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে 'অস্পৃশ্য হইয়া অন্যকে স্পর্শ করিবার নিমিত্ত দৌড়িয়া বেড়ানোর' যে খেলা বাৎস্যায়ন তাহাকেই 'অঙ্গুলি তাড়িতকা' বলিয়াছেন।

দেশ ভেদে এই সমস্ত খেলার আকার-প্রকারের পার্থক্য থাকিতে পারে। কিন্তু খেলাগুলি যে রূপান্তরে সর্বদেশেই প্রচলিত আছে—অন্তত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হা-ডু-ডু বা কিৎ-কিৎ খেলা ভিন্ন অপর সমস্ত খেলাই বালক-বালিকা মিলিয়া খেলা চলে। আমরা অবশ্য বাৎস্যায়নের উদ্দেশ্য লইয়া বিচার করিতেছি না। আমাদের বলিবার কথা, যে খেলাগুলি আজ প্রায় দুই হাজার বৎসর ধরিয়া কোন না কোন আকারে বাঁচিয়া আছে, আজ সেগুলিকে তাড়াইয়া দেওয়ার কারণ কি? পল্লীগ্রামে অনুসন্ধান করিলে আরও অনেক খেলার সন্ধান পাওয়া যাইবে। তাহার মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া আবশ্যকমত কালোপযোগী পরিবর্তন, পরিবর্জন বা পরিবর্ধন করিয়া কোন কোন খেলাকে বাঁচাইয়া রাখা যায় কি-না, বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে, সহরে সহরে চালানো যায় কি-না, দেখিতে অনুরোধ করি। সমস্ত জাতিরই একটা নিজস্ব জাতীয়তা আছে, জাতীয় খেলা আছে, কেবল বাঙ্গালীই কি বিজাতীয় খেলা লইয়া মাতিয়া থাকিবে?

দুই

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় 'প্রলম্বাসুরবধ' প্রসঙ্গে একটি খেলার উল্লেখ আছে—'একদিন রামকৃষ্ণ এই বৃন্দাবন মধ্যে গোপগণের সহিত গোচারণ করিতেছেন, এমন সময় প্রলম্ব নামে এক অসুর গোপরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের বধোদ্দেশে আগমন করিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু সখার ন্যায় তাহার সঙ্গে ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। বিহারবিৎ কৃষ্ণ সেইস্থানে গোপালদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'আইস আমরা বয়স ও বলবীর্য অনুসারে দুই দল হইয়া বিহার করি।'

'গোপগণ এই ক্রীড়ায় রামকৃষ্ণকে নায়ক করিল, এবং কতকগুলি বলরামের ও কতকগুলি শ্রীকৃষ্ণের দলভুক্ত হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। সকলের এই নিয়ম হইল যে, যাহারা জয়লাভ করিবে, তাহারা পরাজিতের পৃষ্ঠে আরোহণ করিবে। পরাজিতেরা জেতাদিগকে বহন করিবে।'

শ্রীমদ্ভাগবতে নিয়মের কথা উল্লিখিত আছে কিন্তু কিরূপ খেলায় এরূপ নিয়ম হইয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ নাই। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন স্থানে রাখাল-বালকদিগের মধ্যে আজিও এই খেলা প্রচলিত আছে। প্রতিযোগী দুই-দুইজনে একটি দল গঠিত হয়। দুইজন এক সঙ্গে দৌড়িতে আরম্ভ করে। কোন একটি বৃক্ষ, পুকুরের পাড় বা একটা উঁচু ঢিপি লক্ষ্যরূপে নির্দিষ্ট হয়। যে অগ্রে গিয়া লক্ষ্য স্থানে পৌছিতে পারিবে, সেই কাঁধে চড়িবার সৌভাগ্য লাভ করিবে। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি শব্দ করিতে করিতে দম ধরিয়া দৌড়িয়া যাইবার রীতি আছে।

এই খেলার একটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই। শ্রীমদ্ভাগবতেও তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। গোপগণ এই ক্রীড়ায় রামকৃষ্ণকে নায়ক করিল এবং কতকগুলি বলরামের ও কতকগুলি শ্রীকৃষ্ণের দলভুক্ত হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। এই নায়ক বা নেতা নির্বাচনের পদ্ধতি ভারতে বিশেষ করিয়া বাঙ্গালায় বহুদিন হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। প্রজা কর্তৃক রাজা নির্বাচনের কথা বাঙ্গালায় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সত্য। বাঙ্গালী প্রজা এমনই শক্তিমান ছিল যে, তাহারা 'প্রথম গোপালদেবকে' বাঙ্গালার সিংহাসন দান করিয়াছিল। বাঙ্গালার গ্রাম্য শাসন-পদ্ধতি আবহমান কাল হইতেই গণতন্ত্রের রীতিতে নির্বাহিত হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েৎ প্রথা প্রচলিত ছিল। আজিও বহুজাতির মধ্যে পঞ্চগ্রামী, নবগ্রামী, বাইশগ্রামী সভায় বহুবিধ বিরোধের মীমাংসা-পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে। এই রীতি বিশেষরূপে অভ্যস্ত না হইলে, বালক-বালিকাদের ভিতর গ্রামের খেলাতেও স্থান পাইত না। আমরা অপর একটি খেলার মধ্যেও এই রীতির প্রণালীবদ্ধ নিদর্শন পাইয়াছি।

খেলাটির নাম 'সিন্দুর টোপ'। আমরা বাল্যকালে প্রায় প্রতিদিন এই খেলা খেলিতাম। এই খেলায় কিছুদূর সমান ব্যবধানে দুই পক্ষের দুইটি 'কোট' তৈরী করিতে হয়। প্রতিযোগী দুই দলে লাফ দিয়া দিয়া পরস্পরের 'কোট' অধিকার করিবে। অগ্রাধিকারীই জয়লাভ করিবে। অবশ্য লাফ দিবার অধিকারও অর্জন করিতে হইবে। সকল বালক বা বালক-বালিকা একত্রে মিলিয়া প্রথমে দুইজন নায়ক নির্বাচন করিবে। পরে সমান বয়স বা সমান বলশালী দুই-দুইটি বালক বা বালিকা আপন আপন হস্তে দুইটি জিনিস লইয়া জিনিসের নামানুসারে 'কে নিবিরে খোলামকুচি' 'কে নিবিরে ঘাস'—এই বলিয়া হাত ধরাধরি করিয়া চীৎকার করিতে করিতে আসিবে। তখন ঐ পূর্ব-নির্বাচিত

নায়কদ্বয় একজন অগ্রে 'আয়রে ঘাস' বা 'আয়রে খোলামকুচি' বলিয়া ডাকিয়া লইবে। এবারে যে আগে ডাকিয়াছে, পরে তাহাকে শেষে ডাকিতে হইবে। এইরূপে দল-নির্বাচন শেষ হইলে, দলসহ দলপতি আপন আপন কোটে গিয়া বসিবে। অতঃপর এক দলের দলপতি গিয়া অপর দলের একজনের চোখ চাপিয়া ধরিবে। পরে—ইঙ্গিতে নিজের দলের একজনকে ডাকিবে। সে পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া ঐ চোখ-ঢাকা বালকটির কপালে 'টোকা' মারিয়া আসিবে। টোকা দিয়া এই বালক স্বস্থানে গিয়া বসিয়া স্বচ্ছন্দ হইলে পর দলপতি ঐ বালকের চোখ খুলিয়া দিবে এবং জিজ্ঞাসা করিবে, কে টোকা দিয়া গেল? সে যদি নাম বলিতে পারে, তবে একটি লাফ দিয়া নিজের কোট হইতে প্রতিদ্বন্দ্বীর কোটের দিকে অগ্রসর হইবে। বালক নিজে লাফ দিতে না পারিলে, দলপতি তাহার হইয়া লাফ দিবে। এইরূপে পর্যায়ক্রমে দুই দলেই 'চোখ-বাঁধা, নাম জিজ্ঞাসা', লাফ দেওয়া চলিবে। এমন করিয়াই এক জনের 'কোট' অপরকে দখল করিয়া লইতে হইবে।

এই খেলায় অল্পবয়সের বালক-বালিকাদের কপালে কে টোকা মারিয়াছে, তাহার নাম জানিবার একটা সঙ্কেতও কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন 'গোপালকুণ্ড শুকালো' বলিলে 'রাম' টোকা মারিয়া গেল বুঝিতে হইবে। 'পাকুড় গাছটা ভেঙ্গে পড়ল' বলিলে, 'শ্যাম' টোকা দিয়াছে মনে করিতে হইবে, ইত্যাদি। এমনই টোকা দিতে ডাকিবার ইসারায় অনেক সময় কাজ হয় না। একজন উঠিতে আর একজন উঠে বলিয়া গোলমাল হয়। তাই তাহারও একটি সঙ্কেত থাকে। যেমন—'আয়রে বেগুন ফুল' বলিলে 'যদু' আসিয়া টোকা দিবে। 'আয়রে ঝুমকো লতা' বলিয়া ডাকিলে 'মধু' আসিয়া টোকা দিবে ইত্যাদি। এই খেলাটি প্রণালীবদ্ধভাবে চালাইতে পারিলে, একদিকে যেমন বালকেরা দলপতি-নির্বাচন, দলগঠন, দলের আনুগত্য নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি শিক্ষা করিবে, তেমনই—লম্ফ দেওয়া, ঝাঁপ দেওয়ার জন্য তাহাদের শারীরিক ব্যায়ামেরও সুবিধা হইবে। যাঁহারা ব্রতচারী আচরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদের সু-অভিসন্ধি থাকিলে—পাঠশালে, ইস্কুলে এই খেলাটি চালাইয়া দেখিতে পারেন।

যাঁহারা মনে করেন, 'আমাদের সব ছিল'—'হাওয়াই যন্ত্রাদি' কিছুই নতুন আবিষ্কার নয়, আমাদের শাস্ত্রের মধ্যে সব কিছুই আছে ;—আমরা অবশ্যই সে-দলের নই। তথাপি আমরা মনে করি, আমরা অতীতের এক মহান সভ্যতার উত্তরাধিকারী, আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার সম্পূর্ণ না

হউক, অপূর্ণ ছিল না। আমাদের খেলা-ধূলায় মধ্যেও বালকগণের শরীর গঠনের এবং শিক্ষা লাভের উপকরণ যথেষ্ট ছিল। আধুনিক 'কিণ্ডারগার্টেন' শিক্ষা-প্রণালীর খুব প্রশংসা শুনিতে পাই। খেলার ছলে শিক্ষাদানের রীতি নাকি ঐ কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর মারফতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমরা এ প্রশংসায় প্রতিবাদ করিতে চাহি না। কিন্তু আমাদের দুই-একটি খেলার মধ্যেও যে ছেলেদের সরল রেখা টানিবার, সোজা সরল 'আল' বাঁধিবার পদ্ধতি শিক্ষার উপকরণ ছিল, সেদিকেও শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। এইরূপ দুইটি খেলার কথা বলিয়া আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি।

এই খেলার নাম 'এইটিকে ছোঁয়াছুঁয়ি'। একটি মধ্যবিন্দু হইতে চারিদিকেই সমানভাবে সম-সংখ্যক সোজা দাঁড়ি টানিতে হইবে। মধ্যবিন্দুতে একটি পয়সা বা ছোট ঘুটিং রাখিতে হইবে। তাহার পর দাঁড়ি যত, ততজন বালক আপন আপন তর্জনী বা মধ্যমাঙ্গুলী দিয়া সেই দাঁড়ির উপর একসঙ্গে দাগা বুলাইতে আরম্ভ করিবে। একতালে সকলকেই অঙ্গুলী চালনা করিতে হইবে। অঙ্গুলী দ্রুত চলিবে। রেখার গোড়া হইতে মধ্যবিন্দু পর্যন্ত আঙ্গুল চালাইতে হইবে। অথচ মধ্যবিন্দুস্থিত পয়সা বা সুপারি বা ঘুটিং-এ আঙ্গুল ঠেকিবে না। যাহার আঙ্গুল ঠেকিবে, সে-ই হারিবে। সেই 'হাড়ি' হইয়া অপরকে ছুঁইবার চেষ্টা করিবে।

আর একটি খেলার নাম 'থুক্ থুক্ দাঁড়ি'। বালি বা ধুলা দিয়া একটি স্বল্পপরিসর দেড় হাত কি দুই হাত লম্বা 'আইল' তৈরী করিতে হইবে। একটি চারি আঙ্গুল-পরিমিত কাঠি হাতে রাখিয়া একজন দুই হাত সেই আইলের এ ধার হইতে ও ধার উপরে নাড়া দিতে দিতে মুখে 'থুক্ থুক্ দাঁড়ি' আবৃত্তি করিবে। এরূপ করিবার সময় সে গোপনে কাঠিটি ঐ আইলের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবে। অন্যজন সেই কাঠিটি বাহির করিবার জন্য ঐ আইলের একটি স্থান দুই হাত দিয়া চাপিয়া ধরিবে। যদি কাঠিটি সেই স্থল হইতে বাহির করিতে পারে তখন সে কাঠি লুকাইতে পারিবে আর না বাহির করিতে পারিলে, হারিবে। যে হারিবে, বিজেতা তাহার হাতে একমুঠা ধুলার মধ্যে সেই কাঠিটি দিয়া দুই হাতে তাহার চোখ চাপিয়া ধরিবে এবং আইলের উপর ধান-ভানার অনুকরণে তাহাকে চারি পাঁচবার নাচাইয়া নানাস্থানে ঘুরাইয়া এক গোপনীয় স্থানে সেই ধুলামুঠার সঙ্গে কাঠিটি ফেলিতে বলিবে। তার পর পূর্ব-স্থানে ফিরিয়া আসিয়া তাহার চোখ খুলিয়া দিবে, এবং ঐ কাঠি খুঁজিয়া আনিতে বলিবে। যে হারিয়াছে, সে

যতক্ষণ কাঠি খুঁজিয়া না আনিবে, ততক্ষণ তাহার পরিত্রাণ নাই। খুঁজিয়া আনিতে পারিলে, সে কাঠি লুকাইবার অধিকারী হইবে। ঐ দাঁড়ি আইলের মধ্যে হাত চালাইবার সময় কাহারও হাত বাঁকিয়া গেলে সে খেলিতে পারিবে না।

তিন

বাৎস্যায়ন যে সমস্ত খেলার কথা বলিয়াছেন আমরা পূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। উক্ত খেলাগুলির মধ্যে 'লবণ বীথিকা' নামে একটা খেলা আছে। এই খেলাটি 'নুনঘর' 'নুন কোট' 'নুন পালা' প্রভৃতি নামে আজিও বীরভূম বর্ধমান নদীয়া প্রভৃতি জেলায় প্রচলিত আছে। এই খেলা বালক-বালিকারা পৃথক পৃথকভাবে বা উভয় দল মিলিয়া একত্রে খেলিতে পারে। খেলায় বালক ও বালিকার কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট নাই। খেলিবার জন্য প্রথমে একটি ঘর আঁকিতে হইবে। এই খেলাঘর কয়েকটি কুঠরীতে বিভক্ত থাকিবে। কুঠরীরও কোন বাঁধাধরা সংখ্যা নাই। বালক-বালিকার সংখ্যা বাড়িলে কুঠরীর সংখ্যাও

১	নুনঘর ৪
২	৫
৩	৬

বাড়াইতে হইবে। উপরের ঘরটি ছয়টি কুঠরীতে বিভক্ত। ছয় সংখ্যক ঘরটি 'নুনঘর'। ধরিয়া লওয়া যাউক ছয়জন বালক দুই দলে বিভক্ত হইয়া খেলা আরম্ভ করিয়াছে। তিনজন বালক 'এক' চিহ্নিত কুঠরীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই তিনজন বালক উক্ত ঘর হইতে বাহির হইয়া দুই, তিন, চার,

পাঁচ সংখ্যক ঘর পার হইয়া 'নুনঘরে' গিয়া পৌছিবে এবং 'নুনঘর' হইতে বাহির হইয়া পুনরায় এক সংখ্যক ঘরে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিলে খেলায় জিতিবে। অপর তিনজন বালক তাহাদিগকে আগুলিয়া থাকিবে। একজন বালক 'ক' চিহ্নিত স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিবে। সে ক, ঘ, চ, খ চিহ্নিত সরল রেখাটি ধরিয়া সমস্ত পথটিই আগুলিতে পারিবে। অপর একটি বালক 'গ' চিহ্নিত স্থানে ও তৃতীয় বালক 'ঙ' চিহ্নিত স্থানে দাঁড়াইবে। 'গ' চিহ্নের বালক 'ঘ' চিহ্নিত পথ পর্যন্ত এবং 'ঙ' চিহ্নের বালক 'চ' চিহ্নিত পথ পর্যন্ত আগুলিতে পারিবে। ঐ দুইটি সরল রেখা ভিন্ন তাহারা অন্য কোন স্থানে যাইতে পারিবে না বা অন্য পথ আগুলিতে পারিবে না।

খেলা আরম্ভ হইল। এক সংখ্যক ঘরে যে তিনজন বালক ছিল তাহাদের মধ্যে একজন কোনক্রমে বাহির হইয়া 'দুই' চিহ্নিত ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। এদিকে অপর দুইজনের মধ্যে একজন প্রথমেই 'নুনঘরে' পৌছিয়া গেল। যে 'নুনঘরে' পৌছিল তাহাকে আবার বাহির হইয়া সব কুঠরীগুলি ঘুরিয়া পুনরায় এক চিহ্নিত ঘরে আসিতে হইবে। এইরূপে যাতায়াতের সময় অপর পক্ষের কোন বালক যদি তাহাকে ছুঁইয়া দিতে পারে তবে 'নুনঘরের' বালকটির দলের সকলেই মরিবে। তখন অন্য দল 'এক' চিহ্নিত ঘরে আসিবে, এবং পূর্বোক্ত দল তাহাদিগকে আগুলিবার জন্য পূর্বের পদ্ধতি মত আপন আপন স্থানে গিয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু যে বালক 'দুই' চিহ্নিত ঘরে দাঁড়াইয়াছিল, সে 'তিন' চিহ্নিত ঘরে আসিবার সময় কিংবা যে 'এক' চিহ্নিত ঘর হইতে বাহির হইতে পারে নাই, সে বাহির হইয়া 'দুই' চিহ্নিত ঘরে আসিবার সময় যদি অপর পক্ষের কেহ তাহাকে ছুঁইয়া দেয়, তবে সমস্ত দলের লোক মরিবে না। যে ছোঁয়া পড়িবে, সে মরিবে, এবং অন্য বালকেরা খেলিতে পাইবে। যদি সকলে 'নুনঘরে' আসিয়া পৌছিয়া যায়, এবং অপর পক্ষ কাহাকেও ছুঁইতে না পারে তাহা হইলেও এই 'নুনঘর' হইতে বাহির হইবার সময় যে কোন একজন বালক অপর পক্ষ কর্তৃক ছোঁয়া পড়িলেই দলের সকলকে হারিতে হইবে। 'এক' চিহ্নিত ঘর হইতে বাহির হইবার সময় অপর পক্ষকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য কোন বালক 'এক' চিহ্নিত কুঠরী হইতে 'পাঁচ' চিহ্নিত কুঠরীতেও আসিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও এই বালককে প্রত্যেকটি কুঠরী ঘুরিয়া 'নুনঘরে' পৌছিতেই হইবে। এবং আবার বাহির হইয়া 'এক' চিহ্নিত কুঠরীতে ফিরিতে হইবে। এই অসুবিধার জন্য সাধারণত বালকের দল দুই, তিন, চার, পাঁচ এই ক্রম অনুসারেই কুঠরীগুলি

ঘুরিয়া যায়। স্থানভেদে এই খেলায় নিয়ম কানুনের হয়ত কিছু এদিক-ওদিক আছে। তথাপি আমাদের উল্লিখিত ক্রম হইতে খেলার মোটামুটি পদ্ধতিটি জানা যাইবে। এই খেলায় শ্রমশক্তি, সতর্কদৃষ্টি এবং স্ফূর্তির দরকার। ব্যায়ামের দিক হইতেও ইহাকে উপেক্ষা করা চলে না।

বাৎস্যায়ন 'আরব্ধিকা' নামক একটি খেলার উল্লেখ করিয়াছেন। একটা শব্দ করিয়া খেলা আরম্ভ করিতে হয়। খেলার নাম আরব্ধিকা। গ্রামের অনেক খেলাই আরব্ধিকার পর্যায়ে পড়ে। এই খেলার নাম 'চাকাচুয়া'। একটি সীমানা নির্দিষ্ট করিয়া নির্দিষ্ট ব্যবধানে দুই পক্ষ গিয়া দাঁড়াইবে। দুই পক্ষেই বালক বা বালিকার সংখ্যা সমান থাকিবে। এক পক্ষের একজন প্রথমত 'চু—' বা এইরূপ কোন একটি শব্দ করিয়া অপর পক্ষের বালকদের ছুঁইবার চেষ্টা করিবে। অপর পক্ষ পলাইয়া বেড়াইবে। যদি কেহ ছোঁয়া পড়ে সে এই দলে আসিয়া যোগ দিবে। এবং সে পুনরায় এ পক্ষের হইয়া অপর পক্ষকে ছুঁইবার চেষ্টা করিবে। শব্দ করিয়া ঘুরিবার সময় যদি শব্দ বন্ধ হইয়া যায়, এবং সেই সময় অন্য পক্ষ তাহাকে ছুঁইতে পারে, তখন সে আবার অন্য পক্ষে গিয়া যোগ দিবে। 'হা-ডু-ডুর' সঙ্গে ইহার পার্থক্য এই যে, একজন অন্য পক্ষের নিকট হারিলে সেই পক্ষের দলে ভিড়িয়া যায়, এবং সেই পক্ষের হইয়া খেলিতে পায়। একটি দলকে ছুঁইয়া নিঃশেষ করিতে পারিলেই জিৎ হইল।

আমাদের অঞ্চলে আর একটি খেলা আছে, খেলাটির নাম 'বাচিক'। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, খেলার বচনের কোন আড়ম্বর নাই। এমন কি খেলা প্রায় নিঃশব্দেই চলে। খেলার কায়িক সম্বন্ধটাই ষোলআনা। এই খেলাতেও একটি ঘর আঁকিতে হয়। ঘরটি সমচতুষ্কোণ হইবে, এবং দুই কুঠরীতে বিভক্ত থাকিবে। সমান সংখ্যক বালক দুই দলে খেলিবে। এক দল 'খেলা ঘরে'র একদিক হইতে ক্রমান্বয়ে ঘর দুইটি পার হইয়া অন্যদিকে পৌঁছিবার চেষ্টা করিবে, অন্য দল তাহাদিগকে আগুলিবে। বালিকারা এ খেলা খেলিতে পারে না।

১
ক খ
২
গ ঘ
৩
ঙ চ
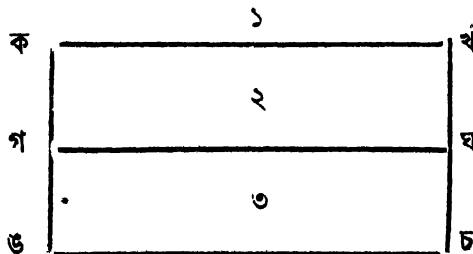
একদল 'এক' চিহ্নিত স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিবে। অন্যদল 'ক' হইতে 'খ' চিহ্নিত পথে, 'গ' হইতে 'ঘ' চিহ্নিত পথে, এবং 'ঙ' হইতে 'চ' চিহ্নিত পথে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে আগুলিবে। 'এক' চিহ্নিত স্থানে বালকদল ক খ সরল রেখা পার হইয়া 'দুই' চিহ্নিত কুঠরীতে পৌছিবার চেষ্টা করিবে। ক খ সরল রেখা যাহারা আগুলিয়া আছে, তাহারা বাধা দিবে। দুই পক্ষ একজন অন্যজনের হাতে হাত দিয়া উভয়ে উভয়কে টানিয়া সরাইবার চেষ্টা করিবে, উভয়ে আপন আপন সামর্থ্যমত পরস্পরকে হঠাইবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিবে না। সেই সময় যদি কেহ কাহারও পায়ে পা লাগাইয়া ফেলিয়া দিতে পারে, যে পড়িবে, সে-ই মরিবে। অনেক ক্ষেত্রে পায়ে পা ঠেকাইয়া দিতে পারিলেই কাজ হাসিল হয়। এই অবস্থায় খুব ধীরে সুস্থে কিছু করিবার সময় থাকে না। সুতরাং পায়ে পা ঠেকাইবার নামে জোর লাথি চলে। প্রায় হাতে পায়ে সমানে দ্বন্দ্বযুদ্ধ সুরু হয়। 'এক' চিহ্নিত ঘর হইতে যদি কেহ 'দুই' চিহ্নিত ঘরে আসিয়া পৌছিল, তাহাকে আবার 'তিন' চিহ্নিত ঘরে পৌছিতে হইবে এবং সে গ ঘ সরল রেখায় পূর্বমত বাধা পাইবে। এইরূপ 'তিন' চিহ্নিত ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া না দাঁড়াইতে পারিলে জিৎ হইবে না। কিন্তু তখনও ঙ চ সরল রেখা পার হইতে হইবে। যদি কেহ 'দুই' চিহ্নিত বা 'তিন' চিহ্নিত ঘর হইতে ডাহিনে বামে বাহির হইতে চায়, তখন ক খ সরল রেখার বালক ক গ পথে বা খ ঘ পথে এবং গ খ সরল রেখার বালক গ ঙ পথে বা ঘ চ পথে আসিয়া তাহাকে বাধা দিবে। এই খেলাকে একরূপ 'হাতাহাতি' লড়াই বলিলেও চলে। কারণ হাতে হাতে প্যাঁচ কষিবার সময় অথবা পায়ে পায়ে জড়াজড়ি করিতে গিয়া অনেক ক্ষেত্রে একজন আর-একজনকে জাপটিয়া ধরিয়া ফেলে এবং উভয়ে মাটিতে গড়াইয়া পড়ে। এই খেলা না শিখিলে হঠাৎ কেহ খেলিতে পারে না। এই খেলায় পরিশ্রম হয় প্রচুর এবং অনেক রকম কৌশল অভ্যাস করিতে হয়। ব্যায়ামের দিক দিয়াও ইহার উপযোগিতা কম নহে।

বালক-বালিকা উভয়ে মিলিয়া খেলিতে পারে, এইরূপ আর একটি খেলার নাম 'জল ডিঙ্গাডিঙ্গি'। জল ডিঙ্গানো অর্থাৎ পার হওয়া। সাধারণত গ্রামের 'কুলীতে' এই খেলার স্থান নির্দিষ্ট হয়। কিংবা কোন সমতল ক্ষেত্রে, যেখানে দুই পাশে ঘাস, মাঝখানটা পরিষ্কার, এই খেলা চলিতে পারে। পরিষ্কার স্থানটা জল, আর ঘাস ঢাকা জায়গাটা তার পাড় এইরূপ কল্পনা করিতে হয়। যে হারিয়াছে, সে ঐ ফাঁকা জায়গাটায় দাঁড়াইয়া থাকিবে, অন্যান্য বালক-বালিকা

সেই জায়গাটা পার হইয়া ঘাসের উপর গিয়া দাঁড়াইবে। পার হইবার সময় ছুঁইয়া দিলে, যাহাকে ছুঁইবে—সে-ই অস্পৃশ্য হইবে। ঘাসে পা দিলে আর ছোঁয়া চলিবে না। এক পাড়ে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকা চলিবে না। এপার হইতে ওপারে এবং ওপার হইতে এপারে আনাগোনা করিতে হইবে।

কতকগুলি ধুলা জমা করিয়া তাহার নীচে একগাছি দুর্বাঘাসের খানিকটা অংশ লুকাইয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর যতজন খেলিবে তাহাদের প্রত্যেকেই সেই ধুলার উপর একবার ফুঁ দিবে। এইরূপে ফুঁ দিতে দিতে যাহার ফুঁতে ধুলা উড়িয়া ঘাস দেখা দিবে, সে-ই হারিবে এবং অস্পৃশ্য হইবে। অবশ্য প্রত্যেককে সমান জোরে ফু পাড়িতে হইবে। কেহ কম জোর দিলেই গণ্ডগোল বাধিবে। অনেক সময় আগে ফু দেওয়ার পালা লইয়া ঝগড়া হয়। শেষের দিকে ফু দিতে অনেকেই রাজী হয় না। এই খেলায় খানিকটা দৌড়-ঝাঁপ মন্দ হয় না।

শিশুদের সব খেলাতেই যে ব্যায়ামের সম্পূর্ণ দিক্‌টা দেখিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। শিশুরা খুশি হয়, তাহাদের অঙ্গ চালনার সুবিধা হয়, সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা শিক্ষা হয়, তাহা হইলেই যথেষ্ট। খুশিটাই আসল, অন্য সব কিছু তাহার পরে। অবশ্য বয়স্কদের, কিশোর ও যুবকদের বেলা অনেক কিছুই দেখা দরকার।

ধর্মরাজ পূজা

এক

পশ্চাৎপট

কথাটা নূতন করিয়া উঠাইতে হইল। বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া ভাদ্রের পূর্ণিমা পর্যন্ত আমাদের গ্রামাঞ্চলে ধর্মরাজ পূজার ধুম লাগিয়া যায়। অনেক গ্রামে আবার পূর্ণিমারও দরকার হয় না। গ্রামের লোক অবসর বুঝিয়া একটা ভাল দিন দেখিয়া পূজার ব্যবস্থা করে। মোটের উপর ভাদ্র—কোন কোন গ্রামে আশ্বিন মাস পর্যন্ত ধর্মরাজের পূজা চলে।

স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, ধর্মরাজের পূজা বৌদ্ধধর্মেরই রূপান্তর। এই মত প্রায় সর্বসম্মতরূপেই

গৃহীত হইয়াছে। এক সময় শিক্ষার্থীরূপে শাস্ত্রী মহাশয়ের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইবার আমার সুযোগ ঘটিয়াছিল। সেই সময় ধর্মরাজ পূজা সম্বন্ধে আমার সন্দেহের কথা তাঁহাকে নিবেদন করিয়াছিলাম। তিনি অনুগ্রহপূর্বক বহু প্রশ্নেরই সদুত্তর দিয়াছিলেন। সন্দেহ কিন্তু তখনও ছিল, এখনও আছে। সাধারণের অবগতির জন্য সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।

আমার মনে হয়, ধর্মরাজ পূজা বৌদ্ধধর্মেরই রূপান্তর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার মধ্যে আরও কিছু আছে। বৌদ্ধধর্ম সারা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল, কিন্তু ধর্মরাজ পূজা পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়ায় মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মুর্শিদাবাদের দুই-একটি স্থানে কিংবা মানভূম, মেদিনীপুরের কোন গ্রামে হয়ত ধর্মপূজার অস্তিত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু সর্বত্র প্রচলিত নাই। এই জন্যই সন্দেহ হয়, কোনরূপ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে দক্ষিণ রাঢ়ের সীমাবদ্ধ স্থানে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল। প্রয়োজন শেষ হইয়া গেলে আর ইহা বিস্তৃতি লাভ করেতে পারে নাই। ধর্মরাজ পূজা পূর্ব বা উত্তরবঙ্গে প্রচলিত নাই।

আমার দৃঢ় ধারণা খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথমভাগে দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণে রাঢ়ে বঙ্গে একটা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। রাজেন্দ্র চোল দণ্ডভুক্তির রাজা (মেদিনীপুর দাঁতনের) ধর্মপালকে নিহত করিয়া দক্ষিণ রাঢ়ের (গড় মান্দারণের) অধিপতি রণশূরকে পরাজিত করিয়া বঙ্গে গোবিন্দ-চন্দ্রকে রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া এবং উত্তর রাঢ়ে মহীপালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সুতরাং এই যুদ্ধে রাঢ়দেশই বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। অনধিকৃত-বিলুপ্ত-পিতৃরাজ্য-গৌড়েশ্বর প্রথম মহীপাল গৌড় হারাইয়া রাঢ়ের বনময় প্রদেশে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। চোল আক্রমণে তিনি নূতন করিয়া বিপদগ্রস্ত হইলেন। এদিকে দণ্ডভুক্তির ধর্মপাল নিহত এবং দক্ষিণ রাঢ়ে রণশূর পরাজিত হওয়ায় উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়ের মধ্যবর্তী স্থান অজয়তীরস্থিত ঢেকুরের রাজা কর্ণসেনকে বিতাড়িত করিয়া ইছাই ঘোষ ঢেকুড় গড় বা শ্যামারূপার গড় দখল করিয়া লইলেন। ইছাই-এর পিতা সোম ঘোষ হয়ত দণ্ডভুক্তিপতি ধর্মপালের কিংবা গৌড়েশ্বর মহীপালের প্রতিনিধি ছিলেন। ঢেকুড় বোধ হয় দণ্ডভুক্তি, দক্ষিণ রাঢ় ও উত্তর রাঢ়ের সীমান্ত ছিল। অথবা কর্ণসেন ধর্মপাল বা মহীপালের সামন্ত ছিলেন। যাহা হউক কর্ণসেন বাঁকুড়া জেলার ময়নাপুরে পালাইয়া গেলেন এবং কর্ণসেনের পুত্র লাউসেন সৈন্য সংগ্রহপূর্বক কিছুদিন পরে

ইছাইকে বধ ও পিতৃরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিলেন। আমার মনে হয় রামাই পণ্ডিত লাউসেনকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সাহায্যের জন্য ধর্মরাজ পূজার প্রবর্তন। বিশেষ করিয়া যাহারা রাঢ়ের যোদ্ধজাতি—সেই ডোম হাড়ি প্রভৃতি জাতিকে সংঘবদ্ধ করিবার জন্যই ধর্মরাজ পূজার প্রয়োজন হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম মিলাইয়া সৎশূদ্র ও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মিলনকেন্দ্ররূপেই ধর্মরাজ পূজার সৃষ্টি হয়। শিবের গাজনের অনুকরণে ধর্মের গাজন ও শালগ্রামশিলার অনুকরণে ধর্মশিলার কল্পনা হইয়াছিল। পুরাণ-কথিত শঙ্খচূড়-পত্নী তুলসীর শাপে বিষ্ণুর শিলারূপ প্রাপ্তির উপাখ্যানের মত সাবিত্রীর শাপে বিষ্ণুই যে ধর্মশিলায় পরিণত হইয়াছেন, ময়ুরভট্টের ধর্মমঙ্গলে এইরূপ একটি উপাখ্যান আছে। উপাখ্যানটি এইরূপ—'একদিন ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা ব্রহ্মযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। নিমন্ত্রণ পাইয়া মুনি ঋষি ও দেবতাগণ উপস্থিত হইলেন। কয়েকদিন খুব সমারোহের পর পূর্ণাহুতির সময় সাবিত্রীদেবীর খোঁজ পড়িল। কারণ সহধর্মিণী ভিন্ন যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবে না। সাবিত্রীর কি কারণে অভিমান হইয়াছিল। বিষ্ণু প্রভৃতির অনেক অনুরোধেও তিনি যজ্ঞক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন না। বিধি বিষাদমগ্ন, কিন্তু বিষ্ণুর গুণের সীমা নাই। তিনি এক গোয়ালার মেয়েকে আনিয়া ব্রহ্মার বামে বসাইয়া দিলেন। তিনিই গায়ত্রী (বোধ হয় গোপ-কন্যার ছদ্মবেশে কোথাও বসিয়াছিলেন, বিষ্ণু চিনিয়া ধরিয়া আনেন)। বিষ্ণু ব্রহ্মার সঙ্গে তাঁহার কর মেখলাবদ্ধ করিয়া দিলে সৃষ্টিপতি তাঁহার করে কর দিয়া ঘৃতাহুতি দিতেছেন, এমন সময় সাবিত্রী আসিয়া উপস্থিত। তিনি তো রাগিয়াই অস্থির, সাবিত্রী বলিলেন৷ যিনিই এই কাণ্ড করিয়া থাকুন, তিনি যিনিই হউন, তাঁহাকে মর্তে পাথর (শিলামূর্তি) হইয়া থাকিতে হইবে। সতীর মান রাখিবার জন্য নারায়ণ তথাস্তু বলিয়া এই অভিশাপ মাথা পাতিয়া লইলেন। এদিকে গোপগণ ক্ষেপিয়া উঠিল। বিধির অবিধি দেখিয়া বাঁকবাড়ি ঘাড়ে করিয়া লড়াই দিতে আগাইয়া আসিল। বেগতিক দেখিয়া নারায়ণ কহিলেন, বাপু! তোমাদের এত রাগের কারণ কি? তোমাদের বাড়ীর মেয়ে ব্রাহ্মণী হইয়া গেল। দেখিলে তো মেখলা বাঁধিয়া ব্রহ্মার যজ্ঞাসনে বসিয়া যজ্ঞ করিল। এখন হইতে ব্রাহ্মণেও তাহাকে পূজা করিবে। ইহা হইতে আর কি সৌভাগ্য কামনা কর? এখন রাগ-রোষ ছাড়িয়া আমার কাছে বর লও। গোপদের দলপতি অগ্রসর হইয়া বলিল, ঐ কন্যাকে পুনরায় গোপকুলেই জন্ম লইতে হইবে এবং তুমিও আমাদের ঘরে

জন্মগ্রহণ করিবে। এই বর আমরা চাই। বিষ্ণু বলিলেন তাহাই হইবে। বিষ্ণু-বরে ঐ গায়ত্রীই রাধা হইয়া জন্মিয়াছিলেন এবং নারায়ণও কৃষ্ণরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সাবিত্রীশাপে বিষ্ণু বল্লুকা নদীর তীরে পাষাণ হইলেন। আর বজ্রকীটে কাটিয়া কাটিয়া তাঁহাকে ধর্মশিলায় পরিণত করিতে লাগিল। ময়ূরভট্টের ধর্মপুরাণে ধর্মশিলার বিবিধ লক্ষণ ও নামের বর্ণনা শালগ্রাম শিলার লক্ষণ ও নাম-বর্ণনার অনুরূপ।

ধর্মপূজার বিধান বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাই ধর্মঠাকুরের আবরণ দেবতার মধ্যে শিব, বিষ্ণু, দুর্গা লক্ষ্মী প্রভৃতি রহিয়াছেন। ধর্মপূজার সময় প্রায় অধিকাংশ স্থানেই বৈদিক হোম করিতে হয়। সুতরাং ইহাকে একবারে নির্জলা বুদ্ধপূজার বিকৃত রূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করা চলে না। পূর্বেই বলিয়াছি বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূমের মধ্যে ধর্মপূজার উৎপত্তি ও বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল। আজিও এই তিনটি জেলার মধ্যেই ধর্মপূজার আধিক্য দেখা যায়। বাঁকুড়া জেলায় ময়নাপুর গ্রামে লাউসেনের রাজধানী ছিল। রামাই পণ্ডিতের জন্মভূমি হুগলী জেলার যাজপুরে হইলেও রামাই ময়নাপুরেই বাস করিয়াছিলেন। ময়নাপুরে রামাই পণ্ডিতের বংশধর এবং তাঁহার পূজিত যাত্রাসিদ্ধিরায় ধর্মরাজ এখনও বর্তমান আছেন। বল্লুকা নদী বর্ধমান জেলায়। বর্ধমানের নিকট দামোদর নদ হইতে বাহির হইয়া এই নদী মুজাপুরের খালে পড়িয়াছে। এই নদীর তীরে বড়োযানে ধর্মঠাকুরের প্রকাণ্ড মন্দির ছিল। মন্দির ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, ধর্মঠাকুর এখনও বর্তমান আছেন। ইছাই ঘোষের রাজধানী ছিল শ্যামারূপার গড়। এই গড় বীরভূম জেলার জয়দেব কেন্দুলীর নিকট অজয়ের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। শ্যামারূপার গড় পূর্বে বীরভূমের অন্তর্গত ছিল, এখন বর্ধমান জেলায় পড়িয়াছে। শ্যামারূপার গড়ের পূর্বে গড়ের সীমানার মধ্যেই বাঙ্গালার অন্যতম দর্শনীয় সুপ্রসিদ্ধ ইছাই ঘোষের দেউল। শ্যামারূপার গড়েই ইছাই-এর সঙ্গে লাউসেনের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং ইছাইকে বধ করিয়া লাউসেন শ্যামারূপার গড় অধিকার করিয়াছিলেন। ধর্মমঙ্গল-বর্ণিত তারাদীঘি, জসন্দার গড়, বাঘা কামদলের মাঠ প্রভৃতি বীরভূমেই অবস্থিত।

বীরভূম বর্ধমান ও বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানের রাজারা সেকালে হাড়ি, ডোম, বাগ্দি, মল্ল, ভল্ল, চোঁয়ার, খয়রা প্রভৃতি জাতিকেই সৈন্যদলে গ্রহণ করিতেন। ইহারাই অন্তঃপুরের রক্ষক ছিল, ইহারাই রাজার দেহরক্ষীর কার্য করিত।

ধর্মের দেবাংশী বা দেয়াশীদের মধ্যে আজিও এই সমস্ত জাতিরই প্রাধান্য দেখিতে পাই। সৈন্যদলে গোয়ালা, সৎগোপ, শুঁড়ি, আগুড়ি প্রভৃতি জাতির সংখ্যাও প্রচুর ছিল। তথাপি অনেক সময় হাড়ি ডোম বাগ্‌দি প্রভৃতি জাতির লোকেরাই সেনাপতির কার্য করিত। এই সমস্ত জাতিকে একতার বন্ধনে বাঁধিবার জন্যই ধর্মরাজ পূজার প্রয়োজন হইয়াছিল। আজিও ধর্মরাজ পূজায় জাতিবিচার নাই। ভক্ত হইলেই পূজার কয়দিন সকলেই যেন এক জাতি হইয়া যায়।

ইতিপূর্বে ব্রাত্যসেবা-শুদ্ধির কথা বলিয়াছি। যাযাবরেরা প্রায়ই শৈব ছিলেন। শৈবযজ্ঞেই তাঁহাদের শুদ্ধি হইত। শিবভক্তেরা উত্তরী গলায় দিয়া ব্রতাচরণে শুদ্ধ হইয়া কয়দিনের জন্য শিবের গাজনে আজিও সেই শুদ্ধিরই অনুষ্ঠান করে। শুদ্ধিকার্য বৈদিক আমল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। পদ্ধতিটা বেদেরই পদ্ধতি। অথর্ববেদে ইহার পরিচয় আছে। ধর্মরাজ পূজাতেও ছত্রিশ জাতিকে গলায় উত্তরী দিয়া শুদ্ধ করিয়া লওয়া হয়। সংযমের দিনেই উত্তরী লওয়া সাময়িক উপবীত গ্রহণেরই রূপান্তর। ধর্মরাজ পূজার দিনে হোম শুদ্ধিযজ্ঞের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। যজ্ঞশেষে তিলক সকল ভক্তকেই গ্রহণ করিতে হয়। গাজনের শেষে শিবের ভক্তগণের যেমন, ধর্মরাজের ভক্তগণেরও তেমনই—বাঁক কাঁধে লইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয়। ভিক্ষালব্ধ চাউল কলাই আদি রাঁধিয়া সকলে মিলিয়া খাইয়া থাকে। ইহাও সেই পূর্বেকার যাযাবর সম্প্রদায়ের রীতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই জন্যই বলিতেছিলাম —ধর্মরাজ পূজা নিছক বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর নহে। আমার মনে হয় ধর্মরাজ পূজার মধ্য দিয়া রামাই পণ্ডিত একটি যোদ্ধসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাম্র ইহাদের ঐক্যের প্রতীক ছিল। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল এবং পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইহার প্রয়োজন শেষ হইয়া গেলে ইহা আর বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। পরে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ধর্মরাজ পূজার একটি নূতন আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই সময়ের মধ্যেই বহু কবি ময়ূরভট্টের অনুকরণে নূতন করিয়া ধর্মমঙ্গলের পুঁথি রচনা করেন। তাহার কারণও ছিল।

বৈষ্ণব ধর্মের আন্দোলন ও রসকীর্তনের স্রোত মন্দীভূত হইয়া আসিলে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর কবিগণ কাব্যরচনার নতুন বিষয়বস্তুর অনুসন্ধান করিতে থাকেন। ইহাদের মধ্যে কেহ মনসামঙ্গল, কেহ শিবায়ন, কেহ ধর্মমঙ্গল, কেহবা

যাত্রা এবং কবিগান রচনায় মনোনিবেশ করেন। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসের সমকক্ষ না হইলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহারা প্রতিভা ও কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যেও কবিকঙ্কণ, রায়গুণাকর, রামবসু, নিধুবাবু, রামপ্রসাদ, দাশুরায়ের মত কবির উদ্ভব হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া এই সময়টিতে মঙ্গলকাব্য রচনার আরও একটি কারণ ছিল। এই সময়েও পশ্চিমবঙ্গে গুরুতর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। মগ এবং ফিরিঙ্গীর দল অজয় এবং ময়ূরাক্ষী বাহিয়া বীরভূম বর্ধমানেও অত্যাচার করিতেছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে শোভা সিংহ ও রহিমসার বিদ্রোহ এবং তাহারই কিছুদিনের মধ্যে বর্গীর হাঙ্গামা দেশকে প্রায় শ্মশান করিয়া তুলিয়াছিল। এই দারুণ দুঃসময়ে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম যাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাহাদের জন্যই বিশেষ করিয়া ধর্মমঙ্গলের প্রয়োজন হইয়াছিল। সমাজের নিম্নশ্রেণীগুলিকে একতার বন্ধনে বাঁধিবার জন্য, পুরাতন সৈনিকের জাতিদের মধ্যে যুদ্ধের স্মৃতি জাগাইবার জন্য ডোম, হাঁড়ি, বাগ্‌দী প্রভৃতি জাতির হৃদয়ে কালুডোম, লোহাটা বজ্জরের বীরত্ব ও মহত্ত্বের নূতন প্রেরণার জন্য ধর্মমঙ্গলেরই সেদিন প্রয়োজন ছিল। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল বা শিবায়নে সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইত না। কারণ বাঙ্গালীর যুদ্ধের কাহিনী আর কোন মঙ্গলকাব্যেই লিখিত হয় নাই। যদিও ঐ সমস্ত মঙ্গলকাব্যেও নায়ক-নায়িকারা সমাজের নিম্নস্তরের লোক, তাঁহারাও চরিত্রমাহাত্ম্যে পূজা পাইবার যোগ্য এবং তাঁহাদের প্রভাবেও জাতিগঠনে সমাজ কম সাহায্য পায় নাই, তথাপি ধর্মমঙ্গলের সঙ্গে ঐগুলির পার্থক্য সুস্পষ্ট। সাহিত্যের দিক দিয়া মূল্য যাহাই হউক, জাতীয়তার দিক দিয়া মঙ্গলকাব্যগুলির মূল্য নিতান্ত কম হইবে না।

দুই

আমাদের গ্রামে তিনটি ধর্মরাজ পূজা পাইতেন। একটির নাম বৃদ্ধ রায় বা বুড়া রায়, অন্যটি সুন্দর রায় বা সিন্ধু রায়। আর একটির নাম কালুবীর। কালুবীর ডোমদের ঠাকুর, একজন ধরমপণ্ডিত তাঁহার দেয়াশী ছিলেন। কালুবীর আছেন, কিন্তু পণ্ডিতের বংশধর না থাকায় পূজা লোপ পাইয়াছে। সুন্দর রায়ের দেয়াশী জাতিতে কলু। শুঁড়ি জাতি প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। বুড়া রায় ধর্মরাজের একটা ইতিহাস আছে।

গ্রামের ভট্টাচার্য বংশ বহুদিনের পুরাতন। বাড়ীতে চতুষ্পাঠী ছিল, বহু পণ্ডিত এই বংশকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ইঁহারা পৌরোহিত্য করিতেন। শাক্ত এবং বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণই ইঁহাদের যজমান ছিলেন। যজমান বাড়ীতে ইঁহারা দুর্গোৎসবে মন্ত্র পড়াইতেন, সুতরাং বলিদানে আপত্তি ছিল না। কিন্তু ইঁহারা শ্রীশ্রীরাধা মদনগোপাল বিগ্রহের উপাসক। চারি মূর্তি শালগ্রামসহ এই যুগল বিগ্রহ আজিও ইঁহাদের স্থলাভিষিক্তগণের নিকট পূজা পাইতেছেন। সাধারণত দেখিতে পাই অদ্বৈতবংশীয়গণ অথবা অদ্বৈত-পরিবারভুক্ত শিষ্যস্থানীয় ব্রাহ্মণগণই রাধামদনগোপাল বিগ্রহের পূজা করেন ; ভট্টাচার্যগণ কিন্তু কাশীশ্বর-পরিবারভুক্ত। শ্রীচৈতন্যপার্ষদ কাশীশ্বর ব্রহ্মচারীর শিষ্য-পরম্পরা কাশীশ্বর-পরিবার নামে পরিচিত। আশ্চর্যের বিষয় গ্রামের বুড়া রায় ধর্মরাজ এই ভট্টাচার্য-বংশের প্রতিষ্ঠিত। প্রবাদ আছে যে, প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে এই ভট্টাচার্য-বংশের কোন প্রবীণ পণ্ডিত গ্রামের অর্ধক্রোশ দক্ষিণস্থিত কোপাই নদীর তীর হইতে প্রতিদিন প্রভাতে তৃণ সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। কোপাই-এর তীরবর্তী একটি স্থানের নাম বিশালপুর। বহু পূর্বে সেখানে গ্রাম ছিল এবং এখন হইতে দুইশত বৎসর পূর্বেই সে স্থান বসতিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। বিশালপুরের একাংশের নাম ক্ষুদ্র বেলতলা। ভট্টাচার্য তৃণ সংগ্রহ করিয়া এই বেলতলায় বিশ্রাম করিতেন এবং মাঝে মাঝে ঘুমাইয়া পড়িতেন। একদিন বার্ধক্যবশত 'ঘাসের বোঝা' মাথায় তুলিতে না পারিয়া এদিক ওদিক লোক খুঁজিতেছেন, এমন সময় তাঁহারই সমবয়স্ক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া বোঝাটি তাঁহার মাথায় তুলিয়া দিলেন। ভট্টাচার্য বাড়ী ফিরিয়া ঘাসের বোঝা নামাইয়া বিশ্রাম করিতে গিয়া তন্দ্রাঘোরে স্বপ্ন দেখিলেন, সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিতেছেন—'আমি বুড়া রায় ধর্মরাজ। আমি তোমার ঘাসের ঝুড়িতে রহিয়াছি। বিশালপুরে বহুদিন আমার পূজা হয় নাই, তুমি আমার পূজা কর।' ভট্টাচার্য উঠিয়া ঝুড়ি হইতে ঘাসগুলি সরাইয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যে ধর্মরাজ রহিয়াছেন। ধর্মরাজকে তিনি নিজ বাসগৃহের নিকটস্থিত এক তমালতলায় ঝোপের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং মদনগোপাল বিগ্রহ পূজার সঙ্গে নিত্য পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অর্থাৎ ভট্টাচার্য-পরিবারে যাঁহার যেদিন মদনগোপাল পূজার পালা পড়িত, তিনি সেই সঙ্গে ধর্মরাজ পূজার পালাও গ্রহণ করিতেন। আতপ তণ্ডুল এবং মিষ্টান্ন দিয়া নিত্য পূজা হয়, কিন্তু মদনগোপাল বিগ্রহের মত ধর্মরাজের মধ্যাহ্নভোগ বা শীতলভোগের কোন ব্যবস্থা নাই। আজিও ভট্টাচার্য-পরিবারের উত্তরাধিকারিগণ বুড়া রায়ের পূজা করেন।

ভট্টাচার্যগণ বুড়া রায়ের নিত্য পূজা করিতেন, কিন্তু বাৎসরিক পূজায় কয়দিন একজন শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণের উপর ধর্মরাজের পূজার ভার অর্পিত থাকিত। ভক্তদের গলায় উত্তরী দেওয়া ইত্যাদি সমস্ত কার্য তিনিই করিতেন। পূজার দিন গ্রামবাসিগণ যে চাউল বা পয়সা বা মিষ্টান্ন ধর্মরাজের উদ্দেশ্যে দিয়া যাইত, সে সমস্ত তিনিই লইয়া যাইতেন। পূজা উপলক্ষে গ্রামবাসী এবং ভক্তদের নিকট হইতে তাঁহার প্রাপ্য বড় কম হইত না। এই প্রাপ্য অপরকে দিয়া ভট্টাচার্য মহাশয় কি লাভে বা কিসের লোভে ধর্মরাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন জানি না। সারা বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন নিজের বাড়ী হইতে একমুষ্টি আতপ ও একটু গুড় বা দুইখানি বাতাসা জোগান দেওয়াও তো কম কথা নহে। আজিও সেই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। বাৎসরিক পূজার প্রাপ্য অপরে পায়। নিত্য পূজা ভট্টাচার্য-বংশীয়গণ করেন। আমার মনে হয় গ্রামে জনসাধারণের কোন গ্রামদেবতা ছিল না। মদনগোপাল বিগ্রহ দিয়া তিনি হাড়ি ডোম মুচি বাগ্‌দীদের হৃদয় জয় করিতে পারেন নাই, তাহাদের মনে স্থান করিয়া লইতে পারেন নাই। তাই বিশালপুরে ধর্মশিলা পাইয়া গ্রামের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের জন্যই তিনি অত ঝঞ্ঝাট সহিয়াও সেই শিলাকে গ্রামদেবতারূপে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ময়ূরভট্ট বুড়া রায় ধর্মরাজের লক্ষণ বলিতেছেন—

বৃদ্ধরায় ধর্ম চিহ্ন শুন বাছাধন।
সুরধুনী সরস্বতী আছয়ে স্থাপন॥
কমঠ আকৃতি তার বাম ভাগে নাগ।
সপ্তদল পদ্মাসন অঙ্গ চারি ভাগ॥

বুড়া রায়ের নাগটি কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। একটি ঘোড়া আছে তাহারও পা এবং মাথা নাই। কেহ কেহ মনে করেন এই ঘোড়ার উপরেই নাগটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুরধুনী ও সরস্বতীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অনেক প্রাচীন লোকের মুখেই শুনিয়াছি, পদ্মাসন, ধর্মরাজ ও ঘোড়াটি মাত্র বিশালপুর হইতে পাওয়া গিয়াছিল। পদ্মাসনটি এখনো আছে। ধর্মরাজের আকৃতি এইরূপ—

উপরি উপরি তিনটি চতুর্ভুজ বেদীর আকার। ইহার মধ্যে 'অঙ্গ চারিভাগ' কি অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে বুঝিতে পারি না। মূর্তিটি সিন্দুরে এমনভাবে ঢাকা পড়িয়াছে যে, স্তরগুলি ভালরূপে দেখা যায় না। পদ্মাসনটি বোধ হয় পাথরের তৈরী ; কিন্তু ধর্মরাজ পাথর কাটিয়া অথবা পোড়ামাটিতে গড়া, চিনিবার

উপায় নাই। ধর্মরাজের মূর্তির মধ্যে কোন কুলুঙ্গী নাই। ইহাকে কমঠ আকার বলা চলে কিনা সন্দেহ। বাণেশ্বরের আকার এইরূপ—একটি লম্বা চৌ-কোণা কাঠের উপর লোহার গজাল দেওয়া।

মূল-দেয়াশী তাঁতি, ইহারাই পুরুষানুক্রমে দেয়াশীর কাজ করিতেছেন। শিব-দেয়াশী একজন বাগ্দী, শিব-দেয়াশী সমস্ত গ্রামের ধর্মরাজের প্রজার প্রতিনিধি অর্থাৎ তাহাদের হইয়া শিব-দেয়াশী উপবাস করে। ইহারাও পুরুষানুক্রমে শিব-দেয়াশীর কাজ করিতেছে এবং তজ্জন্য গ্রামবাসীদের নিকট হইতে দশ আনা পয়সা পাইত। এখন পাঁচ টাকা লইয়া থাকে। সকল জাতির লোকেরই ভক্ত হইবার অধিকার আছে। গ্রামের মুচি, হাড়ি, ডোম, বাগ্দী, কলু, শুঁড়ি, তাঁতি প্রতি বৎসর সকল জাতির লোকেই ভক্ত হয়।

উল্টারথের দিন হইতে (সাধারণত রথের আট দিনের দিন) প্রতিদিন সন্ধ্যায় ধর্মরাজের নিকট একটি ঢাক বাজাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। বোধ হয় পূর্বে এইদিন গাজন আরম্ভ হইত। মূল-দেয়াশী ও শিব-দেয়াশী পূজার চারিদিন পূর্বে ক্ষৌর করিয়া সংযমী হইবে। প্রথমদিন ক্ষৌরকার্য ও স্নানের পর নূতন মালসায় রাঁধিয়া এক বেলা নিরামিষ আহার করিবে। রাত্রে, ফল, দুধ, মিষ্টি। তৎপর দিন অন্য ভক্তগণ ক্ষৌর করিবে এবং সংযমী হইয়া এক বেলা নিরামিষ আহার করিবে। এইদিন মূল-দেয়াশী ও শিব-দেয়াশী সারাদিন উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যায় বাণেশ্বর ও অপরাপর ভক্তগণকে লইয়া একটি নির্দিষ্ট পুষ্করিণীতে গিয়া বাণেশ্বরকে স্নান করাইবে। পূজক বাণেশ্বরের পূজা করিয়া মূল-দেয়াশী ও শিব-দেয়াশীর গলায় উত্তরী (নূতন সূতা পাকাইয়া মালার মত গাঁইট দেওয়া) পরাইয়া দিবেন। আরও কতকগুলি উত্তরী বাণেশ্বরের গজালে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। পরদিন অন্যান্য ভক্ত তাহা গলায় পরিবে। এই বাণেশ্বর পূজার নাম বানামো বা বাণমুখ। মূল-দেয়াশী বাণেশ্বর পূজার পর বাড়ী ফিরিয়া রাত্রে মসিনার ডাঁটার আড়াই মুড়া জালে হবিষ্য রাঁধিবে। আহারের সময় কোন শব্দ কানে গেলে আর আহার করিতে পাইবে না। আহারের পর স্নান করিতে হইবে।

তৃতীয় দিন সকল ভক্তেরই সমস্ত দিন উপবাস। সন্ধ্যার সময় একটি ছোট্ট চারিপায়ার উপরে শাদা চামর বাঁধিয়া খাটিয়াটিকে পট্টবস্ত্রে ঢাকিয়া তাহার মধ্যে ধর্মরাজকে রাখিতে হইবে। খাটিয়ার চারিটি খুরার নীচে দুইটি ছোট বাঁশের 'সাঙ্গ' (ডাঁটা) বাঁধিয়া দিবে। তৎপূর্বে চারিধারে ঢাক বাজিবে, পূজক শুদ্ধচিত্তে যুক্তকরে ধর্মরাজের মাথায় ফুল চাপাইয়া ধর্মরাজকে বাহির করিবার

অনুমতি ভিক্ষা করিবে। ভক্তগণ জোড়হাতে দাঁড়াইয়া হাঁকিবে, 'জয় বাবা বুড়া রায় ধর্মরাজ হে', ফুল পড়িয়া গেলে বুঝিতে হইবে অনুমতি পাওয়া গেল। ফুল যদি মাথায় চাপিয়া বসিয়া যায়, তবে তাহা শুভ লক্ষণ নহে। অনুমতি পাওয়া গেলে পূজক-ব্রাহ্মণ ধর্মরাজকে খাটিয়ার মধ্যে রাখিয়া ভক্তদের গঙ্গাজল ও আশীর্বাদী পুষ্প দিয়া খাটিয়াটি মূল-দেয়াশী ও অন্য একজন ভক্তের কাঁধে তুলিয়া দিবেন। সম্মুখে প্রচুর ধূপ ধুনা দিতে হইবে, চারিপাশে ঢাক বাজিবে, ভক্তগণ সমস্বরে জয়ধ্বনি করিবে, কিছুক্ষণ পর দেয়াশী মাথা দোলাইয়া নাচিয়া উঠিবে। নাচিতে নাচিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া অপর ধর্মরাজের 'আটনে' গিয়া উপস্থিত হইবে। পরে সেই ধর্মরাজকে সঙ্গে লইয়া কোপাই নদীর ঘাটে গিয়া ধর্মরাজকে স্নান করাইবে। এইখানে পূর্বে ভক্তগণের জিহ্বায় 'বাণ ফোঁড়া' হইত। কর্মকার একটি ধারালো ছুঁচ লইয়া জিভের এধার-ওধার ফুঁড়িয়া দিত, ভক্তগণ বেলপাতা চিবাইয়া রক্ত বন্ধ করিত। এখান হইতে ধর্মরাজকে লইয়া পূর্বোক্ত বিশালপুরের সেই ক্ষুদ্র বেলতলায় যাইতে হয়। সেখানে ধর্মরাজের পূজা হয়। পূর্বে ভক্তগণ সেখানে নানারূপ নাচ ও খেলা দেখাইত। মূল-দেয়াশী এখান হইতেই অন্যের কাঁধে ধর্মরাজকে তুলিয়া দিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসে। এইবার ডোম, হাড়ি, মুচি, বাগ্‌দী যে কেহ ধর্মরাজকে কাঁধে লইয়া নাচিতে নাচিতে জানাবাজ নামক অন্য একখানি গ্রামের মধ্য দিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসে। পরে এ-পাড়ার ধর্মরাজ ও-পাড়ায় এবং ও-পাড়ার ধর্মরাজ এ-পাড়ায় নাচিয়া অনেক রাত্রিতে আপন আপন আটনে ফিরিয়া থাকেন। পরদিন পঞ্চগব্যে অভিষেক করিয়া পূজক-ব্রাহ্মণ পূজা করেন। এইদিন রাত্রে ধর্মরাজকে আটনে তুলিয়া মূল-দেয়াশী একজন ঢাকী সঙ্গে নিয়া একটি নিমের ডাল এবং বাণেশ্বর স্নানের পুষ্করিণী হইতে এক ঘটি জল আনিয়া রাখে। বলিতে ভুলিয়াছি এই দিন রাত্রে ধর্মরাজকে আটনে তুলিবার পূর্বে ভক্তগণকে হিন্দোল সেবা করিতে হয়। একটি নির্দিষ্ট বেদীর সম্মুখে দুইটি খুঁটা পোতা থাকে, খুঁটার উপর একটি বাঁশ লাগাইয়া রাখিতে হয়। বেদীর উপর ধর্মরাজকে নামাইয়া সম্মুখে অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বালাইবে এবং ভক্তগণ একে একে খুঁটার উপরিস্থিত বাঁশে পা দুইটি লাগাইয়া উর্ধ্বপদে হেঁটমুণ্ডে জোড়হাতে অঞ্জলি ভরিয়া ফুল বা বেলপাতা লইয়া ধর্মরাজের নামে অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিবে। প্রথমে মূল-দেয়াশী, তারপর অন্যান্য ভক্তগণ, এইরূপ সর্বত্র বুঝিতে হইবে। হিন্দোল সেবার পর রাত্রেই এই অগ্নিকুণ্ড হইতে আগুন লইয়া অন্যত্র আর একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া

রাখিতে হয়। ধর্মরাজকে আটনে তুলিয়া মূল-দেয়াশী ও শিব-দেয়াশী কিছু ঘৃতপক্ক দ্রব্য খাইয়া থাকেন। অন্য ভক্তগণেরও অন্নাহার নিষিদ্ধ।

তিন

আগুন খেলা বা ফুল খেলা

পূজার দিন—(পূর্ণিমার দিন) প্রভাতে উঠিয়াই শৌচাদির পর ভক্তগণ পূর্বস্থাপিত অগ্নিকুণ্ডে গিয়া পুরোহিতের অগ্নিপূজার পর এক-একটি জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে লইয়া ধর্মরাজের বেদীর নিকটে (মন্দিরের নিকটে রাখিলেও চলে) আনিয়া রাখিবে। পরে ধূপদানীতে প্রত্যেকেই এক একটি অঙ্গার হাত দিয়া তুলিয়া দিবে। এই ধূপদানীতে ধূপ দিয়া ধর্মরাজের সম্মুখে রাখিতে হইবে। পরে অগ্নিপ্রদক্ষিণ। মূল-দেয়াশী মন্ত্র বলিয়া প্রথমে গাজনের ধর্মরাজ, ধামাতকন্তি, কামিন্যা ও মুক্তির জয় দিবে। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণ 'জয় বাবা বুড়া রায় ধর্মরাজ হে' বলিয়া জয়ধ্বনি করিবে। পরে গ্রামের অপর ধর্মরাজ ও নিকটবর্তী গ্রামের ও দূরবর্তী প্রধান প্রধান ধর্মরাজের জয় ও জয়ধ্বনি হইবে। মন্ত্রটি এইরূপ—

ধবল খাট ধবল পাট ধবল সিংহাসন।
ধবল পদ্মে বসি আছেন দেব নারায়ণ।
দেব বন্দম, দেয়াশী বন্দম, খাট পাট
লাঠি বন্দম, আলিরি ভকতি বন্দম,
সরস্বতী গঙ্গে, বামে বীর হনুমান—

গাজনে যে বাবা বুড়া রায় ধর্মরাজ আছেন, তাঁর চরণে কোটি কোটি প্রণাম। পূর্বে বুড়া রায় ধর্মরাজের লক্ষণ বর্ণনায় সুরধুনী ও সরস্বতীর উল্লেখ দেখিয়াছি। এই মন্ত্রে 'সরস্বতী গঙ্গে' এই নাম দুইটি বিশেষ লক্ষণীয়। এইরূপে অগ্নিপ্রদক্ষিণ ও মন্ত্রপাঠ ও বন্দনা শেষ হইলে সকলে মিলিয়া নাচিয়া নাচিয়া আগুন নিবাইয়া দিবে।

কাঁটা ঝাঁপ বা কাঁটা ভাঙ্গা

কতকগুলি বাবলা, কন্টিকারী প্রভৃতি কাঁটার উপর বাসকের পাতা চাপাইয়া রাখিবে। এক একজন ভক্ত তাহার উপর পিঠ দিয়া ডিগবাজী দিবে। পুরোহিত তাহার পেটে বা বুকে পা দিয়া এদিক হইতে ওদিক যাইবে। এইরূপ প্রত্যেক

ভক্তের ডিগ্‌বাজী দেওয়া শেষ হইলে একজনের বুকের উপর সেই কাঁটার ঝাঁপ রাখিয়া আর একজনকে তাহার উপর শোয়াইয়া দুইজনকে বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিবে। পরে অন্য ভক্তেরা সেই দুইজনকে ঠেলিয়া খানিক দূর গড়াইয়া দিবে। তাহার পর উঠাইয়া বাঁধন খুলিয়া কাঁটাগুলি অন্যত্র ফেলিয়া দিবে। ইচ্ছা হইলে অন্যান্য ভক্তেরাও এইরূপ বুকে কাঁটা লইয়া গড়াগড়ি দিবে।

পদসেবা

সকল ভক্ত চিৎ হইয়া শুইবে, পুরোহিত তাহাদের বুকে পা দিয়া চলিয়া যাইবেন। পরে ভক্তরা উপুড় হইয়া শুইবে, পুরোহিত পিঠে পা দিয়া চলিয়া যাইবেন। কেহ কেহ ডিগ্‌বাজী দিয়া চিৎ হইয়া পায়ে মাথায় ও হাতে ভর রাখিয়া বুকটা আলগোছে তুলিয়া রাখে, পুরোহিত তাহার বুকে পা দিয়া চলিয়া যান। পায়ের চাপেও তাহার পিঠ মাটিতে না ঠেকিলেই শক্তির পরীক্ষা হয়। বুকে পা দিবার সময় দুইজন ভক্তের কাঁধে বা হাতে পুরোহিত আপনার ভার রক্ষা করিবার চেষ্টা করে।

চক্র বা চরকী ঘুরা

মণ্ডলীবদ্ধভাবে পরস্পরের পায়ের উপর ভর রাখিয়া হাত ধরাধরি করিয়া বুক চেতাইয়া আড়ভাবে ঘুরিতে হইবে।

আরও অনেক রকম খেলা ছিল, এখন সেগুলি লোপ পাইয়াছে। মধ্যাহ্নে ধর্মরাজের পূজা ও হোম হয়। হোমের শেষে পূর্ণাহুতি না দিয়া পাঁঠা উৎসর্গ করিয়া 'ভাঁড়ারের' অপেক্ষা করিতে হয়। যখন 'খোলা ভাঁটি' ছিল তখন ভাণ্ডগুলি মদেই পূর্ণ করিতে হইত। এখন এক ভাঁড় জলে খানিকটা মদ ঢালিয়া দেয়। গ্রামের বাহিরে কোন স্থানে অথবা শুঁড়ির দোকানে সারি দিয়া ভাঁড়ারগুলি বিঁড়ার উপর সাজাইয়া রাখিতে হয়। শিব-দেয়াশী ধর্মরাজের প্রসাদী সিন্দুর ও ফুল প্রত্যেকটি ভাঁড়ে দেয়। শুঁড়ি একটি ধূপদানীতে ধূপ দিয়া ভাঁড়গুলিকে প্রদক্ষিণ করে। অতঃপর ভক্তগণ আপন আপন ভাঁড় মাথায় করিয়া সারি দিয়া দাঁড়ায়, ঢাকীর দল ঢাক বাজায়, কেহ ধূপ দেয়, কেহ জয়ধ্বনি করে। একে একে ভাঁড়ার-মাথায় ভক্ত নাচিয়া নাচিয়া সারি হইতে বাহির হইয়া আসে। এইভাবে সকলেই 'নড়িলে' পর ভক্তগণ একসঙ্গে নাচিতে নাচিতে মন্দিরের

পথে অগ্রসর হয়। মাঝে মাঝে আবার সারি দিয়া দাঁড়ায়, আবার ঢাক বাজাইয়া ধূপ দিয়া সকলকে নড়াইতে হয়। ভক্তগণ ভাঁড়ার লইয়া মন্দিরের নিকট আসিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করে ও ভাঁড়ারগুলি মন্দিরের পার্শ্বস্থিত নির্দিষ্ট স্থানে নামাইয়া দেয়।

মূল-দেয়াশীর ভাঁড়ার লইতে নাই। যদি এই বংশে কেহ ভাঁড়ার মানসিক করে, সে দুধের ভাঁড়ার লইবে, মদের ভাঁড়ার লইতে পাইবে না। কিন্তু অন্যান্য তাঁতি, সদ্‌গোপ-আদি সৎশূদ্রও মদের ভাঁড়ার লইয়া থাকে।

ভাঁড়ারের পর বলিদান, বলিদানের পর পূর্ণাহুতি। উপস্থিত সকলেই শান্তিজল ও যজ্ঞশেষ-তিলক লইবেন। কিন্তু ভক্তগণ কেহই এই দিন তিলক গ্রহণ করে না, পরদিনের জন্য রাখিয়া দেয়। ভক্তগণ এইদিন পূজাশেষে ধর্মরাজের পুষ্পজল লইয়া পূর্বস্থাপিত নিমের ডাল হইতে নিমপাতা লইয়া চিবায়, পূর্বস্থাপিত ঘটের জল মুখে দিয়া বাড়ী যায়। ভক্তগণ এইদিন অন্নাহার করে।

পরদিন সকালে ঢাক সহ ভক্তগণ সকলে গ্রামের এবং পূর্বোক্ত জানাবাজ গ্রামের লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া জয় দিয়া ভিক্ষা লইয়া আসে। রাত্রে সংগৃহীত চাউলাদি রাঁধিয়া সকলে খায়। কিন্তু ধর্মরাজের ভোগ দেয় না। অনেক সময় মধ্যাহ্নে চিড়া ফলার করে। মধ্যাহ্নে বাণেশ্বর লইয়া সকলে মিলিয়া পূর্বনির্দিষ্ট পুষ্করিণীতে যায় এবং স্নানের পর বাণেশ্বর পূজা করিয়া উত্তরীগুলি জলে ফেলিয়া দেয়। মন্দিরে ফিরিয়া পূর্বদিনের রক্ষিত যজ্ঞশেষ-তিলক গ্রহণ করে।

ধর্মের গাজন 'বারমতী গৃহভরণ' নামে পরিচিত। গাজন বারদিন ধরিয়া হয়, বারজন ভক্ত মিলিয়া গাজন করিতে হয়। ধর্মরাজ পূজা-বিধানে অথবা বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ. মহাশয়-সম্পাদিত 'ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল'-এর পরিশিষ্টে গাজনের যে ক্রম নির্দিষ্ট আছে তাহার সঙ্গে আমাদের গ্রামের ধর্মপূজার আচার-নিয়মের সামঞ্জস্য নাই। কিন্তু উল্টাপাল্টা হইলেও কয়েকটি অনুষ্ঠানই আমাদের গ্রামের ধর্মরাজ পূজায় প্রতিপালিত হইতেছে। কামিল্যা স্থাপন ও মুক্তি আনয়ন প্রভৃতি অনুষ্ঠান আমাদের এ অঞ্চলে কোথাও প্রতিপালিত হয় না। নিমজল খাওয়ার কথা কোন পুঁথিতেই পাইলাম না। শবদাহ করিয়া, কিংবা মৃতের অশৌচান্তে প্রথম দিনে ক্ষৌরকার্য সারিয়া বাড়ী ফিরিয়া আমাদের অঞ্চলে লোকে নিমজল মুখে দেয়। আমার সন্দেহ হয়, এই ক্ষুদ্র পল্লীর এই নিমজল খাওয়ার অনুষ্ঠান কি বুদ্ধদেবের তিরোধান এবং তাঁহার দেহ সমাহিত করার কথা স্মরণ

করাইয়া দেয়? এইদিন যজ্ঞ-তিলক না লওয়ার কারণ কি অশৌচের স্মৃতি? আমাদের গ্রাম্য উৎসবে পূজা-পার্বণে যে কতদিনের কত স্মৃতি জড়িত আছে, কত বাহিরের আচার-অনুষ্ঠান মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে, আমরা কি তাহার সন্ধান লইব না?

চার

ধর্মরাজপূজা প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মেরই রূপান্তর হইলেও ইহার সঙ্গে অন্য ধর্মানুষ্ঠানেরও কিছু যোগাযোগ রহিয়াছে। আজকাল শুদ্ধি আন্দোলনে অনেকেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে, অনেকেই ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতেছেন। কেহ কেহ ইহাকে একটা আধুনিক আন্দোলন মনে করিয়া শুদ্ধির নামে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। কিন্তু ইহারা জানেন না যে, 'শুদ্ধি' আজকালকার হুজুগ নহে, অতি প্রাচীন বৈদিক যুগেও এই 'শুদ্ধি' প্রচলিত ছিল। ইহা একটি অতি পবিত্র শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান এবং শিবের গাজনে ও ধর্মরাজ পূজায় ইহারই শেষ চিহ্ন আজিও রহিয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে শতপথ ব্রাহ্মণে যে রুদ্র, সর্ব প্রভৃতি নাম আছে তাহা কুমারেরই নাম, এই কুমারই অগ্নি। শিবের অষ্টমূর্তির কথা এবং কুমার কার্তিকেয়ের জন্মের সঙ্গে অগ্নির সম্বন্ধের কথা সকলেই অবগত আছেন। এই কুমার শিবের পুত্র। ইহা হইতেও অগ্নির সঙ্গে শিবের সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং ব্রাত্যস্তোমের জন্যই হউক, আর এই অগ্নির সঙ্গে সম্বন্ধের জন্যই হউক—হোম বৎসরশেষের চৈত্রের গাজনের বা শিবের গাজনের একটি প্রধান অঙ্গ, বোধহয় সর্বপ্রধান অঙ্গ। অন্যথায় চৈত্রের গাজন 'হোমপর্ব' নামে পরিচিত হইত না। বৈদিক ঋষিরা রুদ্রের ভয়ে সর্বদা অস্থির হইয়া থাকিতেন। সর্বদাই রুদ্রের নিকট প্রার্থনা করিতেন, আমাদের মেরো না, আমাদের ছেলে মেরো না, গরু মেরো না, বাছুর মেরো না, পশু মেরো না ইত্যাদি। বৈদিক হোমের শেষে 'দর্ভজুটিকা' হোমের বিধি আছে। তাহার মন্ত্রটি এইরূপ—

যঃ পশুনামধিপতি রুদ্রস্তন্তি চরোবৃষা
পশুনস্মাকং মাহিংসীরেতদস্তু হুতং তব স্বাহা।

আমাদের মনে হয়, এই যে ব্রাত্যস্তোমে দেবতার অনুসন্ধান, ইহা পতিতোদ্ধারেরই অনুষ্ঠান, ইহাই শুদ্ধিযজ্ঞ। একদিন ভারতবর্ষকে বিশেষ বাঙ্গালীকে এই শুদ্ধিযজ্ঞই বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। তন্ত্র যে এত উদার, তন্ত্রে

সর্ব বর্ণের সমানাধিকার, তাহার কারণ তন্ত্রে শিবেরই প্রাধান্য। তন্ত্রেও শুদ্ধির বিশেষ বিধি আছে।

দেবতা না মানিলে হিন্দু হওয়া যায় না। যাহাদেরই দেবতা হারাইয়াছে, তাহারাই শুদ্ধিযজ্ঞে দেবতাকে খুঁজিয়া পাইতে পারে, হিন্দু হইতে পারে। শিবের গাজনের যজমানদের ভক্ত বলে। ভক্ত কথাটি লক্ষণীয়। হিন্দুদের মধ্যে যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত এই তিন শ্রেণীর সাধক দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান এই তিনের উপাসনা-ভেদে জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত আখ্যা হয়। সুতরাং ভক্ত শব্দের সঙ্গে দেবতার অনুসন্ধান, উপাসনার সম্বন্ধ রহিয়াছে।

আমরা বলিতে চাই যে, ধর্মরাজ পূজার সঙ্গেও এই শুদ্ধির একটা সম্বন্ধ রহিয়াছে। ধর্মরাজ পূজাকে বৌদ্ধ ধর্মের রূপান্তর বলিব, না বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বিগণের হিন্দু ধর্মে ফিরিয়া আসার শুদ্ধি অনুষ্ঠান বলিব? ধর্মরাজ পূজার সঙ্গে নারায়ণশিলা পূজার অনুকরণচিহ্ন জড়িত রহিয়াছে। শিবের গাজনের সুস্পষ্ট ছাপ তো ইহার সর্বাঙ্গে। ভক্ত হইবার জন্য সংযম, উত্তরী গ্রহণ, পূজায় সর্ব বর্ণের সমানাধিকার প্রভৃতি শিবের গাজনের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। উত্তরী গ্রহণ শুদ্ধিরই অনুষ্ঠান। হোম, হোমের অগ্নিস্পর্শ, হোমশেষে তিলক গ্রহণ ইত্যাদিও শুদ্ধির অঙ্গ বলিয়া মনে হয়।

যাঁহারা সমাজসংস্কারক, যাঁহারা হরিজন আন্দোলন করিতেছেন, হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশাধিকারের কথা চিন্তা করেন, তাঁহারা পল্লীগ্রামে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন, আমরা মন্দিরপ্রবেশ ও মন্দিরের দেবতাকে স্পর্শ ও পূজার অধিকার তাহাদিগকে বহুদিন—প্রায় হাজার বৎসর পূর্বেই দিয়াছি। বৈষ্ণবধর্ম যাঁহারা পছন্দ করেন না, শ্রীমন্ মহাপ্রভু যাঁহাদের চক্ষুশূল, তাঁহারা ধর্মরাজ পূজা ও শিবের গাজনের দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন। অস্পৃশ্যতা পরিহারের জন্য তাঁহাদিগকে নূতন মন্ত্র রচনা করিতে হইবে না, নূতন অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করিতে হইবে না। ঢাকের বাদ্য, বলির পশু, রুধিরাক্ত খড়্গ প্রভৃতি অনেক কিছুই তাঁহারা আপনা হইতেই পাইবেন। নূতন কোন জিনিসকে পল্লীগ্রামের লোক সন্দেহের চক্ষে দেখে। সুতরাং পুরাতনেরই নূতন ব্যাখ্যা ও নূতন রূপ দিয়া তাহাদিগকে আপনার করিয়া লইতে হইবে। সুতরাং একবার পল্লীগ্রামের প্রতি, তাহার অতীতের প্রতি, তাহার আচার-অনুষ্ঠান, পূজা, পার্বণ ও উৎসবাদির প্রতি দৃষ্টি ফিরাইতে অনুরোধ করি।

বাঙলার প্রাচীন সাহিত্য

স জয়তি যেন প্রভবতি দৃশি সুদৃশাং ব্যঞ্জনাবৃত্তিঃ।
অতিশয়িতপদপদার্থো ধ্বনিরিব মুরলীধ্বনির্মুরারাতেঃ ॥

পদ ও পদার্থের অতিরিক্ত ধ্বনিনামক বস্তু যেমন সাহিত্য-জগতে সর্বোৎকর্ষব্যঞ্জক, তেমনই বৈকুণ্ঠাদি পদ এবং ব্রহ্মানন্দপদার্থ হইতেও সর্বোৎকর্ষশালী যে ধ্বনি, যাহার প্রভাবে সুদর্শনা গোপ-ললনাগণের নয়নে আনন্দাশ্রু বহিয়া যায় এবং তজ্জনিত অঞ্জনরেখার বিলোপে ব্যঞ্জনাবৃত্তি (বিগতাঞ্জনা) সঞ্জাত হয়, মুরারির সেই মুরলীধ্বনির জয় হউক।

এইরূপে ধ্বনিপ্রাধান্য প্রখ্যাপনপূর্বক আচার্য কবি কর্ণপূর বলিতেছেন—'কবিবাঙ্‌নির্মিতিঃ কাব্যম্' অর্থাৎ কবির বাক্যনির্মিতিই কাব্য। অসাধারণ চমৎকৃতিজনক রচনাকেই তিনি নির্মিতি বলিয়াছেন। কিন্তু কাব্য শব্দটি আমরা সাহিত্য অর্থেই গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের মতে—

(রস যার আত্মা, ধ্বনি যার প্রাণ, ভাব যার শক্তি, শব্দার্থ যার আকৃতি এবং প্রকৃতি, রীতি যার অঙ্গসৌষ্ঠব, ছন্দ যার গতি এবং অলঙ্কার যার ভূষণ, সাধারণত তাহাকেই সাহিত্য বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।) রসের অর্থ কি?—'রস্যতে ইতি রসঃ'। অর্থাৎ (যাহা আস্বাদনীয়, যাহা আস্বাদনযোগ্য, তাহাই রস। লৌকিক জগতে যেমন কটুতিক্তকষায়াদি, সাহিত্য-জগতে তেমনই আদি-বীর-করুণাদি রস নামে পরিচিত। স্বাদঃ কাব্যার্থসম্ভেদাদাত্মানন্দসমুদ্ভবঃ। কাব্যার্থের সম্ভেদে যে আত্মানন্দ উদ্ভূত হয়, তাহারই স্বাদ বা অনুভূতির নামই রস। এই রসই সাহিত্যের আত্মা। ধ্বনি অর্থে 'অতিশয়িতপদপদার্থ'—অর্থাৎ পদ এবং পদের অর্থের অতিরিক্ত যে ব্যঞ্জনা, তাহাই ধ্বনি; এই ধ্বনিই সাহিত্যের প্রাণ। ভাব শব্দের অর্থ—শুদ্ধ সত্ত্ব বিশেষাত্মা প্রেম সূর্যাংশু সাম্য ভাবঃ। রুচিভিঃ চিত্তমাসৃণ্য কৃদসৌভাব উচ্যতে॥ ভাব—'নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম-বিক্রিয়া'। নীরবে বসিয়া ছিলাম, চিত্ত প্রায় নিস্তরঙ্গ ছিল, হঠাৎ একটি ফুল দেখিয়া কিংবা কোকিলের কুহুধ্বনি শুনিয়া "রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ

নিশম্য শব্দান্"। মন চঞ্চল হইল, এই চাঞ্চল্যই ভাব। তরু-আলবালে জল ঢালিয়া, তপোবন-তরুলতাকে ভালবাসিয়া অনসূয়া-প্রিয়ংবদার সঙ্গে ধুলাখেলা করিয়া তাপসপালিতা শকুন্তলা বেশ নিশ্চিন্তেই ছিলেন, অকস্মাৎ এক অদৃষ্টপূর্ব অতিথিকে দেখিয়া হৃদয় তাহার অভিনব আবেগে দুলিয়া উঠিল—ইহাই ভাব। উৎসাহ, উদ্বেগ, ক্রোধ, চিন্তা প্রভৃতি মনোবৃত্তিনিচয়ের নামই ভাব। মহর্ষি ভরত বলিয়াছেন—'বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ।' আচার্যগণ এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলেন—বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের মিলনে স্থায়ীভাব রসরূপে পরিণত হয়। ভাবকে রসের শক্তি বলিয়াছি। সুতরাং ইহাকে আরও একটু যাচাই করিয়া লইতে হইবে। স্থায়ী ভাব রসে পরিণত হয়। স্থায়ীভাব রসরূপে পরিপাকপ্রাপ্ত হয়। শক্তি এবং শক্তিমানে যে ভেদ, ভাব ও রসে সেইরূপ প্রভেদ। রসে ও ভাবে ভেদও আছে, অভেদও আছে, এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য।

উপরে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের নাম করিয়াছি। সাহিত্যদর্পণ-প্রণেতা বলিতেছেন—

কারণান্যথ কার্য্যাণি সহকারীণি যান্যপি।
বিভাবা অনুভাবাশ্চ কথ্যন্তে ব্যভিচারিণঃ॥

স্থায়ীভাবের কারণ বিভাব, কার্য অনুভাব, এবং সহকারীর নাম সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব। শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ভালবাসিয়াছেন এই রতি বা অনুরাগ স্থায়ীভাব। ভালবাসার কারণ দুষ্মন্তকে দেখা—এইটি বিভাব। বিভাব দুই রকম—আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব। দুষ্মন্ত এখানে আলম্বন অর্থাৎ ভালবাসার অবলম্বন। দুষ্মন্ত-প্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক, বনস্থলী, ভ্রমরগুঞ্জন, কুহুধ্বনি প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব। দূতীপ্রেরণ, প্রণয়লিপি-লিখনাদি অনুভাব, অর্থাৎ এইগুলি অনুরাগের কার্য। আর বিষাদ, চিন্তা, মালিন্য প্রভৃতি সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব। নয়টি রসেরই এইরূপ স্থায়ীভাব বিভাবাদি আছে। আচার্যগণ বলেন, আদিরসের স্থায়ীভাব অনুরাগ। এখন দেখিতে হইবে, আদিরস বা শৃঙ্গার-রসের সঙ্গে অনুরাগের পার্থক্য কি। দুষ্মন্তকে দেখিবার পূর্বে কি শকুন্তলার হৃদয়ে আদিরসের বসতি ছিল না? ছিল, তবে সুপ্ত ছিল; দুষ্মন্তকে দেখিয়া হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হইল, সেই ভাবই ধীরে ধীরে আদিরসকে উদ্বোধিত করিল, জাগাইয়া তুলিল এবং ক্রমে সেই ভাবরাশিও আদিরসে রূপান্তরিত হইল। রসজলনিধির তরঙ্গের নামই ভাব এবং ভাবের

প্রগাঢ় পরিণতি রসে। রসের মধ্যে ভাব এবং ভাবের মধ্যে রস অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, অথচ দৃশ্যত দুইটির পৃথক স্বরূপও আছে। এই স্বরূপ তত্ত্বত অভিন্ন হইলেও দৃশ্যত ভিন্ন। তাই আমি পূর্বেই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের কথা তুলিয়া রাখিয়াছি।

এইবার শব্দার্থের কথা। মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন—

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ ॥

তিনি প্রচুররূপে শব্দ ও অর্থসম্পত্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত শব্দ ও অর্থের মত নিত্যসম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট জগতের জনক-জননীস্বরূপ শিব-শিবানীর বন্দনা করিয়াছেন। আমিও তাই শব্দ এবং অর্থকে সাহিত্যের আকৃতি এবং প্রকৃতি বলিয়াছি। রীতি অর্থে রচনার শৈলী। সংস্কৃত সাহিত্যের রচনাশৈলী গৌড়ী, মাগধী প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে রাঢ়ীয় রীতিই সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রতিভাবান্ সাহিত্যিকের রচনাবৈশিষ্ট্যও স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্যে রীতির গৌরব লাভ করে। আর ছন্দ-শাস্ত্র বলেন, 'ছন্দাংসি বৈ বিশ্বরূপাণি', এই বিশ্ব ছন্দে প্রতিষ্ঠিত, ছন্দেই পরিচালিত। সৃষ্টিতে ছন্দ, স্থিতিতে ছন্দ, লয়েরও একটা ছন্দ আছে। সুতরাং যাহার ছন্দ নাই, সে রচনাকে স্বচ্ছন্দ বলিতে পারি না। ছন্দ বিষয়বস্তুর অনুরূপ না হইলে সাহিত্যে অসঙ্গতি-দোষ ঘটে। উপমা প্রভৃতিকে সাহিত্যের অলঙ্কার বলে। এই অলঙ্কারই সাহিত্যের ভূষণ।

সাহিত্য বুঝিলাম, এইবার সাধারণের সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ বুঝিবার চেষ্টা করিব। রসভাবের অনুরূপ যথাযথ শব্দার্থ প্রয়োগে, উপযোগী রীতি এবং ছন্দ সহযোগে কবির যে রচনাসম্ভার, তাহাই যে সাহিত্যপদবাচ্য—এ কথা মানিয়া লইলাম। কিন্তু সে রচনা সাধারণের হৃদয়ে রসোদ্রেক করিবে কিরূপে, তাহাই এইবার দেখিতে হইবে। অনেকের পত্নীবিয়োগ ঘটিয়াছে দেখিয়াছি, অনেকে ইনাইয়া-বিনাইয়া কাঁদিয়াছে শুনিয়াছি, তাহার মধ্যে কেহ কেহ হয়ত দুই চারিটা ভাল কথাও বলিয়াছে, তথাপি তাহা সাহিত্য হয় নাই। কিন্তু যে মুহূর্তে ইন্দুমতী লোকান্তরিতা হইলেন, অজের শোকাভিভূত হৃদয় কালিদাসের লেখনী-মুখে আর্তনাদ করিয়া উঠিল, অমনই সেই শোকগাথা স্থান, কাল ও পাত্রের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া যুগ হইতে যুগান্তরের পথে এক অমূল্য সম্পদরূপে সাহিত্যে স্থায়িত্বলাভ করিল। রামের বা শ্যামের পত্নীশোকে আমার তেমন

দুঃখ হয় না"। আবার নিজ পত্নীবিয়োগে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখই পাইয়াছি, কিন্তু অজবিলাপ পড়িয়া দুঃখের মধ্যে এত আনন্দ আসিল কোথা হইতে? পড়িতে পড়িতে কাঁদিয়াছি, কিন্তু ছাড়িতে তো পারি নাই, বার বার পড়িয়াছি। যতবার পড়িয়াছি, মনে হইয়াছে কে এমন নিপুণ শিল্পী, বিশ্বের হাহাকারকে আকার দিয়াছেন! আমারই প্রাণের কথা, যাহা জন্মজন্মান্তর ধরিয়া বক্ষে গুমরিয়া মরিয়াছে প্রকাশ করিয়া ব্যথার ভার লাঘব করিতে পারি নাই, কে তুমি দরদী বন্ধু, আজ এতদিন পরে সে কথাকে এমন মাধুর্যে মূর্ত করিয়া তুলিলে! এ যে তোমার ক্রন্দনে আমি সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইলাম! অলঙ্কারকৌস্তভ-প্রণেতা ইহারই নাম দিয়াছেন 'কবিবাঙ্‌নির্মিতি'। কেহ কৃষিজীবী, কেহ ব্যবসায়ী, কেহ শিল্পী, কিন্তু রসগ্রাহী হইলে অভিনয়দর্শনে অথবা কাব্যপাঠে স্থানকালপাত্রের কথা বিস্মৃত হইয়া, এমনকি, আপনা ভুলিয়া ক্ষণেকের জন্যও ইহাদের হৃদয়ে যে রসানুভূতি ঘটে, ইঁহারা যে আনন্দের আস্বাদ প্রাপ্ত হন ইহাতেই সাহিত্যের সার্থকতা। বিভাবাদিযোগে রসনিষ্পত্তি যেমন কবিকর্ম, বিভাবাদি যোগে রসাস্বাদনও তেমনই সাধারণের ধর্ম। সাহিত্যদর্পণকার ইহারই নাম দিয়াছেন—

ব্যাপারোঽস্তি বিভাবাদের্নাম্না সাধারণীকৃতিঃ।

কবির সৃষ্টি আমাদিগকে রসাস্বাদনের এমন এক সাধারণ অধিষ্ঠানভূমিতে দাঁড় করাইয়া দেয় যেখানে দাঁড়াইয়া—

পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে॥

বিভাবাদির সাহায্যে রসাস্বাদসময়ে ইহা পরের বা পরের নহে, ইহা আমার বা আমার নহে—এইরূপ কোন পরিচ্ছেদের অস্তিত্বও অনুভূত হয় না। এইজন্যই সাহিত্যদর্পণকার সাহিত্যের রসের সঙ্গে ব্রহ্মাস্বাদের তুলনা করিয়াছেন।

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ড স্ব-প্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ॥

বৈষ্ণবকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রেমের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন—'আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান।' দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ রসকে 'স্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়' বলিয়াও তৃপ্ত হন নাই, বলিয়াছেন—'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর'। আনন্দই ইহার স্বরূপ। যদিও এ আনন্দ ক্ষণিকের, এ আনন্দ চিরস্থায়ী নহে।

সাহিত্যের সাধনা রসভাবের সাধনা। সাহিত্যের প্রাচীন-নবীন ভেদ

কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না। শুনিতে পাই মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্র ইহারই মধ্যে প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছেন। আমি কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌কে প্রাচীন সাহিত্য বলিয়া মনে করিতে পারি না। শ্রীগীতগোবিন্দ আমার চক্ষে চিরনূতন। তবে ইহার আর একটা দিকও আছে। সাহিত্য যুগধর্মের অভিব্যক্তি। যুগের প্রয়োজনে কখনও সাহিত্য জাতিকে গড়িয়া তুলিয়াছে, কখনও জাতি সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে। জাতির সঙ্গে সাহিত্য অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধে আবদ্ধ। অখণ্ড কালের বক্ষে সীমারেখা টানিয়া আমরা যেমন তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে চিহ্নিত করিয়া রাখি, জাতির জীবনস্রোতের বিভিন্ন তরঙ্গভঙ্গকেও তেমনই ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকি। তথাপি ইহারই মধ্যে পারম্পর্যের যে ফল্গুধারা, আমরা যেন তাহার অনুসন্ধানে অবহেলা না করি। কখনও দেখিতে পাই, কালপ্রবাহের চলোর্মিসংঘাতে অবসন্ন মোহমূর্চ্ছিত জাতি সুবিস্তীর্ণ বালুবেলায় অন্ধকার যবনিকা অঙ্গে টানিয়া অসাড় নিস্পন্দের মত পড়িয়া আছে। সাহিত্যে সেই শয়নচিহ্ন আজিও সুপরিস্ফুট। কখনও দেখিতেছি, অসংখ্য বাহুপ্রক্ষেপে মহাকালবক্ষ মথিত বিপর্যস্ত করিয়া জাতি অভিনব উদ্যমে কালপ্রবাহে উজানে চলিয়াছে। সাহিত্যে সেই উদ্দাম আলোড়নের মহোচ্চ-রোল যুগান্তরের পরিধি পার হইয়া আজিও কর্ণে আসিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে। জাতীয় চৈতন্যে সেই অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্রের ক্ষীয়মান গ্রন্থিটি আমাদিগকে সুদৃঢ় করিয়া লইতে হইবে। অতীতের আলোকে বর্তমানের পথ নির্দেশপূর্বক ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সংগঠনে প্রাচীন সাহিত্য আলোচনার যে বিশেষ সার্থকতা রহিয়াছে, এ কথা বোধ হয় বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন হইবে না।

বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করিতে হইলে সর্বপ্রথমে বৌদ্ধগান ও দোঁহার নাম করিতে হয় বটে। কিন্তু আমরা কবিরাজগোস্বামী শ্রীজয়দেবের নামই স্মরণ করিব। সংস্কৃত সাহিত্যের এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী গীতিকবি বীরভূমের অধিবাসী ছিলেন। অজয়ের জলকলধ্বনি সেই অমৃতনিস্যন্দি সঙ্গীতের চিরন্তনী প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে। শ্রীগীতগোবিন্দ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইলেও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার আলোচনা অপরিহার্য। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে দুইটি বিভাগই সর্বপ্রধান—একটি মঙ্গলকাব্য, অপরটি পদাবলী। এই দুইটি বিভাগেই বাঙ্গালী শ্রীজয়দেবের নিকট বিশেষ ঋণে ঋণী। শ্রীগীতগোবিন্দ একাধারে মঙ্গলকাব্য এবং পদাবলী। কবি বলিতেছেন—'শ্রীজয়দেব-কবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলম্ উজ্জ্বলগীতি। আবার বলিয়াছেন—

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্ ॥

পরবর্তী কবিগণ এই মঙ্গলগান ও পদাবলী কথা দুইটি জয়দেবের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন সঙ্গীতাচার্যগণ সঙ্গীতজগতেও জয়দেবের প্রাধান্য একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দ জয়দেবের নিকট হইতে গৃহীত। পরবর্তী বহু কবির অবলম্বিত বিষয়বস্তুতেও শ্রীজয়দেবের প্রভাব সুস্পষ্ট। কেন্দুবিল্বের বিজন কুঞ্জকুটিরে ঝঙ্কৃত হইয়া শ্রীগীতগোবিন্দের গীতলহরী কবি জয়দেবের জীবিতকালেই উড়িষ্যার সমুদ্রসৈকত হইতে রাজপুতানার মরুবক্ষ পর্যন্ত অভিষিক্ত করিয়াছিল। অনতিকালমধ্যেই শ্রীগীতগোবিন্দের বহু টীকা রচিত হইয়াছিল। এবং শ্রীগীতগোবিন্দের অনুকরণে বহু কবি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এক কথায় খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে শতাব্দীকাল কবিরাজগোস্বামী জয়দেবের যুগ নামে অভিহিত হইতে পারে।

কবি জয়দেবের পর দুই শত বৎসরের পথ প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই সময় আমরা কয়েকজন মঙ্গলকাব্য-প্রণেতার সাক্ষাৎ পাই। ধর্মমঙ্গলের আদিকবি ময়ূরভট্টের নাম সাহিত্যে সুপরিচিত। মনসামঙ্গল-প্রণেতা কানা হরিদত্ত এবং চণ্ডীমঙ্গল-প্রণেতা মাণিকরামকে প্রায় সমসাময়িক বলিয়াই মনে হয়। যুগের প্রয়োজনেই এই মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেকালে জাতিগঠনে এই মঙ্গলকাব্যের প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হিন্দুরাজত্বের অবসান ঘটিয়াছে। বিদেশী তুর্কী আসিয়া বাঙ্গালার নানা স্থান অধিকার করিয়াছে। লোহার, খয়রা, ভল্ল, ডোম, বাগ্‌দী, মল্ল প্রভৃতি জাতি, যাহারা সৈন্যবিভাগে কার্য করিত, তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। রাজা নাই, রাজ্যরক্ষার প্রয়োজন নাই, সৈন্য রাখিবে কে? তাহাদের জীবিকার্জনের পন্থায় বিঘ্ন উপস্থিত হইল। সমাজ তাহাদের নূতনতর বৃত্তির উপায় খুঁজিতে লাগিলেন, সুতরাং নূতন করিয়া জাতিগঠনের, পরস্পর ঐক্যবন্ধনের প্রয়োজন অনুভূত হইল। তাহাদিগকে বুঝাইতে হইল, তাহারা দেবানুগৃহীত জাতি, কালুবীর ডোম ধর্মের পরম ভক্ত, লোহাটা বজ্জর জাতিতে লোহার—দেবী ভবানীর প্রিয় সাধক। ইছাই ঘোষ গোয়ালা। ধনপতি ও চাঁদ জাতিতে বণিক। কালকেতু ব্যাধ। ইহাদিগকে বুঝাইতে হইল, স্বয়ং ভগবতী বাগ্‌দিনীর বেশে মাছ ধরিয়াছেন। দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং কৃষিকার্য করিয়াছেন। জীবিকার্জনে বংশানুগত বৃত্তি অবলম্বনে কোন লজ্জা নাই। বুঝাইতে হইল, দৈহিক বল অপেক্ষা নৈতিক বল

কোন অংশে হীন নহে, পার্থিব সম্পদ অপেক্ষা চরিত্রসম্পদের মূল্য অনেক বেশী। মঙ্গলকাব্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। মনুষ্যত্ব দেবত্বেরই রূপান্তররূপে পূজা লাভ করিল। ধর্মরাজ, মনসা, চণ্ডী, মহাদেব প্রভৃতি দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া জাতির ঐক্যবন্ধন সুদৃঢ় হইল, গ্রামদেবতার আশ্রয়প্রাঙ্গণে উচ্চনীচ ভেদ বহুল-পরিমাণে তিরোহিত হইয়া আসিল। মঙ্গলকাব্যগুলি ধর্মমূলক সাহিত্য হইলেও কবিগণ রসভাবের সাধনায় কিয়দংশে সাফল্য লাভ করিলেন।

ধর্মমঙ্গলের দুইটি ধারা। এক ধারায় এক দেবতার ভক্ত অপর দেবতার ভক্তকে বধ করিয়া সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, যেমন ধর্মমঙ্গল। আর এক ধারায় এক দেবতার ভক্ত অন্য দেবতাকর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া, বহু নিগ্রহ সহিয়া, শেষে সেই দেবতার ভক্তরূপে জীবনে সাফল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, যেমন মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল। মঙ্গলকাব্যের এই দুই ধারাকে আয়ত্ত করিয়া পশ্চিম-বঙ্গের লোকগীতি ঝুমুর অবলম্বনে অভিনব কৃষ্ণায়ন বা কৃষ্ণমঙ্গল-হস্তে একদিন বীরভূমে এক মহাকবির অভ্যুদয় ঘটিল। সুদূরশ্রুত বাঁশরীনিঃস্বনের মত এক অশ্রুতপূর্ব সুরতরঙ্গে জাগিয়া বাঙ্গালী বিস্ময়চকিত নেত্রে দেখিল, দুর্দিন অপসারিত হয় নাই। নিকষকালো নিবিড় মেঘে এখনও বাঙ্গালার আকাশ-মৃত্তিকা একাকার হইয়া আছে। কিন্তু নবজাগরণের অরুণোদয়েরও আর বিলম্ব নাই। আর সেই শ্যামল মেঘের মেদুর সমারোহে পক্ষ বিস্তারপূর্বক এক প্রেমকরুণকণ্ঠ পাপিয়া আকাশ-বাতাস প্লাবিত করিয়া গাহিতেছেন—

ও পারে বন্ধুর ঘর বৈসে গুণনিধি।
পাখী হইয়া উড়ি যাও পাখা না দেয় বিধি॥
যমুনাতে দিব ঝাঁপ না জানি সাঁতার।
কলসে কলসে সেঁচো না টুটে পাথার॥
মথুরার নাম শুনি প্রাণ কেমন করে।
সাধ লাগে বড়াই গো কানু দেখিবারে॥
আর কি গোকুলচাঁদ না করিব কোলে।
হাতের পরশমণি হারাইনু হেলে॥
আগুনেতে দেউ ঝাঁপ আগুনি নিভায়।
পাষাণেতে দেউ কোল পাষাণ মিলায়॥
তরুতলে যাই যদি দেহ না দেয় ছায়া।
যার লাগি মুঞি মরো সে হইল নিদয়া॥

কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীর বরে।
ছটফট করে প্রাণ বন্ধু নাহি ঘরে ॥

কোন্ দূর আকাঙ্ক্ষিত পুণ্যলোকে কামনার পরপারে বসতি তোমার, প্রিয় দয়িত আমার! মধ্যে দীর্ঘ পরাধীনতার বিপুল ব্যবধান। পায়ে ক্রীতদাসত্বের শৃঙ্খলভার। কালপ্রবাহের নীরে নামিয়া কলসে কলসে সেচিয়া যে এই অপার অনন্ত বারিরাশি ফুরায় না বন্ধু! তোমার করুণাস্পর্শে আজিকার এই শ্রীহীন বাঙ্গালা একদিন সোনার বাঙ্গালায় পরিণত হইয়াছিল। সত্যই, সে পরশমণি আমরা হেলায় হারাইয়াছি। সম্মুখে সে আদর্শ নাই, হৃদয়ে সে ভালবাসা নাই, চরিত্রে সে দৃঢ়তা নাই, মানুষে মানুষে সৌহৃদ্য নাই। কোন্ পাপে, কাহার অভিশাপে অধঃপতনের এই অন্ধতম কূপে ডুবিতে বসিয়াছি, কে বলিয়া দিবে? আগুনে গিয়া ঝাঁপ দেই, নয়নের জলে আগুন নিভিয়া যায়। অসহ্য দুঃখে বক্ষে পাষাণভার চাপাই, হৃদয়ের তাপে পাষাণ গলিয়া মিলাইয়া যায়। আমার অদৃষ্টে শতশাখ তরুও ছায়াহীন হইয়াছে। তোমার করুণার অমৃতপানে অমর জাতি তাই আজ মৃত্যু কামনা করিতেছে। তুমি নিদয় হইয়াছ বলিয়াই ঘরে পরে আজ গঞ্জনা দেয়, লাঞ্ছনা করে। কিন্তু তোমার অভাবে সত্য সত্যই প্রাণ আমার অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

চণ্ডীদাসের অন্তর্লোকের এই অকপট আকুলতা জাতিকে জাগাইয়া তুলিল। যে ভাবধারা গিরিবক্ষ-বিলম্বিত নির্ঝরিণীর ন্যায়, কোথাও বা সিকতা-তলবাহী ফল্গুধারার মত সমাজের বক্ষে প্রবাহিত হইতেছিল, কবি চণ্ডীদাসের সাধনা ও সঙ্গীতে কলনাদিনী তটিনীর নটনভঙ্গিতে তাহা এক আকুল আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সেই সঞ্জীবন বারি বাঙ্গালীর প্রাণকে অপরূপ রূপে রসে সৌন্দর্যে সুগন্ধে পরিপূর্ণ শতদলে বিকশিত করিয়া তুলিল। অভিনব রসভাবে উজ্জীবিত প্রাণ পঙ্কজের পুঞ্জিত প্রতিরূপ প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু আবির্ভূত হইলেন।

যে ভগবান্ যোগী, জ্ঞানী বা ভক্তগণের যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকেন, চণ্ডীদাসের প্রেমে তিনি তরণী বাহিয়াছেন, দানী সাজিয়াছেন, এমন কি, শেষে দধিদুগ্ধের ভার পর্যন্ত বহন করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণমঙ্গল বা কৃষ্ণায়ন বাঙ্গালা সাহিত্যে নবযুগের সূচনা করিল। মহাকবি কৃত্তিবাস রামমঙ্গল রচনা করিলেন। গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচিত হইল। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, চতুর্ভুজের হরিচরিত প্রভৃতি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কাব্য, সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিল। তাহার পরই নববসন্ত-সমাগমে বাঙ্গালার জলে স্থলে সে কি

সমারোহ, আকাশে বাতাসে সে কি সঙ্গীত, সে কি সুগন্ধ, সে কি আবেগ, সে কি মত্ততা! কেদারকান্তারে সে কি শ্যামলিমা, সে কি শোভা! শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের করুণাকিরণে কত তরুলতা তৃণগুল্ম মঞ্জরিত হইল, কত পুণ্যস্মৃতি ভগবৎপ্রেমিক পিক পাপিয়া মধুর কণ্ঠে মোহন সঙ্গীতের মূর্ছনা তুলিল। কত সাধু, কত মহাজন আবির্ভূত হইলেন। দেশ ধন্য হইয়া গেল।

শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনকথা লইয়া বাঙ্গালী বিশেষরূপ আলোচনা করে নাই। তাঁহার প্রচারিত প্রেমধর্ম মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারে নাই। এক সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁহাকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতেছে। মহাপ্রভুর শ্রীমূর্তিকে ব্যবসায়বিশেষে বিনিয়োগ করিয়াছে। আর এক সম্প্রদায়ের অহম্মন্য ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বৈষ্ণবধর্মকে দুর্বলের ধর্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছে। এই উভয় সম্প্রদায়ই বাঙ্গালার খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ইতিহাসের বিশেষ সংবাদ রাখেন না। কেন রাজা গণেশের সাধনা সফল হইল না, কেন তিনি বাঙ্গালীর রাষ্ট্রীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইলেন, আমরা আজিও সে রহস্যের মর্মোদ্ভেদ করিতে পারি নাই, কিন্তু সেকালের একজন সন্ন্যাসী তাহা বুঝিয়া অন্য পথে জাতিগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বুঝিয়াছিলেন, যুগান্তের সঞ্চিত গ্লানি অপনোদনের জন্য সমগ্র জাতির সমবেতভাবে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হইয়াছে। জাতির আত্মশুদ্ধির জন্য ইহা ভিন্ন অন্য পথ সে দিন ছিল না। তাই এক দিকে তিনি যেমন আচণ্ডালে আলিঙ্গনদানপূর্বক মানুষকে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তেমনই জাতির চিত্তে দৈন্যবোধও জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর আদর্শ যেমন সাধারণের অবশ্য গ্রহণীয়, তেমনই অসাধারণেরও অবশ্য অবলম্বনীয়। চরিত্রশুদ্ধি এবং ভগবন্নাম।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, সাহিত্যের সাধনা রসভাবের সাধনা। বৈষ্ণব কবিগণ বলিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যচন্দ্র এই রসভাবেরই মিলিত মূর্তি। পদাবলী এই রসভাব-সাধনার মহামন্ত্র। সাহিত্যের সাধনা কেমন করিয়া জীবনে মূর্ত করিয়া তুলিতে হয়, আর জীবনের সাধনা কেমন করিয়া সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়া উঠে, মহাপ্রভু তাহার জাজ্বল্যমান উদাহরণ। বহু বৈষ্ণব সাধক এবং কবি তাহার সমুজ্জ্বল নিদর্শন।

মঙ্গলকাব্য ও পদাবলী ভিন্ন প্রাচীন সাহিত্যের আরও দুইটি দিক আছে। আমি শ্যামাসঙ্গীত ও প্রণয়সঙ্গীতের কথা বলিতেছি। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের

শেষের দিকে বাঙ্গালায় আর একজন সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি প্রচলিত কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া তন্ত্রশাস্ত্রকে প্রামাণ্য পবিত্রতায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। উত্তরকালে ইঁহারই উত্তরাধিকারিরূপে আমরা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদকে পাইয়াছি। সঙ্গীত-সাহিত্যে প্রসাদের প্রতিষ্ঠা সর্বজনবিদিত। এই সাহিত্যে তিনি গোষ্ঠীপতির সম্মানে সম্মানিত। সাধক কমলাকান্ত, দেওয়ান রঘুনাথ প্রভৃতি কবিগণ এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। প্রণয়সঙ্গীতে নিধুবাবু এবং শ্রীধর কথক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

নিধুবাবুই বলিয়াছিলেন—'নানান দেশের নানান ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা'। নিধুবাবুর তুলনা নিধুবাবু। রামপ্রসাদকে মঙ্গলকাব্যের এবং নিধুবাবুকে পদাবলীর অলৌকিক এবং লৌকিক সংস্করণ বলিতে পারি। কবির গান এই প্রভাবেই পরিপুষ্ট ; কবির গানে তিনটি শাখা, একটি সখীসংবাদ—অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের লীলাগান। অপরটি ভবানীবিষয়—অর্থাৎ হরগৌরীর লীলাগান, তৃতীয় খেউর। লালুনন্দলাল, রামজীদাস, রঘুনাথ দাস, হরু ঠাকুর, রাম বসু প্রভৃতি কবিওয়ালার বহু গান রসভাবে সমুজ্জ্বল। বাঙ্গালার আগমনী গান এই কবিওয়ালাগণেরই নিজস্ব সৃষ্টি। দাশু রায় এই কবিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। সে সময়ে তাঁহার শক্তির অনুরূপ প্রতিষ্ঠাও ছিল অসাধারণ। দাশুরায়ের রচনা সাহিত্যের সম্পদ।

উপসংহারে আমি মহাকবি ভারতচন্দ্রকে স্মরণ করিতেছি। তিনি মঙ্গলকাব্যের শেষ কবি হইলেও তাঁহাকে মঙ্গলকাব্য, পদাবলী, শ্যামাসঙ্গীত এবং প্রণয়সঙ্গীতের সমন্বয়মূর্তি বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। উজ্জ্বল ভাষায়, নিপুণ ছন্দে, মনোহারী অলঙ্কারে, এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ ঝঙ্কারে তিনি যে সুন্দর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, সাহিত্যের ভাণ্ডারে তাহা বহুমূল্য রত্নরূপে অক্ষয় হইয়া আছে। মঙ্গলকাব্য-প্রণেতৃগণের মধ্যে তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী কবি কেহ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার রচিত—

জয় কৃষ্ণ কেশব রাম রাঘব কংস দানব ঘাতন।
জয় পদ্মলোচন নন্দনন্দন কুঞ্জকানন রঞ্জন ॥

অথবা
জয় শিবেশ শঙ্কর বৃষধ্বজেশ্বর,
মৃগাঙ্কশেখর মহেশ্বর।
জয় শ্মশাননায়ক বিষাণবাদক
হুতাশভালক দিগম্বর ॥

প্রভৃতি কবিতা স্তোত্রের মত শুনায়।

বিদ্যাসুন্দরের মধ্য হইতে একটি গান উদ্ধৃত করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিলাম।

ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশিটি বাজাও হে॥
নবজলধর তনু শিখিপিচ্ছ ইন্দ্রধনু
পীতধরা বিজলীতে ময়ুরে নাচাও হে॥
নয়নচকোর মোর হেরিয়া হয়েছে ভোর
মুখসুধাকর হাসি হাসিয়া বিলাও হে॥
নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা।
আমি যা খেলিতে বলি সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও
ভারত যেমন চাহে সেই মত চাও হে॥

মঙ্গল গান

বাঙ্গালা সাহিত্যে মঙ্গল গান একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বাঙ্গালার জাতীয় জীবনেও ইহার প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে বৌদ্ধ গান ও দোঁহার পরই মঙ্গল গানের উল্লেখ করিতে হয়। কবি জয়দেব স্বরচিত সঙ্গীতপ্রধান কাব্যকে মঙ্গল গান রূপেই পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। আদিরসপ্রধান বলিয়া ইহার অপর নাম উজ্জ্বল গান। শিবের গান বোধ হয় ইহার সমসাময়িক কিংবা জয়দেবের গান অপেক্ষাও পুরাতন এবং ইহার ধারা স্বতন্ত্র। অপর মঙ্গল গানগুলি জয়দেবের পরে রচিত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। আমি বিশ্বাস করি, ময়ূরভট্ট নামে সত্যই একজন বাঙ্গালী কবি ছিলেন। তিনি ধর্মমঙ্গল গানের আদি কবি। মনসামঙ্গলের হরি দত্ত এবং চণ্ডীমঙ্গলের মাণিক দত্ত বড়ুচণ্ডীদাসের অব্যবহিত পরবর্তী অথবা সমসাময়িক।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে মঙ্গল গানের প্রভাব ওতঃপ্রোতভাবে জড়াইয়া

আছে। মঙ্গলগানের প্রভাবেই বাঙ্গালার তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীর অনেকেই এখনও আপনাদিগকে দেবানুগৃহীত জাতি বলিয়া মনে করে। মনে করে কুল-ক্রমাগত বৃত্তি অবলম্বনে কোন লজ্জা নাই, বরং মর্যাদা আছে। শিবের গানের কবি কোন্ পুরাণো কালে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, শিব চাষ করিয়াছিলেন। নিভৃত পল্লী-বাঙ্গালার কৃষিজীবী আজিও সেই কথা স্মরণ করিয়া গৌরব বোধ করে। জগজ্জনের জীবিকার উপায় বিধানের জন্য শিব চাষ করিয়াছেন, সমস্ত উৎপন্নজাত অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে সমর্পণপূর্বক অন্নগ্রহণের জন্য অন্নপূর্ণার দ্বারেই ভিক্ষাপাত্র হস্তে দণ্ডায়মান হইয়াছেন এবং সেই অন্ন লইয়া জগতে বিলাইয়াছেন। ইহার মধ্যে বাঙ্গালার গৃহস্থালীর একটি মহনীয় চিত্রের প্রতিরূপ রহিয়াছে। শিব দেবাদিদেব, কুবের তাঁহারই ধনাধ্যক্ষ, অথচ তিনি সর্বত্যাগী, স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যের গর্বে গৌরবে মহীয়ান। আবার বয়সের তাঁহার গাছ-পাথর নাই। বাঙ্গালার পল্লীদুহিতা আপনা অপেক্ষা অনেক অধিক-বয়স্ক পাত্রের ঘর করিতে গিয়া যেদিন দারিদ্র্যের পীড়নে পীড়িত হয়, আইয়তির লক্ষণ দুই গাছি শঙ্খের জন্য স্বামীর সঙ্গে কলহ করিয়া দুঃখের রজনী জাগিয়া পোহায়, এবং আপনার দুর্ভাগ্য স্মরণপূর্বক চোখের জলে ছিন্ন কন্থা সিক্ত করে, সেদিন হরগৌরী কোন্দলের প্রাচীনগাথার অনুধ্যানেই মনকে সান্ত্বনা দেয়, যে জগজ্জননী মহামায়াও একদিন এইরূপ কষ্টে পড়িয়াছিলেন। ১৩ই বৈশাখ রাঢ়ের ডোম জাতি লাউসেনের সত্যসন্ধ সেনাপতি কালুবীরের পূজা করে, কালুবীরের ও তৎপত্নী লখার কাহিনী স্মরণ করে। বাগ্দীর মেয়েরা মাছ ধরিতে গিয়া আজিও দুর্গার বাগ্দিনীবেশে মহাদেবকে ছলনার গাথা গান করে। মনসামঙ্গলের কৈবর্তসন্তান জেলে জালন দুই ভাই এবং মন্ত্রণাদাত্রী ধোপানী নেতা আজিও বাঙ্গালার পল্লীতে পূজা পাইতেছেন। বহু গ্রামে রজকের কুলদেবী অথবা কৈবর্তের কুলদেবী মনসা একটি নির্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণপাড়ায় আসিয়া ব্রাহ্মণের পূজা গ্রহণ করেন। অনেক স্থানে ধর্মরাজের মূল-দেয়াশী হয়ত কলু শুঁড়ি এমনকি বাগ্দী বা ডোম। এই ধর্মরাজও সারা বৎসর সৎব্রাহ্মণের পূজা গ্রহণ করিয়া বাৎসরিক পূজার কয়দিন গ্রামযাজক ব্রাহ্মণের হস্তে পূজা প্রাপ্ত হন। কারণ সেই পূজায় দেয়াশীই কর্তৃত্ব করেন। শিবের গাজনে ধর্মরাজ-পূজায় বালাভক্ত বা নূতন ভক্তের দল আজিও পূজার কয়দিন তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের সঙ্গেও সম্মিলিতভাবে ব্রতাচরণে কোন কুণ্ঠা বোধ করে না। হিন্দু বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা হয়।

জয়মঙ্গল, হরিশমঙ্গল, মিলন বা মেলাইমঙ্গল—মঙ্গলচণ্ডীর নামই বা কত। পূজা মঙ্গলবারে অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু পূজিতা হন মঙ্গলচণ্ডী। অবশ্য দুদিন পরে এই সমস্ত আর থাকিবে না। কারণ ব্রতকথায় লোকে আস্থা হারাইতেছে। মঙ্গলগায়কের দল প্রায় নির্বংশ হইয়াছে। পণ্ডিতগণ কথকতাবৃত্তি ত্যাগ করিয়াছেন। জাতির বৃত্তিসাঙ্কর্য জীবনে ঘোরতর বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। তথাপি এই সমস্ত কথা স্মরণের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

দুঃখের বিষয় মঙ্গল গান লইয়া যথোপযুক্ত আলোচনা হয় নাই। যে দুই-একজন আলোচনা করিয়াছেন—তাঁহাদের গতি গতানুগতিক পথেই পর্যবসিত হইয়াছে। সেই কবে আচার্য হরপ্রসাদ বাঙ্গালীর ধর্মকর্মে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তাবশেষ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, জড়তার জন্য আজিও আমরা সেই দৃষ্টিভঙ্গিই অনুসরণ করিতেছি। কবে কোন্ বিলাতী পণ্ডিত অনার্য ওরাংগণের মধ্যে চান্দী বা চাণ্ডীদেবীকে আবিষ্কার করিয়া অথবা মহীশূর হইতে মনচাম্মাকে আনিয়া আমাদের চণ্ডী ও মনসার স্কন্ধে বসাইয়া দিয়াছেন, আমরা অন্ধভাবে সেই বোঝাই বহিয়া চলিয়াছি। সম্প্রতি শ্রীমান সুধীভূষণ ভট্টাচার্য তাঁহার সম্পাদিত চণ্ডীগানের ভূমিকায় কিছু নূতন কথা বলিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, প্রথম যুগে (খ্রীঃ ৭ম, ৮ম হইতে ১৩শ, ১৪শ শতক পর্যন্ত) মঙ্গলচণ্ডী ছিলেন সরস্বতী, মহিষমর্দিনী ও গজলক্ষ্মীর মিশ্ররূপ। ইহা প্রাক্-বাঙ্গালা কাব্যের যুগ। এই আদি যুগে আমরা মঙ্গলচণ্ডীকে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মূর্তিতে দেখিতে পাই। মঙ্গলচণ্ডীর দ্বিতীয় যুগ বা মধ্যযুগ হইল বাঙ্গালা চণ্ডীমঙ্গলের যুগ। মাণিক দত্তের কাল হইতে অর্থাৎ আনুমানিক খ্রীঃ ১৪শ ১৫শ শতক হইতে ১৮শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই যুগের বিস্তৃতি। এই যুগেই মঙ্গলচণ্ডীর নব পরিকল্পনা রচিত হয়। মধ্যযুগের শেষে অর্থাৎ ১৮শ শতকের মধ্যভাগ হইতে মঙ্গলচণ্ডীর ক্রমবিকাশে যে পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল, মুকুন্দরামের কাব্যেই তাহার সূত্রপাত হয়। এইরূপ মিশ্র-দেবতা যে প্রকৃতই সৃষ্ট হইয়াছিলেন, রাঢ়ের ধর্মরাজঠাকুর তাহার অন্যতম উদাহরণ। শিব ও নারায়ণের সঙ্গে বৌদ্ধ শূন্যরূপকে মিলাইয়া রামাই পণ্ডিত ধর্মরাজ মূর্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন। মহারাজ ছত্রপতির গুরু রামদাস স্বামী ও বুন্দেলা ছত্রশালের গুরু প্রাণনাথ স্বামীর বহু পূর্বে রামাই পণ্ডিত ধর্মরাজ পূজার মাধ্যমে রাঢ়ের মাল বাগ্‌দী হাড়ি প্রভৃতির সঙ্গে প্রধানত ডোম জাতিকে মিলাইয়া এক অভিনব যোদ্ধ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আমরা সে সংবাদ জানি না। জানিলেও স্মরণ করি না, স্মরণ করিলেও উপযুক্ত মর্যাদা দান করি না।

অষ্টাদশ শতকে মঙ্গলচণ্ডীর অন্নপূর্ণারূপে যে নব পরিণতি হইয়াছিল তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে মধ্যযুগের বাঙ্গালা চণ্ডীসাহিত্যের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া লইতে হয়। এইজন্য সম্পাদক সুধীভূষণ দ্বিজ কমললোচনের 'চণ্ডিকা বিজয়,' ভবানীপ্রসাদ রায়ের 'চণ্ডীমঙ্গল' ও ভবানীশঙ্কর দাসের 'চণ্ডীমঙ্গল' প্রভৃতির দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীমান সুধীভূষণ যে সমস্ত প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা তন্মধ্যে কয়েকটির আলোচনা করিতেছি। শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনার সময় যে মঙ্গলচণ্ডী গানের বহুল প্রচলন ছিল; গ্রন্থমধ্যেই তাহার পরিচয় আছে। স্মার্ত রঘুনন্দন তাঁহার কৃত্যতত্ত্বে মঙ্গলচণ্ডীর পূজাবিধি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন,—'এবং রোগাদি শান্ত্যর্থং মঙ্গলবারমারভ্য মঙ্গলবার-পর্যন্তং গীতাদিভিঃ পরিপূজয়েৎ'। এই অষ্টবাসরীয় গীতের উল্লেখ থাকায় এই মঙ্গলচণ্ডী ও চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীর ঐক্য প্রতিপাদিত হইতেছে। রঘুনন্দনের 'গীতাদিভিঃ' লৌকিক গীতকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিত। রঘুনন্দন খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার পূর্ববর্তী শূলপাণি। ইনি কালিকা পুরাণ হইতে বচন তুলিয়াছেন। কালিকা পুরাণে পুরাণবার্তা—

পটেষু প্রতিমায়াং বা ঘটে মঙ্গলচণ্ডিকাম্।
যঃ পূজয়েৎ ভৌমদিনে শুভৈর্দ্বাঙ্কুরৈঃ শিবাম্॥
সততং সাধকঃ সোঽপি কামমিষ্টমবাপ্নুয়াৎ॥

এই যে দেবীর কথা বলিয়াছেন, এই মঙ্গলচণ্ডী ললিতকান্তা ও তীক্ষ্ণকান্তারূপে পরিচিতা।

কামরূপপতি ভাস্কর বর্মা থানীশ্বররাজ হর্ষবর্ধনের সহায়তায় বাঙ্গালার কর্ণসুবর্ণপতি মহারাজ শশাঙ্ককে পরাজিত করিয়াছিলেন। ভাস্কর বর্মা যে কিছুদিন রাঢ়ে বাস করিয়াছিলেন—কর্ণসুবর্ণ সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে ভূমিদানের তাম্রশাসনে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে ভাস্কর বর্মার সংশ্রবেই যে কালিকাপুরাণ রাঢ়ে প্রচলিত হইয়াছিল, তারাপুর পীঠ (বীরভূম) তাহার অন্যতম উদাহরণ। তারাপুরে পীঠ প্রতিষ্ঠায় যে কিংবদন্তি প্রচলিত আছে, কালিকা পুরাণে তাহার মূল পাওয়া যায়। আসাম প্রদেশই তন্ত্রে মহাচীন নামে অভিহিত হইয়াছে। তারাপীঠের বশিষ্ঠ রঘুকুলগুরু বশিষ্ঠ নহেন, তিনি তন্ত্রে বশিষ্ঠানন্দ নামে পরিচিত। ইনি ভাস্কর বর্মার পরবর্তী তান্ত্রিক সাধক।

'বিশ্বসার তন্ত্র' একখানি প্রসিদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থ। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তন্ত্রসারে

এই তন্ত্র হইতে অনেক কবচ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই তন্ত্রে সরস্বতী কবচ ও মহিষমর্দিনী কবচ ধারণের পূর্বে তিন দিন ধরিয়া আখেটক উপাখ্যান শ্রবণ করিবার নির্দেশ আছে।

আখেটকমুপাখ্যানং তত্র কুর্যাদ্দিনত্রয়ম্।
তদা ধরেন্মহাবিদ্যাং কবচং সর্বকামদম্॥

চণ্ডীমঙ্গলের আখেটক বা ব্যাধের উপাখ্যান সর্বজনপরিচিত। মুকুন্দরাম ব্যাধকে আখেটি বা আখুটি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বৃহন্নীলতন্ত্রে নীল সরস্বতী কোন্ দেশে কি নামে পূজিতা হইয়া থাকেন, তাহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

মঙ্গলা মঙ্গলকোটে রাঢ়ে মঙ্গলচণ্ডিকা।

রাঢ় নাম অন্তত হাজার বৎসর পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল। মঙ্গলকোটের বয়স প্রায় দুই হাজার বৎসর বলিয়া অনুমিত হয়। এই নীল সরস্বতীই একজটা বা উগ্রতারা নামে পরিচিতা। কালিকা পুরাণে এই দেবীরই অপর নাম মঙ্গলচণ্ডিকা। ইনিই বৌদ্ধ তন্ত্রে নীলতারা নামে অভিহিতা। মূর্তিশিল্পের শাস্ত্র হইতেও সুধীভূষণ প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। মণ্ডণ সূত্রধার-রচিত 'রূপমণ্ডণ' গ্রন্থে—'গোধাসনা ভবেদ্ গৌরী লীলয়া হংসবহানা' উল্লেখ আছে। এই গোধা বা গোধিকার সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীর বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

প্রকৃতি পূজা ও আগমনী

বিশ্ব-প্রকৃতির দুই রূপ। এক রূপ—তিনি চিরকিশোরী, সৌন্দর্যময়ী, মহিমময়ী, পরমৈশ্বর্যশালিনী; এই রূপ অন্তরের। বাহিরে তিনি বহুরূপা, যে রূপ নিত্য নব পরিবর্তনে কখনও মনোহরা, কখনও ভয়ঙ্করা। প্রভাতে বালিকা, মধ্যাহ্নে যুবতী, সায়াহ্নে বৃদ্ধা। এ রূপের সৌন্দর্যের সীমা নাই। মহিমার পার নাই, ঐশ্বর্যের অন্ত নাই। 'নিত্যৈব সা জগন্মূর্তি'—তথাপি তাঁহার আবির্ভাব-তিরোভাবের বহুধা শ্রুতি আছে। তিনি কখনও ষোড়শী, কখনও ছিন্নমস্তা, কখনও ধূমাবতী, কখনও কমলা। এই দেবীর বিলাসলাস্যে রাজাপ্রজা বিদ্বান-মূর্খ মোহ যায়; পরক্ষণেই তাঁহার ভীম তাণ্ডবে, চল চরণাঘাতে নিখিল সৃষ্টি লয় পায়। আজ তিনিই আমাদের শরণ্যা ও স্মরণীয়া।

বসন্তের কিশোরী নিদাঘের খরতাপে পঞ্চতপা সাধিয়া রুদ্রের সহিত মিলিতা হইলেন। প্রাবৃটের উচ্ছল আবেগ সে মিলনকে গাঢ়তর করিয়া তুলিল। স্বর্গে মর্ত্যে একাকার হইয়া গেল। ভাদ্রের ভরা যৌবন মাতৃত্বের মহনীয় মাধুর্যে চঞ্চল হইয়া উঠিল। শরতে এই মাতৃরূপের পরিপূর্ণ বিকাশ। নির্মেঘ আকাশের শান্ত পরিবেষ্টনে কাশ-হাস্যে সমুজ্জ্বল নদীতীর, অমল কমলের সুরভি-সৌন্দর্যে ঢল ঢল নির্মল সরসী-নীর, আর তাহারই মাঝখানে প্রান্তরে প্রান্তরে ওষধির আত্মদানের মেলা—সমস্তই মাতৃহৃদয়েরই প্রতিচ্ছবি। তাই শরতে শারদার পূজা। শারদীয়া পূজা মায়েরই পূজা। বসন্তে বাসন্তীর যে পূজা, তাহা ভোগের পূজা, তাই দেখিতে পাই রাবণাদি সে পূজার পূজক। কিন্তু শরতের পূজা ত্যাগের পূজা। আত্মদানের পূজা। নবযুগে নূতন মানুষ—আদর্শ পুরুষ শ্রীরামচন্দ্র ইহার প্রবর্তক।

বাঙ্গালী হিন্দুর উৎসবের সঙ্গে বাঙ্গালার প্রকৃতিগত, একটা স্বভাব-সঞ্জাত সুসমঞ্জস শৃঙ্খলা আছে। কবে কোন্ উৎসব সুরু হইয়াছিল, একটির পর একটি করিয়া কে সেগুলিকে এমন পারম্পর্যে গাঁথিয়াছে, কেহ জানে না। তবে সামঞ্জস্য আছে শৃঙ্খলা আছে ইহা দেখিতে পাই, বুঝিতে পারি। দুর্গোৎসবের কে প্রবর্তন করিয়াছিল, কোন্ স্মরণাতীত কালে বাঙ্গালী এই উৎসবে মাতিয়াছিল, ইহাকে 'পূজা' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, জানি না। কিন্তু এই উৎসবের সঙ্গে বাঙ্গালার ঋতু-পর্যায়ের যে এক অপূর্ব সংযোগ আছে, বাঙ্গালী-মনের ক্রমবিকাশের যে একটা অব্যাহত ধারা আছে, তাহার আভাস-ইঙ্গিতে আশ্চর্যান্বিত হই। বাঙ্গালা কৃষিপ্রধান দেশ, বাঙ্গালী কৃষিজাত সম্পদে নবপত্রিকায় মায়ের বোধন করিয়াছে, মায়ের আগমনীর মন্ত্র রচিয়াছে। বাঙ্গালী যোদ্ধা ছিল, তাই মায়ের দশ হস্তে দশ অস্ত্র দিয়া সে আপনার সাধ মিটাইয়াছে। বাঙ্গালী বীর ছিল, মহিষাসুরমর্দিনীর অর্চনায় তাহারই পরিচয়। বাঙ্গালীর উদার শৌর্য, উন্নত মন, বাঙ্গালীর ঐশ্বর্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি সকলের সমন্বয়ে, এক কথায় তাহার মানবতার, তাহার বাঙ্গালীত্বের চরম উৎকর্ষ ও পরম পরিণতি এই দুর্গোৎসবে। সারা ভারতের তীর্থমৃত্তিকায় তাঁহার অধিষ্ঠান, হিমাচলের উপলখণ্ডে তাঁহার অধিবাস, পুণ্যতোয়া নিখিল নদনদীর ও সাগরের নীরে তাঁহার স্নান-তর্পণ, আর বাঙ্গালীর স্বীয় বাহুবলে সযত্নে আহৃত বিচিত্র উপায়নে তাঁহার পূজা। আজ এই সমস্ত পুরাতনী কথা স্মরণ করিবারই দিন।

বাঙ্গালী বোধনমন্ত্র পড়িত—

ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।

দুষ্টের বধের জন্য শিষ্টকে অনুগ্রহ করিয়া তুমি এস মা। বাঙ্গালী প্রার্থনা করিত—

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।

আমাকে সেই রূপ দাও, যাহার অখণ্ড ঐক্যে জাতি গঠিত হয়। আমাকে সেই রূপ দাও, যে রূপের গৌরবে বিশ্বে আমি বিশ্বেশ্বরীর পুত্র বলিয়া পরিচিত হইতে পারি। আমার জয়ে যেন তোমারই জয় ঘোষিত হয়। আমার যশ যেন তোমারই যশে ওতঃপ্রোত থাকে। আমি যেন বাঙ্গালার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি। আমার কৃতকর্মে যেন বাঙ্গালীর অপযশ না ঘটে। মা তোমার যারা বিরোধী, তারা মানবতার শত্রু। তুমি তাহাদিগকে অপসারিত কর।

বাঙ্গালী স্তোত্র পাঠ করিত—

ওঁ রাজ্যং তস্য প্রতিষ্ঠাচ লক্ষ্মীস্তস্য সদা গেহে।
প্রভুত্বং চৈব সামর্থ্যং যস্য ত্বং শিরসোপরি॥

তুমি যাহার শীর্ষে চরণার্পণ করিয়াছ রাজ্য এবং প্রতিষ্ঠা তাঁহার করায়ত্ত। লক্ষ্মী তাঁহার গৃহে অচলা। প্রভুত্ব এবং প্রভুত্ব রক্ষার সামর্থ্যেরও তাঁহার অসদ্ভাব নাই। বাঙ্গালীর যেদিন প্রাণ ছিল, বাঙ্গালী মৃন্ময়ীর মাঝে চিন্ময়ীকে জাগ্রত করিতে জানিত, সেদিন এই মন্ত্র তাহার পক্ষে অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিল। এই মন্ত্রই তাহাকে সর্ববিধ বিপদে ত্রাণ করিত। বাঙ্গালী ভক্তি গদগদ কণ্ঠে উচ্চারণ করিত—

ওঁ ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং মম।
আগতোঽসি যতো দুর্গে মহেশ্বরি মমালয়ং॥

বাঙ্গালী আর একরূপে মায়ের অর্চনা করিয়াছিল। জগজ্জননীকে সে আপনার মানস-কন্যারূপে কোলে তুলিয়া লইয়াছিল। বাঙ্গালী কবি যেদিন শিবমঙ্গলকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, সেদিন শিবায়নে বাঙ্গালীর এক দরিদ্র দম্পতির কাঠামোর উপরেই তিনি হরগৌরী চরিত্রের আদর্শ গড়িয়াছিলেন। দরিদ্রের সংসার, হয়ত বয়সেরও অসামঞ্জস্য আছে। কিন্তু অনুরাগের অসদ্ভাব নাই। অনটন আছে, অসন্তোষ নাই। সংসারের খুঁটিনাটি দ্বন্দ্ব-কলহের অন্তরালে আপনভোলা স্বামীকে লইয়া পতিপরায়ণার স্বচ্ছন্দ দিনযাপনের চিত্রে কবি উমাকে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন। বাঙ্গালী সে চিত্রে আপন সংসারের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া উমাকে আপনার করিয়া লইল। মঙ্গলকাব্যের পর কবিওয়ালারা আসিল। তাহারাই আগমনী গানের রচয়িতা।

জানি না, কত কাল হইতে বাঙ্গালীর গৃহে কন্যা দুর্ভাবনার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্নেহের কিশোরীকে কোলছাড়া করিয়া বঙ্গ-জননীর উদ্বেগের

অন্ত থাকে না। শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদী, দেবর, স্বামী, সকলেই সেখানে নূতন। কে জানে কাহার কেমন প্রকৃতি, কে জানে কেমন করিয়া মেয়ের দিন কাটে? অপরাহ্ণের পড়ন্ত বেলায় দীঘির ঘাটে জল লইতে আসিয়া অবগুণ্ঠনের অন্তরালে দিক্‌হারা নয়নে অশ্রুবিসর্জন, জননীর অতীত জীবনের কৈশোর-স্মৃতি মনে পড়ে। কোন্ পথে সেই স্নেহের নীড়, কোথায় জনক-জননী, ভ্রাতা-ভগিনী, বাল্যসঙ্গিনী, একে একে সকলেরই কথা মনে হয়। ক্ষণপরেই ধীরে ধীরে মনে জাগে আপনার দ্বিরাগমন দিনের সেই হর্ষ-বিষাদের মধুর ছবি। মনের কোন গোপন কোণে কি এক অজানা আনন্দ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, কিন্তু কাঁদিয়া ভাসাইতেছেন। মা কাঁদিতেছেন, ভাইবোন সব কাঁদিতেছে— সঙ্গিনীদের চোখে জল, জনকের আঁখিও শুষ্ক নাই। এমন সময় ও-পাড়ার ঠানদিদি আসিয়া হাসিতে হাসিতে মাকে বলিলেন—

কেঁদে কেন মর।
আপনি বুঝিয়া দেখ কার ঘর কর।

তাঁহার আপন কন্যার বিদায়ের দিনেও এই কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। সহসা তাঁহার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিল। কন্যার প্রতি জামাইয়ের ভালবাসার কথা মনে হওয়ায় তিনি মুখে হাসি চোখে জল লইয়া গৃহস্থালীর কাজে মন দিলেন। কিন্তু পোড়া মন—শুধু মেয়ের কথাই মনে করে। ক্ষুদ্র গৃহস্থের অতি ক্ষুদ্র গৃহস্থালী, তবু তাহার সবটা জুড়িয়াই মেয়ের স্মৃতি। আঙ্গিনার শেফালি গাছে অজস্র ফুল ফুটিয়াছে, ঝরিয়া-পড়া ফুলের রাশি গাছের তলা আলো করিয়াছে। কিন্তু সে ফুলের বোঁটা কাটিয়া কাপড় রাঙ্গাইবার কেহ নাই! সামনে পূজা—ঘর-দুয়ার ঝাড়িয়া-মুছিয়া নূতন করিয়া লেপিতে হইবে। দেওয়ালে লতা, পাতা, পাখী, পদ্ম, মেয়ের ছোট হাতের কত ছোট ছোট কাজ। মুছিতে কষ্ট হয়; নূতন করিয়া আঁকিবে কে পূজার পীড়ি, পূজার ঘটে, চণ্ডীমণ্ডপের আঙ্গিনায় আলপনা রচিবে কে? এ সমস্ত কাজে সেই তো মায়ের অনন্যসহায় ছিল। তিনি স্বামীর নিকট অনুযোগ করিতে গেলেন— ওগো, দেবী-পক্ষ যে এসে পড়ল, আমার গৌরীকে আর আনতে যাবে কবে? কবিওয়ালাদের রচিত আগমনী গানে মেনকার মুখে ইহারই প্রতিধ্বনি শুনিতেছি।

আগমনীর প্রথম গান কে কবে রচনা করিয়াছিলেন, কেহ বলিতে পারে না। আদি-কবিওয়ালার যে কি নাম ছিল তাহাও কেহ জানে না। কিন্তু পল্লী-কুটিরের দ্বারে আসিয়া ভিখারী যখন গাহে—

গিরি গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে
চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকাল ॥

কি জানি কোন্ অজ্ঞাত বেদনায় প্রাণ আকুল হইয়া ওঠে। আমরা পর পর কয়েকটি আগমনীর গান তুলিয়া দিলাম। ইহা হইতে সেকালের কবিমনের সঙ্গে পল্লী-সংসারের একটি যোগসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের একজন কবিওয়ালা কৈলাসচন্দ্র ঘটকের রচিত একটি গানে আগমনীর আরম্ভ করিতেছি। ইনি বীরভূমের লোক, ইহার জন্ম ১২০৫ সালে, মৃত্যু ১২৮০ সালের কার্তিক মাসে।

গিরি পাষাণ হয়ে কি রবে?
কবে অভয়া আনিতে যাবে?
হারা হ'য়ে তারা-ধনে এ ছার প্রাণে
নাইকো প্রাণ তারা অভাবে ॥
মণিহারা ফণীমত নিরখিয়া আছি পথ
প্রাণ হয়েছে উমাগত, যাও হে দ্রুত
গেলে নয়নতারা পাবে ॥
দ্বিজ কৈলাসচন্দ্র ভণে জীবনশূন্য গৌরী বিনে
আন গিয়ে উমা ধনে নাই কি মনে
দু'দিন বই সপ্তমী হবে ॥

উমা একবার আসিলে হয়। আর তাহাকে কৈলাসে পাঠাইব না। মায়ের মনে এই কথাই তোলাপাড়া করিতেছে। এই গানটি দ্বিজ রামপ্রসাদ নামক একজন কবির রচিত। ইনি বিখ্যাত রামপ্রসাদ সেন নহেন।

গিরি এবার আমার উমা এলে আর তারে পাঠাব না
বলে বলবে লোকে মন্দ কারু কথা শুনব না ॥
যদি আসে মৃত্যুঞ্জয় উমা নেবার কথা কয়
এবার মায়ে-ঝিয়ে করব ঝগড়া
জামাই বলে মানব না ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয় এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফেরে
বলে ঘরের ভাবনা ভাবব না ॥

সম্বৎসরের পর উমা গৃহে আসিতেছেন, তাহারই একটি চিত্র দাশু রায়ের গানে পাওয়া যাইবে। পাড়ার লোক আসিয়া সংবাদ দিতেছে—

গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল
ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী।
লয়ে যুগল শিশু কোলে মা কই মা কই ব'লে
ডাকছে মা তোর শশধর-বদনী॥
মাগো ত্রিভুবনে মান্যে ত্রিভুবনে ধন্যে
তোর মেয়ে সামান্যে নয়গো রাণি।
আমরা ভাবতেম ভবের প্রিয়ে, উমা নাকি তোর মেয়ে
(এখন) সে যে শুনি ভবের ভয়হারিণী।
ধরলি যে রত্ন উদরে তোর মত সংসারে
রত্নগর্ভা এমন নাই রমণী।
মা তোর ঐ তারা চন্দ্রচূড়-দারা
চন্দ্র-দর্পহরা চন্দ্রাননী।
হেন রূপ দেখি নাই কার মনের অন্ধকার
হরে তোমার হর-মনোমোহিনী।

মায়ে ঝিয়ে আলাপের পর মেনকা গিরিরাজকে বলিতেছেন (গানটি বিখ্যাত কবিওয়ালা রাম বসুর রচিত)—

তবে নাকি উমার তত্ত্ব করেছিলে।
গিরিরাজ, ওহে শোন শোন তোমার মেয়ে কি বলে!
নারী প্রবোধিয়ে যেতে হে
কৈলাস যাই বলে।
এসে বলতে মেনকা তোমার দুঃখের কথা
উমা সব শুনেছে।
তোমায় দেখতে পাষাণী আপনি ঈশানী
আসতে চেয়েছে।
তুমি গিয়েছিলে কই উমা বলে ঐ হে
আপনি এসেছি জননী বলে॥

পল্লী-সংসারের একটি নিখুঁত চিত্র। মেয়ের আসা নানা কারণে সম্ভব হয় নাই, মেয়ের পিতা হয়ত বৈবাহিকের নিকট অগ্রসর হইতেই পারেন নাই, অথচ

পত্নীকে প্রবোধ দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। আজ সব কথাই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। পতির প্রতি পত্নীর অনুযোগ, পিতার উপর কন্যার অভিমান, মা ও মেয়ের কত সুখ-দুঃখের কথা—কয়েকটি রেখা-চিত্রে অতি চমৎকার ফুটিয়াছে।

প্রাচীন কবিওয়ালা লালু নন্দলালের একটি গান তুলিয়া দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি—

সারি সারি দ্বিজনারী চামর ঢুলায়,
নানা সুমঙ্গল গায়,
নিরখে মেনকা রাণী সজল নয়ন।
অষ্টমীতে পূজে মায়ের অভয়চরণ,
মনের আনন্দে হিমগিরি করিয়া যতন।
কমলা বিমলায় পূজে মনের আনন্দেতে,
ষড়ানন গজাননে পূজে বিধি মতে,
চৌষট্টি যোগিনীগণে পূজা করে আর
দিয়া নানা উপহার
গঙ্গাজলে বিল্বদলে পূজে ত্রিলোচনা
প্রভাত অরুণ জিনি উমারূপখানি
চরণে নূপুর বাজে কটিতে কিঙ্কিণী
কত কোটি শশী আসি পড়ে রাঙ্গা পায়
অলিমধু লোভে ধায়,
উমারূপে আলো হলো এ তিন ভুবন॥
লালু নন্দলালে বলে কি আনন্দ হেরি,
ত্রিজগতে ঘরে ঘরে পূজিছে শঙ্করী
পাতালে বাসুকী পূজে স্বর্গে দেবগণ
পূজে ও রাঙ্গা চরণ
মর্ত্ত্যোপরি নরলোকে করে আরাধন॥

দুই

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আগমনী গানের আদি রচয়িতা কে, কেহ জানে না। দেবী দুর্গার মর্ত্ত্যে আগমন, এই উপলক্ষ্যেই 'আগমনী' কথাটার উদ্ভব

হইয়াছে। 'আগমনী' বলিলেই দেবীর মর্ত্যে আগমনের গান বুঝায়।

বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে শাক্ত পদাবলী রচিত হয়। মধ্যযুগের সাহিত্যে বৈষ্ণব-পদকর্তাগণের পর কবিওয়ালাগণ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। কবিওয়ালাগণের মধ্যে লালু নন্দলাল, রামজী দাস ও রঘুনাথ দাস বয়সে জ্যেষ্ঠ। নিতাই দাস, ভবানী বেনে, হরু ঠাকুর যথাক্রমে লালু, রামজী ও রঘুর শিষ্য। আমার মনে হয় আগমনী গান কবিওয়ালাগণই প্রথম রচনা করেন। তাহাদের গানের তিনটি বিভাগ ছিল—ভবানী-বিষয়, সখী-সংবাদ ও খেউড়। আগমনী গান ভবানী-বিষয়ের অন্তর্গত। লালু, রামজী ও রঘুর বহু গান লোপ পাইয়াছে। কবিওয়ালাগণ মঙ্গলকাব্য হইতে বহু সাহায্য পাইয়াছিলেন। সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন কবিওয়ালাগণেরই সমসাময়িক। প্রসাদের গান শাক্ত-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

বাঙ্গালা সন ১১২৭ হইতে ২৮ সালের মধ্যে কুমারহট্টে রামপ্রসাদের আবির্ভাব।* ইনি সংস্কৃত, আরবী ও পার্শী ভাষায় শিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু প্রসাদ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন জগজ্জননীর সাধনায়। এই সাধকের দিব্যানুভূতিলব্ধ সঙ্গীত বাঙ্গালা ভাষার সম্পদ।

ইহার প্রায় শত বৎসর পরে সন ১২১২ সালে বাঙ্গালার বিখ্যাত পাঁচালী-ওয়ালা দাশরথি রায় জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচালীগানে দাশু রায় সারা বাঙ্গালায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

কবিওয়ালা রাম বসু ১১৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। নীলু ঠাকুর ইহার সমসাময়িক কবিওয়ালা। নীলুর সহোদর দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণিতায় গান রচনা করিয়াছিলেন। গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় অপর একজন বিখ্যাত কবিওয়ালা। সাধক কমলাকান্তও একজন বিখ্যাত সঙ্গীতরচয়িতা। আমি কবিগণের বয়সের পৌর্বাপর্য বিচার না করিয়া কয়েকটি গান রসপর্যায় অনুসারে সাজাইয়া দিলাম।

সহরে দূরের কথা, আজকাল পল্লীগ্রামেও আগমনী গান শুনিতে পাই না। অথচ এই দশ বৎসর পূর্বেও কচিৎ কাহারও মুখে এ গান শুনিতে পাইতাম। বছর বিশ পূর্বে প্রায় এক মাস আগে হইতেই আগমনী গান শুরু হইত। বৈষ্ণব

* পণ্ডিত দীনেশ ভট্টাচার্য বলেন ১১২৭ সালে রামপ্রসাদের জন্ম, 'নিশ্চিতই তাহার পূর্বে নহে এবং ১১২৮ সনের পরেও নহে।'

ভিক্ষুক, অন্য জাতির ভিক্ষুক সকলেই আগমনী গান গাহিয়া দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা সাধিয়া ফিরিত। আজকাল ভিখারীর সংখ্যা বাড়িয়াছে, কিন্তু গান গাহিয়া ভিক্ষা করিবার পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

দাশু রায়ের বিখ্যাত গান—

॥ খট ভৈরবী ॥ একতালা ॥ মেনকার স্বপ্নদর্শন ॥

গিরি গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে
চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকাল ॥
কহিছে শিখরী কি করি অচল নাহি চলাচল হলাম হে অচল
চপলার মত জীবন চঞ্চল
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো ॥
দেখা দিয়ে কেন হেন মায়া তার মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার
আবার ভাবি গিরি কি দোষ অভয়ার
পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হলো।

সাধক কমলাকান্ত হিমাচলকে অনুরোধ করিতেছেন—

মেনকার উক্তি ॥ ভৈরবী ॥ জলদ তেতলা ॥

কবে যাবে বল গিরিরাজ গৌরীরে আনিতে।
ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে ॥
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে আনন্দে রয়েছ ঘরে
কি আছে তব অন্তরে না পারি বুঝিতে।
কামিনী করিল বিধি তেঁই সে তোমারে সাধি
নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে।
সতিনী সরলা নহে স্বামী যে শ্মশানে রহে
তুমি হে পাষাণ তাহে না কর মনেতে।
কমলাকান্তের বাণী শুনহে শিখর মণি
কেমনে সহিবে এত মায়ের প্রাণেতে ॥

কবিবর শ্রীধর কথক ১২২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এই অসাধারণ কবিত্বসম্পন্ন কথকের রচিত দুই-একটি গান নিধুবাবুর নামে চলিয়া গিয়াছে। শ্রীধর কাব্য ব্যাকরণ অলঙ্কারাদি বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার রচিত বহু সঙ্গীতের মধ্যে আগমনী সঙ্গীতও আছে, একটি তুলিয়া দিলাম—

মেনকার উক্তি ॥ দেশ মল্লার ॥ আড়া ॥
ওহে গিরি গৌরী অভিমান কোরেচে।
নারদেরে দেখে কত কেঁদে'বলেচে ॥
সতিনী আছে তাহার সুরধ্বনী নাম তার
সে নাহি দেখে সংসার পতির মাথায় উঠেছে।
কেমনে চলিবে ঘর ভিখারী হলেন হর
তাই ভেবে ভেবে উমার সোনার বরণ কালী হোয়েচে ॥
গিরি হে চরণে ধরি যাও হে কৈলাসপুরী
যথা সেই ত্রিপুরারি আমার উমারে রেখেছে ॥

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ জয়ার মুখে সংবাদ পাঠাইলেন—

॥ ধানশ্রী ॥

(ওগো রাণি) নগরে কোলাহল ওঠ চল চল
নন্দিনী নিকটে তোমার গো।
(চল) বরণ করিয়া গৃহে আনি গিয়া
এসো না সঙ্গে আমার ॥
জয়া, কি কথা কহিলি আমারে কিনিলি
কি দিলি শুভ সমাচার।
তোরে অদেয় কি আছে আয় দেখি কাছে
প্রাণ দিয়া শোধি ধার গো ॥
রাণী দ্রুতগতি চলে ভাসে প্রেমজলে
খসিল কুন্তলভার।
কাছে দেখে যারে শুধাইছে তারে
গৌরী কত দূরে আর গো ॥
যেতে যেতে পথ উপনীত রথ
নিরখি বদন উমার।
বলে মা এলি মা এলি মাকে ভুলে ছিলি
(উমা) মা বলে একি কথা মার গো ॥
রথ হতে নামিয়া শঙ্করী মায়ে প্রণাম করি
সান্ত্বনা করে বার বার।

দাস এ কবিরঞ্জনে সকরুণে ভণে
(এমন) শুভদিন আর কার গো॥

কবিওয়ালা রাম বসু গিরিরাজকে বলিতেছেন—

ওহে গিরি গা তোলহে মা এলেন হিমালয়।
ওঠ দুর্গা দুর্গা বলে দুর্গা কর কোলে
মুখে বল জয় জয় দুর্গা জয়॥

গদাধর মুখোপাধ্যায় একজন কবিওয়ালা। ইনি আসরে বসিয়াই প্রতিপক্ষের গানের উত্তর রচনা করিতেন। রাম বসুর পরবর্তী ব্যক্তি। ইঁহার একটি গান—

পুরবাসী বলে উমার মা তোর হারা তারা এল ঐ।
শুনে পাগলিনী প্রায় অমনি রাণী ধায় বলে কৈ মা উমা কৈ।
কেঁদে রাণী বলে আমার উমা এলে।
একবার আয় মা একবার আয় মা একবার আয় মা করি কোলে।
অমনি দুবাহু পসারি মায়ের গলা ধরি
অভিমানে কেঁদে রাণীরে বলে
কৈ মেয়ে বলে আনতে গিয়েছিলে?
তোমার পাষাণ প্রাণ আমার পিতাও পাষাণ
জেনে এলেম আপনা হতে
গেলে না তো নিতে রব না মা দুদিন গেলে
পরের ঘরে মেয়ে দিয়ে মা কি পাসরিলে।
কৈলাসেতে বলে আমায় সবাই
তোর কি মা নাই, তোর কি মা নাই
অমনি সরমে মরে যাই।
তাদের বলি আমার পিতে এসেছিলেন নিতে
শিবের দোষ দিয়ে কাঁদি বিরলে।

বাঙ্গালী গৃহস্থঘরের বাস্তবচিত্র। মা তো মেয়ের বাপকে কতবারই বলিয়াছেন। মেয়ের বাপের সঙ্গতিতে কুলায় না; সঙ্গতি হয় তো অবসর মিলে না। ওখানে শশুরবাড়ীর লোকের নানান্ প্রশ্ন; তোর কি মা নাই? মা থাকিলে তো এমন নীরব থাকার কথা নয়? মেয়েকে মিথ্যা কথা বলিয়া বাপের বাড়ীর দোষ ঢাকিতে হয়।

দিন দুই পর মা মেনকা একদিন মনের কথাটা খুলিয়া বলিলেন—

ভৈরবী ॥ একতালা ॥ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র

এসেছিস তো থাক মা উমা দিন কত।
হয়েচিস ডাগর ডোগর কিসের এখন ভয় এত ॥
বলিস যদি আনি মা জামাই
সকালে লোক কৈলাসে পাঠাই
সবাই মিলে করবো যতন জোগাব তার মনমত।
এখন বুঝি ঘর চিনেছিস তাই হয়েচি পর
তখন কেঁদে কেটে ভাসিয়ে দিতিস নিতে এলে হর
সঁপে দিছি পরের হাতে জোরতো আমার নাই তত ॥
... ...
বলিস দুদিন থাকতে হেথায়
কালকে ভোলা নিতে এলে।

শেষে মেনকা মনকে বুঝাইতেছেন—

কালকে এলে বলবো ভোলায়
উমা আমার নাইকো ঘরে।
কনকপ্রতিমা আমার পাঠিয়ে দেব কেমন কোরে ॥

কিন্তু পাঠাইয়া দিতে হয়।

সর্বশেষে আমার রচিত একটি আগমনী গান তুলিয়া দিলাম। 'মহাতীর্থ কালীঘাট', 'রাধাকৃষ্ণ' প্রভৃতি ছবির জন্য কয়েকটি গান লিখিয়া দিয়াছিলাম। এই গানটি সেই সময়ের লেখা।—

গিরি আবার শরৎ এলো গৌরী আমার এলো কই।
ঐ এলো ঐ এলো বলে পথপানে চেয়ে রই ॥
কাশ ফুটেছে নদীর কূলে
ঢেউ তুলে সব উঠ্‌ছে দুলে
উমার আসার আভাস পেয়ে
কারা চামর দুলায় ওই ॥
গিরিপুরের পথ যে তোমার উপল সমাকুল
সারা পথে সে বিছালো শেফালিকা ফুল
মায়ের দুটি চরণকমল চল্‌তে পাছে হয় গো অচল
(তারা) মাণিক ফেলে তাইতো ফুলে পথ সাজালো, চলল সই ॥

কবির গান

'রস-কীর্তনের' স্রোত মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। 'মনোহরসাহী' ও 'গরাণহাটি' সুর জনসাধারণের পক্ষে আয়ত্ত করা শক্ত বলিয়া 'রাণীহাটি' 'ঝাড়খণ্ডি' এবং 'মন্দারিণী' সুরের সৃষ্টি হইয়াছিল, জনগণের কানে তাহাও যেন পুরানো হইয়া গেল। নামকীর্তনের উদাত্ত ধ্বনিতে পল্লীর আকাশ-বাতাস আজি আর তেমন মুখরিত থাকে না। এদিকে চণ্ডীমঙ্গল, শিবায়ন, মনসামঙ্গল, রামায়ণের সুরও বোধ হয় মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া আসিতেছে। জনসাধারণের চিত্ত নূতনের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। এমনকি তাহাদের নিজস্ব সঙ্গীত ঝুমুর গানেও এখন যেন তাহারা তেমন তৃপ্তি পায় না। তাই একটা 'নূতন কিছুর' জন্য তাহাদের প্রাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল। হয়তো তাহারই ফলে 'কবির গানের' উদ্ভব। এ গানের অধিকাংশ কবিই সমাজের নিম্নস্তরে—অতি সাধারণ শ্রেণীর মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই কবিওয়ালাগণ সাধারণের অতি আপনার জন। ইহারা জনসাধারণের কবি।

এই গান কেন 'কবি গান' বা 'কবির গান' নামে পরিচিত হইল, বলিতে পারি না। অনুমিত হয় আসরে দাঁড়াইয়াই মুখে মুখে কিছু কিছু কবিতা রচনাপূর্বক দুই একটা প্রশ্ন এবং উত্তর করিতে হইত, তাই গায়কের নাম 'কবিওয়ালা' এবং এই গানের নাম 'কবি গান' বা 'কবির গান' হইয়াছে। আদি সৃষ্টির সময় হইতেই কবির গানে দুই একটা প্রশ্ন, উত্তর এবং আনুষঙ্গিক অনেক বিষয় যে আসরে দাঁড়াইয়া উপস্থিত রচিত কবিতাতেই বিবৃত করিতে হইত, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। বোধ হয় ইহাই 'কবির গান' নামকরণের কারণ।

পশ্চিমবঙ্গের ঝুমুর গান কতদিনের পুরাতন কেহ বলিতে পারে না। আমাদের মনে হয় ঝুমুরের বয়স এখন হইতে কমবেশী প্রায় হাজার বছরের কাছাকাছি হইবে। ঝুমুর গানের প্রধান লক্ষণ হইতেছে দুই দলে সম্পর্কে পাতাইয়া পরস্পরে পর্যায়ক্রমে গানে উত্তর প্রতি-উত্তর করে। তাহার নাম পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ অর্থাৎ 'চাপান' ও 'উতোর'। গায়ক হিন্দু, শ্রোতাও হিন্দু, অথচ দুইদল কবিওয়ালাই হিন্দুর দেবদেবীকে যথেচ্ছ গালাগালি দেয়। কতকটা ব্যাজস্তুতির মত মনে হইলেও তাহার মধ্যে নিছক গালাগালিও বড় কম থাকে না। শাক্ত, শৈব, সৌর, বৈষ্ণব বিভিন্ন সম্প্রদায় নহে, কোনরূপ বিরুদ্ধ সম্পর্কও নাই, একই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণ ও অর্জুন, কুন্তী ও

মাত্রী প্রভৃতি সম্পর্ক পাতাইয়া তুইদলে বাছিয়া বাছিয়া পরস্পরের তথা দেবতার নিন্দার ও গ্লানির কথাই প্রচার করে। ইহার কারণ সম্বন্ধে ইহাই অনুমিত হয়, যে প্রাচীনকালে রাঢ়দেশে লুইপাদ, নাড়পণ্ডিত প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য-গণের চেলার দল কেবলই অধ্যাত্ম-সঙ্গীত গাহিয়া ফিরিতেন না। সঙ্গে লোক-সংগ্রহ ও সম্প্রদায়-পুষ্টির জন্য তাঁহারা হিন্দুধর্মের নানাবিধ নিন্দাও করিয়া বেড়াইতেন। তাহারই পাল্টা জবাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকার্যের জন্য হিন্দুগণ ঝুমুরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রথম প্রথম হয়তো তুইদলে মুখোমুখি উত্তর প্রতি-উত্তর চলিত। অনেক সময় তাহাতে হাতাহাতির আশঙ্কা থাকায় ক্রমে একটা কল্পিত প্রতিপক্ষের আবশ্যক হয়। একপক্ষ বৌদ্ধ, অপরপক্ষ হিন্দু। উভয় পক্ষই নিজ নিজ জ্ঞানবুদ্ধি ও শিক্ষামত স্ব স্ব বক্তব্য বলিয়া যাইত, জনসাধারণ জয়-পরাজয় নির্ধারণ করিত। ইহার আরও একটি কারণ অনুমান করা চলে। পুরাণে দেবদেবীর নিন্দা প্রশংসা তুই-ই আছে। সুতরাং তাহারই অনুসরণে মানুষ যে স্বভাবতই তুই দলে বিভক্ত হইয়া আপন রুচি অনুসারে দেবতার অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনা করিবে, ইহাও অসম্ভব নহে। যে জন্যই হউক ঝুমুর গানে পক্ষ প্রতিপক্ষের প্রথা প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কবির গানে ঝুমুরের এই ধারাই অনুসৃত হইয়াছিল। কবির গান ঝুমুরেরই গোষ্ঠীভুক্ত। 'বৌদ্ধগান ও দোহার' কয়েকটি গানে সেই সময়কার সঙ্গীতের ধারার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

ঝুমুর গান আদিরস-প্রধান। ঝুমুরের পরে বাঙ্গালা সাহিত্যের দ্বিতীয় স্তরে আমরা 'মঙ্গলকাব্যের' সাক্ষাৎ পাই। ধর্মের গান, চণ্ডীর গান, মনসার গান, শিবের গান প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য। বিরুদ্ধ পক্ষের নিকট স্বীয় ধর্মের মহিমা প্রচার, আপন সম্প্রদায়কে স্বধর্মে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকতে উপদেশ প্রদান, সর্বোপরি দেবতাগণের লোককল্যাণ-লীলার মৌলিকত্ব প্রতিষ্ঠাই মঙ্গলকাব্যের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাই লোকরঞ্জনার্থ প্রণীত হইলেও প্রাচীন মঙ্গলকাব্যে আদিরসের বাহুল্য নাই। ইহার আরও একটি কারণ ছিল। মুসলমান আসিয়া দেশ অধিকার করিল। হিন্দুর রাজা গেল, রাজ্য গেল, সুতরাং দেশের যাহারা বৌদ্ধ-সম্প্রদায়—বাগ্দী, ডোম, হাড়ি, লোহার, থয়রা, তিওর প্রভৃতি জাতির মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দিল। রাজানুগ্রহের প্রলোভন, রাজধর্ম গ্রহণের প্রলোভন সমাজের ভিত্তিমূলে আসিয়া আঘাত করিল। তখন ধর্মের যোগসূত্র ভিন্ন তাহাদিগকে একতাসূত্রে বাঁধিবার আর কোন উপায়

খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তাহাদিগকে বুঝাইতে হইল—তাহারা দেবানুগৃহীত জাতি, তাহাদের জাতীয়বৃত্তির মধ্যে কোন হীনতা নাই। সুতরাং সৈনিকের কাজ না থাকিলেও নিজ নিজ কুলোচিত বৃত্তি অবলম্বনেই তাহারা স্বচ্ছন্দে এবং মর্যাদার সঙ্গে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। বুঝাইতে হইল ধোপার মেয়ে নেতা মনসাদেবীর পরামর্শদাত্রী। কালুবীর ডোম হইয়াও ধর্মের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। 'হিংসক রাঢ়' ব্যাধ কালকেতু চণ্ডীর অনুগৃহীত মানসপুত্র। তাহাদিগকে বুঝাইতে হইল—স্বয়ং মহাদেব সাধারণ কৃষকের মত কৃষিকাজ করিয়াছিলেন। জগতের অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা আপনি বাগ্‌দিনীর বেশে মাছ ধরিয়াছিলেন। জন্মান্তর, কর্মফল এবং দেবতা-বিশ্বাসী একটা জাতির পক্ষে এসব কম ভরসার কথা নহে। ইহাই মঙ্গলকাব্যের মাহাত্ম্য। মঙ্গলকাব্যের পর বৈষ্ণব পদাবলী এবং বিবিধ অনুবাদ-গ্রন্থের পর্যায় পার হইয়া আমরা যাত্রার এবং কবির আসরে আসিয়া উপস্থিত হই। যাত্রা এবং কবির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে; উভয়েই প্রায় সমবয়সী।

যে সময় কবির গানের উদ্ভব হয়, পশ্চিমবঙ্গের সে এক দুর্যোগের দিন। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের একেবারে শেষের দিকে ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চেতুয়া বরদার জমিদার শোভা সিংহ উড়িষ্যার আফগান সর্দার রহিম খাঁর সহযোগিতায় বর্ধমান আক্রমণ করিয়া বসিল। শোভা সিংহের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ এবং রহিম খাঁ প্রায় সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে একাধিপত্য লাভ করে। দুই বৎসরের মধ্যে তাহাদের বার্ষিক আয় ষাট লক্ষ টাকায় এবং সৈন্যসংখ্যা পঞ্চাশ হাজারে দাঁড়াইয়াছিল। ইহাদের অত্যাচার-উৎপীড়নে দেশ একেবারে শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। এই শ্মশানে নবাবী করিতে আসিলেন মুর্শিদকুলী খাঁ। রাজস্ব আদায়ের জন্য তাঁহার অভাবনীয় উপদ্রবের কথা ইতিহাস-বিখ্যাত। একে নবাবী উৎপাত, তাহার উপর নবাব-সৈন্যের সঙ্গে লালা উদয়নারায়ণের যুদ্ধ; পশ্চিমবঙ্গের নরনারী এক দিনের জন্যও নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। অবশেষে দুর্ভাগ্যের ষোলকলা সম্পূর্ণ করিয়া গোদের উপর বিষফোড়ার মত বর্বর বর্গীর দল আসিয়া দেখা দিল। উড়িষ্যার গিরিনদী পার হইয়া পঙ্গপালের মত দলে দলে আসিয়া তাহারা পশ্চিমবঙ্গ ছাইয়া ফেলিল। পাষণ্ড মীরহবিবের নেতৃত্বে এদেশের কতকগুলি নরপিশাচ তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিল। গৃহের সর্বস্ব লুণ্ঠিত, গ্রাম ভস্মীভূত, রমণী ধর্ষিতা, বালক বৃদ্ধ যুবক তরবারী-মুখে আহত নিহত—দেশ ব্যাপিয়া নরকের বিভীষিকা! বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দী যথাসাধ্য যুদ্ধ

করিলেন, কিন্তু কোন প্রতীকার হইল না। অবশেষে প্রচুর অর্থদণ্ড দিয়া—দিল্লীশ্বর-দত্ত সরদেশমুখীর অনুকরণে বাৎসরিক বার লক্ষ মুদ্রা চৌথ দিতে স্বীকৃত হইয়া ক্লান্তদেহ, ভগ্নহৃদয় নবাব যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। বর্গীরা দেশে ফিরিল। ১৬৯৫ খ্রীঃ হইতে ১৭৫১ খ্রীঃ পর্যন্ত অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল-ব্যাপী এই অশান্তির মধ্যে অথবা তাহার অব্যবহিত পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে কবির গানের উদ্ভব হইয়াছিল।

কালাপাহাড় এবং দায়ুদের আমল হইতেই পশ্চিমবঙ্গে মাৎস্যন্যায়ের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। সবলের হাতে দুর্বলকে রক্ষা করিবার কেহ ছিল না। অথচ দিনেকের তরেও কালাপাহাড়ের উত্তরাধিকারীর অভাব ঘটে নাই। যাহার খুশি সেই আসিয়া পশ্চিমবঙ্গে অত্যাচার করিয়াছে, লুঠতরাজ চালাইয়াছে। অত্যাচারী ক্লান্ত হইয়া না পড়িলে অত্যাচারিতেরা অব্যাহতি পায় নাই। এইবার যেন পশ্চিমবঙ্গ দুই-চারি দিনের জন্য স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। অন্ধকার ভূগর্ভ হইতে, কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গল হইতে, জনগতিহীন গহনের শৈবাল-সমাচ্ছন্ন জলাশয় হইতে মুখ বাড়াইয়া মানুষ আপনার দিকে চাহিল, আপনার পৈতৃক ভদ্রাসনের দুরবস্থা দেখিল। অন্ন নাই, অর্থ নাই, সহায় নাই, সামর্থ্য নাই, ভরসা দিবারও কেহ নাই। সকলেরই সমান অবস্থা। লোকে একে একে আসিয়া শ্মশানে বাসা বাঁধিবার চেষ্টা করিল এবং জীবিকার সনাতন অবলম্বন কৃষিকার্যের উপায় খুঁজিতে লাগিল। গৃহদাহে গৃহপালিত পশু ও শস্যের বীজাদিও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অতএব একেবারেই নিরুপায় অবস্থা দাঁড়াইল। পল্লীর নষ্টশ্রী পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যাপকভাবে কোন চেষ্টা হইল না। রাজকোষ কপর্দক-শূন্য, রাজদরবার কোনরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। সুতরাং জলাশয়-খনন, পথ-প্রস্তুত, উদ্যান-রচনা অথবা প্রাসাদাদি নির্মাণ প্রভৃতি কার্যে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইল না। নূতন শিল্পের সৃষ্টি, পুরাতন শিল্পের পুনরুন্নয়ন অথবা কোনরূপ ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপায় নির্ধারণের কেহ পথ দেখাইল না। এক কথায়, গঠনমূলক কার্যের কোন আয়োজনই কেহ করিল না। অত্যাচারপীড়িত, বিভীষিকা-সম্মূঢ় জাতিকে অধঃপতনের অতল পঙ্ক হইতে উদ্ধারের জন্য সেদিন কোন যুগাবতারেরও আবির্ভাব ঘটিল না। যাঁহারা আসিলেন, তাঁহারা মীরহবিব ও রহিম খাঁরই পারলৌকিক সংস্করণ। ফলে যাহা ঘটিবার ঘটিল। ইংরাজের উচ্ছিষ্ট-পুষ্ট মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিলাসী ধনীর অনুকরণে শিক্ষাহীন, দুর্বল, অদৃষ্টনির্ভর পরাধীন জাতি অসার আমোদে, অলস-বিলাসে গা

ঢালিয়া দিল। অসাড় প্রাণ, রুগ্ন মন, বিকৃত শিক্ষা ও কদর্য রুচি লইয়া জনসাধারণ সেদিন যে রস-রূপের আবাহন করিয়াছিল, কবির গান তাহারই বাঙ্‌ময়ী মূর্তি।

কিন্তু হাস্য এবং সঙ্গীত শুধু বসন্ত-বাসরেই বন্দী হইয়া থাকে না। বর্ষাও তাহাতে বঞ্চিতা নহে। প্রচণ্ড ধারাবর্ষণে নদীপ্রান্তর যেদিন একাকার হইয়া যায়, সাগরের জল আসিয়া কন্দরে প্রবেশ করে, আকাশস্পর্শী বনস্পতিও যে দুর্দিনে ভাঙ্গিয়া পড়ে, মালতী-যূথী সেদিনও হাসিমুখে দেখা দিয়া যায়। বিপুল প্লাবন যেদিন আশ্রয়নীড়ও ভাসাইয়া দেয়, ভেক আসিয়া ভুজঙ্গের অঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়ে, মৃগ আসিয়া ব্যাঘ্রের গণ্ড লেহন করে, পর্বতে প্রতিহত বজ্র যেদিন দিকে দিকে বহ্নিজ্বালা ছড়ায়, শৈলে শৈলে তাণ্ডবিনী উন্মত্তা নির্ঝরিণী ছিন্নমস্তার বিভীষিকা জাগায়, সেদিনও চাতক করুণ কণ্ঠে কাহার বন্দনা গায়, প্রমত্ত কলাপী কেকাধ্বনিতে কাহাকে স্বাগত জানায়! যদিও বর্ষার এই লোভনীয় দুর্যোগের সঙ্গে বাঙ্গালীর সে দুর্দিনের তুলনা করা চলে না, তথাপি সেদিনের যাহারা কবি, তাহারা দুঃখের দিনের—দুর্দিনেরই কবি। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, সে দুঃখের ছায়াও কাহারও কবিতাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সেই দুঃখের গরল আকণ্ঠ পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইবার সাধ অথবা সাধনাও কেহ করে নাই। দুঃখ ছিল, কিন্তু দুঃখ-হরণের মন্ত্র কাহারও কণ্ঠে স্ফুরিত হয় নাই। যে দুঃখ মানুষকে আত্মচিন্তা ভুলাইয়া দেয়, দুঃখের পাষাণপ্রাচীর ভাঙ্গিবার জন্য মানুষ আত্মবলি দেয়, যে অপমান মানুষকে উন্মাদ করিয়া তুলে, যাহার প্রতীকারে মানুষ স্বেচ্ছায় সর্বস্ব পণ করে, সে দুঃখ, সে অপমান বাঙ্গালীকে জাগাইতে পারিল না। অবসাদপঙ্কে আকণ্ঠমগ্ন জাতি—হৃদয় অনুভূতিহীন, দেহ স্পর্শবোধশূন্য, অন্ধ তন্দ্রাহতের মত পড়িয়া রহিল। কেহ হাহাকার করিল না, কেহ একবিন্দু চোখের জল ফেলিল না, সকল দুঃখ সকল অপমান এমনভাবে মাথা পাতিয়া সহ্য করিল, যেন ইহাই তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য ছিল। সুতরাং কবিওয়ালাগণকে বিশেষ দোষ দেওয়া চলে না।

দূর জনপদে জমিন্দারের বরকন্দাজের হস্তে প্রহৃত রক্তাক্তদেহ গৃহস্বামী গৃহে ফিরিলে বেদনার গুরুভারে যখন সমস্ত গৃহখানি মূক এবং মৌন হইয়া যায় তখন গৃহস্থিত শিশু যেমন সকলকে নির্বাক দেখিয়া পরিচিত অভ্যস্ত ভঙ্গীতে প্রত্যেকেরই মনোযোগ আকর্ষণ করে, প্রত্যেকেরই কথা শুনিতে হাসিমুখ দেখিতে চেষ্টা করে, কবিওয়ালাগণও ঠিক তেমনই ভাবেই শিশুসুলভ সারল্যে ও চাপল্যে

সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। সকলকে কথা কহাইতে এবং হাসাইতে চাহিয়াছিল।

ঝুমুরের মত কবির গানেও আদিরসের বাহুল্য অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। 'সখী-সংবাদ' এবং 'ভবানী-বিষয়' অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ-লীলা এবং হরগৌরী-লীলা এই আদিরসের আশ্রয় ও অবলম্বনরূপে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু রাধাকৃষ্ণ-লীলার সে অনুপম ভাবমাধুর্য্য ইহাদের কবিতায় পাওয়া যায় না। হরগৌরী-লীলার সে মহনীয় চিত্র ইহারা ধারণা করিতে পারেন নাই। প্রেমের যে আদর্শ মরজগতকে অমরার গৌরব দান করে, সে অমৃতানুভূতির সামর্থ্য ইহাদের ছিল না।

ইহাদের রাধা-চিত্রে অহৈতুকী প্রেমে অতীন্দ্রিয় ভাবসাধনার সে অপূর্বতা নাই। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছার অনাড়ম্বর বিলোপে সর্বস্ব-সমর্পণের সে উন্মাদনা নাই। প্রিয় দয়িতের ব্রজ-বর্জনে গোপাঙ্গনার যে যুগান্তব্যাপী তপস্যা তাহা কবিওয়ালাগণকে বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত করিতে পারে নাই। ইহাদের রাধাকৃষ্ণ সাধারণ মানব-মানবী এবং ইহাদের প্রেম ইন্দ্রিয়তাড়নাসঞ্জাত, লালসাপূর্ণ। অবশ্য তথাপি তাহা কবিত্ব বর্জিত নহে।

মনে রাখিতে হইবে ইহাদের অধিকাংশ গানই প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিবার জন্য রচিত হইয়াছিল। কবি রাধা-বিরহ গান করিয়াছেন, তাহাও হয় প্রশ্ন, নয় উত্তরের জন্য রচিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রতিপক্ষকে জব্দ করিবার একটা ভাব অন্তর্নিহিত আছে। সুতরাং গানের মধ্যেও অপরপক্ষের একটু দোষ দেখাইয়া 'চাপান' দিয়াই গান রচনা করিতে হইয়াছে। সেইজন্য দেখিতে পাই যিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, বরং তাহার গান কতকটা স্বচ্ছন্দ, তাই কবিত্বপূর্ণ হইয়াছে। সাধারণ নায়ক-নায়িকার এবং বিরহের গান সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যায়। তবে ইহা একান্ত সত্য যে, নিতান্ত বস্তুতান্ত্রিক হইলেও সখী-সংবাদের বিরহ অপেক্ষা সেগুলি অনেকাংশে উৎকৃষ্ট।

কিন্তু ভবানী-বিষয়ক গান সম্বন্ধে সেকথা বলিতে পারি না। হরগৌরীর কোন্দল, গৌরীর শাঁখা-পরা প্রভৃতি গানে ইহাদের যে মনোবৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা কোন ব্যক্তির পক্ষেই সুস্থ অবস্থার পরিচায়ক নহে। অবশ্য ইহার জন্য প্রধানত মঙ্গলকাব্য-রচয়িতাগণকেই দায়ী করিতে হয়। তবে সমসাময়িক অবস্থা এবং উদ্দেশ্য লইয়া বিচার করিলে তাঁহাদের সে দায়িত্ব অনেকটা লঘু হইয়া যায়। মঙ্গলকাব্যে দেবলীলার গাম্ভীর্য না থাকিলেও মানবতার একটা নিরাভরণ সৌন্দর্য ছিল। কবির গানে তাহার রূঢ় অসম্পূর্ণতা মনকে পীড়িত

করে। কবির গানের মহাদেব যেমন বৃদ্ধ, পেটুক, অলস, নেশাখোর, হাড়-জ্বালানে হত-দরিদ্র স্বামী, দুর্গাও তেমনই যৌবনগর্বিতা, কলহপরায়ণা, ছল খুঁজিতে মজবুত বদমেজাজের লক্ষ্মীছাড়া স্ত্রী। সুতরাং বলিতে হয় কবির গানে হরপার্বতীর যথেষ্ট দুর্দশা ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইহার আর একটি দিক আছে। সেদিক দিয়া দেখিলে কবিওয়ালাগণকে অভিনন্দিত করিতে হয় যে, ইহারা এই ভবানী-বিষয়ক গানেই একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। আমরা আগমনী গানের কথা বলিতেছি। আগমনী গান কবিওয়ালাগণই প্রথম রচনা করেন।

কবে, কোথায়, কে প্রথম কবির গানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কেহ জানে না। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রাচীন কবিওয়ালাগণের মধ্যে গোঁজলা গুঁই, কেষ্টা মুচি, লালু নন্দলাল, রামজী দাস ও রঘুনাথ দাসের নাম করিয়া গিয়াছেন। গোঁজলার ও কেষ্টার গুরু বা তৎপূর্ববর্তী অপর কোন কবিওয়ালার নাম তিনি বহু অনুসন্ধানেও সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। ইহা হইতে অনুমিত হয় গোঁজলার ও কেষ্টার সময়েই কবির গানের প্রচার ও পুষ্টির শৈশব অতিক্রান্ত হইতেছিল। কবির গান সাধারণত 'দাঁড়াকবি' নামে পরিচিত ছিল। দাঁড়াকবির সুর ভাঙ্গিয়া প্রায় সমসময়েই আখড়াই, হাফ-আখড়াই ও পাঁচালীর সৃষ্টি হয়। আখড়াই ও পাঁচালীতে কোন প্রতিপক্ষ থাকিত না। কিন্তু হাফ-আখড়াই-এ দুই পক্ষ না হইলে গানই চলিত না। কখনও কখনও তিনটি দলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত।

পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থান তখনও অশান্তিপূর্ণ এবং দেশে টাকা দেবার লোকেরও অভাব। সুতরাং অধিকাংশ কবি, যাত্রা, পাঁচালী-ওয়ালা আসিয়া কলিকাতার উপকণ্ঠে ভিড় জমাইলেন। এদিকে কলিকাতা এবং তাহার নিকটবর্তী স্থানের কয়েকজন খ্যাতনামা গায়ক এবং সঙ্গীতরচয়িতা সময়ের প্রভাবে কবির দলে যোগ দিয়া কবির গানকে প্রকৃত রসসাহিত্যের আসরে পাংক্তেয় করিয়া তুলিলেন। শান্তিপুরে আখড়াই গানের সৃষ্টি হইলেও হাফ-আখড়াই গান কলিকাতারই নিজস্ব সৃষ্টি। যে সমস্ত সুকৌশলীর দল রাষ্ট্রবিপ্লবের সুযোগে দেশের ও দশের সর্বনাশ সাধনপূর্বক নানা ছলে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং অর্থ ও জীবন নিরাপদে রাখিবার মানসে কলিকাতায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে সমস্ত সৌখীনের দল অনুগৃহীত বারাঙ্গনার বানর বা বিড়ালের বিবাহে লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া ধনবত্তার আড়ম্বর প্রকাশে উল্লসিত হইতেন, কবির গান প্রভৃতি যদিও প্রধানত তাঁহাদেরই বিলাসব্যসনের অন্যতম উপকরণ বা দিনগত পাপক্ষয়ের

উপাদান ছিল, তথাপি কলিকাতায় কবি, যাত্রা, পাঁচালী, হাফ-আখড়াই-এর আশ্রয়দানে উৎসুক প্রকৃত রসগ্রাহী ধনী সন্তানের অভাব ছিল না। কবির গান প্রভৃতিকে অশ্লীলতার পঙ্ক হইতে উদ্ধারে ইহারা কম সাহায্য করেন নাই। কবিগণের সঙ্গে ইঁহাদের নামও বাঙ্গলা সাহিত্যে অমর হইয়া আছে।

বাঙ্গালার মাটির এবং জল-বাতাসের আর যাই দোষ থাকুক, তাহার একটা মহৎ গুণ আছে—রসগ্রাহিতা এবং ভাবুকতা। তাই দেখিতে পাই—কোনরূপ উচ্চশিক্ষা না পাইয়াও, হীন প্রতিবেশের মধ্যে বাস করিয়াও—বরাতি গান গাহিতে গিয়াও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী কবি আপনার স্বভাবসিদ্ধ কবিত্বে ও কল্পনায় প্রকৃত সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। দেশে উচ্চ চিন্তা নাই, উচ্চ আদর্শ নাই, তবু রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, দাশু রায়, রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, নীলকণ্ঠ, মতি রায়ের অভাব ঘটিল না।

বহুদিন পূর্বে বাঙ্গালায় এমনই রাষ্ট্র-বিপ্লবের দিনে একজন বিপ্লবী বাঙ্গালীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। হিন্দুর মন্ত্রণা-চালিত রাষ্ট্রবীর হুশেন শাহ্ রাষ্ট্রবিপ্লবের গতিরোধ করিলেন। কিন্তু রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তের সমান্তরালে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য রক্ষাপূর্বক যে মহান্ পুরুষ বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনকে এক অভিনব আন্দোলনে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন, আশ্চর্যের বিষয় তাঁহার মহনীয় চরিত্রের অমৃত-মাধুর্য জাতির জীবনেও যেমন, সাহিত্যেও তেমনই সমান প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাই যেমন দেখিতে পাই লক্ষপতির একমাত্র আদরের দুলাল গৃহ ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়াছেন, দেশের শ্রেষ্ঠ রাজবল্লভ পদমর্যাদার মোহ কাটাইয়া কন্থা-করঙ্গ সম্বল করিয়াছেন, কূটতার্কিক প্রকাণ্ড নৈয়ায়িক বিশ্বাসী ভক্তে রূপান্তরিত হইয়াছেন, তেমনই দেখিতে পাই কবিশেখর জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাসের পদাবলী এবং কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতির গ্রন্থ এক দিব্য মানবতার বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে। প্রাসাদে-পর্ণকুটীরে, ব্রাহ্মণে-চণ্ডালে, পণ্ডিতে-মূর্খে যুগান্তরের ব্যবধান অন্তর্হিত হইয়াছে। সেদিনের কথা আজ কাহিনী মাত্র, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। কিন্তু বন্যা বিলুপ্ত হইলেও তাহার ফল্গুধারা একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। স্থানে স্থানে তাহারই স্বতঃস্ফূর্ত উৎস—যাত্রা, কবি, পাঁচালীতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। তাই সেই দুর্দিনেও আমরা সাহিত্যের স্বাদে বঞ্চিত হই নাই।

মঙ্গলকাব্যের কবি মঙ্গলকাব্যে মানুষ ও দেবতার কথা কহিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস দেবরূপী মানবের কথা গাহিলেন। চণ্ডীদাসে যাহা ভাব ও রস,

শ্রীমহাপ্রভুতে তাহা মূর্ত হইয়া উঠিল। সেই প্রেম ও করুণার বিগ্রহকে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, কিংবা দেখা-লোকের মুখে তাঁহার কথা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা দেবতা, মানুষ ও দেবরূপী মানুষ; কাহাকেও বাদ দিতে পারিলেন না। তাঁহাদের অমিয় গানে কাব্যেও যেমন, বাস্তবেও তেমনই দেবতা-মানুষে একাকার হইয়া গেল। তারপর আবার দুর্দিন ঘনাইয়া আসিল। আদর্শ নাই, আদর্শের বিগ্রহ নাই। সাধারণে আবার দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি লইয়া মাতিল। সেই কথা বলিবার জন্য, ব্যক্তিজীবনের অতি স্থূল কথা, নিতান্তই এক ভগ্নাংশের কথা বলিবার জন্যই তখন যাত্রাওয়ালা, কবিওয়ালা, পাঁচালীকার প্রভৃতির অভ্যুদয় ঘটিল। ইহারা একেবারেই ঘরের কথা, একান্তই মানুষের কথা বলিয়াছেন। বৈচিত্র্যহীন, গতানুগতিক দেহের ক্ষুধার কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু তাহারই মাঝখানে ইহাদের অবচেতনের অন্তঃস্তলে অবস্থিত দূর-অতীতের স্মৃতি, নিজেদের প্রায় অজ্ঞাতসারেই ইহাদিগকে মাঝে মাঝে এক কল্পলোকের স্বপ্নে বিভোর করিয়া তুলিয়াছে। সে স্বপ্ন ক্ষণিকের হইলেও সাহিত্যে তাহার স্থায়ী আলোকচিত্র রহিয়া গিয়াছে।

ব্যক্তিই ছিল ইহাদের উপজীব্য। ক্বচিৎ কখনও সমাজের কথাও ইহাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হইত। কিন্তু তাহার ফলে পল্লীগ্রামে এক সম্প্রদায় গায়কের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, যাহারা বৎসরান্তে সারা গ্রামের 'সালতামামি' গাহিত। এই জাতীয় গানের নাম ছিল ঘেঁটু। বীরভূম, বর্ধমানের দূর পল্লীতে আজিও এ গানের লুপ্তাবশেষ খুঁজিলে মিলিতে পারে। কৃপণ গৃহস্বামী, প্রচুর অর্থ আছে, কিন্তু তথাপি কোন সৎকার্যে অর্থ ব্যয় করিবেন না। এমনকি নিজের প্রয়োজনে গৃহপ্রাঙ্গণে একটা কূপ খননেও তাঁহার আপত্তির অন্ত নাই, অবশেষে একদিন অকস্মাৎ দেশে দুর্ভিক্ষের সুযোগে গৃহিণীর জেদে নিতান্ত অনিচ্ছায় তিনি একটা কূপ খনন করাইলেন। ঘেঁটু সম্প্রদায় গাহিল—

ঘেঁটু তাই ভাবি মনে।
রাজীবপুরে জলের কষ্ট যায় না গো কেনে।
গিন্নী বলেন আর তো আমি জল খাব না পুকুরে।
কুলীতে তপ্ত বালী চল্‌তে নারি দুপুরে (গ্রামের পথে)॥
কর্ত্তা বলেন, লখুরে,
যেখানে সস্তা পাবি আন্‌গা ডেকে মজুরে॥
পচা চাল' ঘরে ছিল, সেগুলার গতি হ'লো,

মিষ্টি জল উঠলো তবু এটেল মাটির গহনে ॥
ঘেঁটু গো তাই ভাবি মনে ॥

এই গানের বাকী অংশ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অনেক সময় গানের মধ্যে সত্যকার মানুষের নামধাম সমস্তই অবিকল রাখা হইত। এমনই কত বিষয়ের কত গান, কত ছড়া, সমস্তই লুপ্ত হইয়া গেল। আখড়াই, হাফ-আখড়াই এবং পাঁচালী মৃত। যাত্রা, কবি এবং ঝুমুর মৃতপ্রায়। মঙ্গল গান, রামায়ণ এবং কীর্তন কোনও রকমে বাঁচিয়া আছে। কিন্তু আর কতদিন?

নিধুবাবু ও আখড়াই, হাফ-আখড়াই

খ্যাতনামা নাট্যকার, সুদক্ষ অভিনেতা এবং অভিজ্ঞ অভিনয়-শিক্ষক অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তখনকার দিনে কলিকাতায় গিয়া আমি তাঁহারই বাসায় উঠিতাম।

একসময় অপরেশচন্দ্র 'প্রভাকরে' কিছুদিন কাজ করিয়াছিলেন অ্যামেচার রূপে। প্রুফ দেখা, কিছু কিছু লেখা ইত্যাদি। গুপ্তকবির ভ্রাতুষ্পুত্র মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত তাঁহার অভিনয়-দীক্ষার গুরু, অর্থাৎ তিনিই অপরেশচন্দ্রকে থিয়েটারে লইয়া যান। সেই সুবাদে স্টার থিয়েটারে হঠাৎ একদিন দেখা দিলেন গুপ্তকবির ভাইয়ের পৌত্র, মণীন্দ্রকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র কি পুত্র, স্মরণ করিতে পারিতেছি না; নাম সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত। ইনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নারায়ণ পত্রিকায় একটি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। সুরেশ সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় খুব বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছিলেন উপন্যাসটি অশ্লীল বলিয়া। ইনি ভাল কবিতা লিখিতেন, নাটক লিখিতেন, অভিনয় করিতেন, ছবি আঁকিতেন। মাথায় লম্বা বাবরি চুল ছিল, মুখে সুন্দর দাড়ি ছিল।

একবার মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কিছু বলিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্র দত্ত এক দীর্ঘ কবিতা লিখিয়া প্রবীণ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায়কে প্রচুর ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিলেন। কবিতার দুটি ছত্র এইরূপ—

কারো বা হয় বিশ পঁচিশে কারো বছর চল্লিশে।
তারো অধিক কাটলো বয়স আর বোধোদয় হয় কিসে।

গগনেন্দ্রঠাকুর যাদবেশ্বরকে লইয়া প্রবাসীর পাতায় ছবি আঁকিলেন ক্যারিকেচার করিয়া, বস্তুতান্ত্রিক কাব্যরসিক। সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ ভারতবর্ষ মাসিকপত্রে তাহার পাল্টা ছবি আঁকিলেন, 'ভাবতান্ত্রিক কাব্যরসিক'। অবিকল রবীন্দ্রনাথের চেহারা, সামনে একটা বোতল ও গ্লাস, কবির ধ্যানস্তিমিত নেত্র। যতদূর স্মরণ হয়, ইনি রবীন্দ্রনাথের শ্যামা কবিতার নাট্যরূপ দিয়াছিলেন এবং নিজে অভিনয় করিয়াছিলেন। আমার সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হইয়া গেল। শুনিলাম, তাঁহার নিকট পুরানো প্রভাকরের ফাইল আছে। বাসার ঠিকানা দিতে চাহেন না। কয়দিন সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, সে স্থলটার নাম স্মরণ নাই, তবে বেশ গলির মধ্যে। আমি প্রভাকর হইতে নিধুবাবুর জীবনী, কয়েকজন কবিওয়ালার জীবনী প্রভৃতি নকল করিয়া আনিয়াছিলাম, নকল-করা কাগজগুলি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। বর্তমানে নিধুবাবুর জীবনী ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়া দিলাম। স্থানে স্থানে হয়তো প্রভাকরের ভাষা সংক্ষেপ করিয়া লইয়াছিলাম।*

'সংবাদ প্রভাকর ১২৬১ সাল, ১লা শ্রাবণ। ১১৪৮ সালে ত্রিবেণীর নিকট চাঁপ্তা গ্রামে রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) জনকের মাতুল রামজয় কবিরাজের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হরিনারায়ণ কবিরাজ। বর্গীর হাঙ্গামায় কুমারটুলি ত্যাগ করিয়া হরিনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ দুই ভাই চাঁপ্তায় যান। পরে ১১৫৪ সালে কুমারটুলির স্বীয় বাসভবনে বাস করেন। রামনিধির ছোট দুই বোন ছিল। প্রথমাকে বিবাহ করেন পাথুরিয়াঘাটার শিবচন্দ্র কবিরাজ। কাঁচড়াপাড়া নিবাসী দাতারাম কবিরাজ দ্বিতীয়ার স্বামী। 'বাঙ্গালীর গান' সম্পাদকের মতে পুত্রের ইংরাজী শিক্ষার সুবিধার জন্যই হরিনারায়ণ কুমারটুলিতে ফিরিয়া আসেন। ১১৬৮ সালে নিধুবাবু সুখচরে প্রথম বিবাহ করেন। ১১৭৫ সালে এক পুত্র হয়। তাহার পর নিজপল্লীস্থ দেওয়ান রামতনু পালিতের সঙ্গে চিরণ ছাপড়ায় চাকরি করিতে যান। জনাইয়ের বিখ্যাত জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় সে সময় ছাপড়ায় কালেক্টার মণ্টগোমারী সাহেবের কেরানী ছিলেন। কিছুদিন পর রামতনুবাবু বায়ুরোগে অসুস্থ হইয়া পড়িলে জগন্মোহন নিধুবাবুর সাহায্যে দেওয়ান নিযুক্ত হইলে তিনি নিধুবাবুকে নিজের কেরানীগিরিতে নিযুক্ত করেন।

* কিছুকাল পূর্বে শ্রীমান ভবতোষ দত্ত 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-রচিত কবিজীবনী' (১৯৫৮) গ্রন্থে নিধুবাবু এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্র ও অন্যান্য কবিওয়ালাদের জীবনীর সটীক সংকলন প্রকাশ করিয়াছেন।

ছাপড়াতেই তিনি এক মুসলমান ওস্তাদের নিকট গান শেখেন। ইহার কিছুদিন পরে নিধুবাবু ছাপড়া জেলার রতনপুরা গ্রামের ভিখন্‌রাম স্বামীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেকালের জ্ঞানানন্দ স্বামীর মত ইনিও খ্যাতনামা সাধু ছিলেন। ভিখন্‌রাম দক্ষিণাচারী সাধু। ছাপড়ার কর্মচারীরা এই সময় ঘুষ লইতে আরম্ভ করেন, দেওয়ানও তাহাতে সাহায্য করিতেন এই সন্দেহ হওয়ায় বিরক্ত হইয়া নিধুবাবু কলিকাতায় চলিয়া আসেন। আসিবার সময় তাঁহার প্রাপ্য হইয়াছিল দশ হাজার টাকা। বোধ হয় ছাপড়াতেই তাঁহার পত্নী ও পুত্রের মৃত্যু হয়। তিনি মনের দুঃখে গান রচনা করেন—

মনোপুর হতে আমার হারায়েছে মন।
কাহারে কহিব কার দোষ দিব নিলে কোন্ জন॥
না বোলে কেমনে রব বোলে বল কি করিব
তোমা বিনে আর সেখানে কাহার গমনাগমন॥
অন্যের অগমনীয় জান সেস্থান নিশ্চয়
ইথে অনুমান এই হয় প্রাণ তুমি সে কারণ॥
যদি তাহে থাকে ফল লয়েছ করেছ ভাল
নাহি চাহি আমি যদি প্রাণ তুমি করহ যতন॥

১১৯৭ সালে নিধুবাবু জোড়াসাঁকোতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই পত্নীর মৃত্যু হইলে ১২০১ সাল কি ১২০২ সালে বজিরহাটি চণ্ডীতলার হরিনারায়ণ সেনের তৃতীয়া কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই সময় তাঁহার বয়স চুয়ান্ন কি পঞ্চান্ন বৎসর হইয়াছিল। এই বিবাহের ফলে তিনি তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যা লাভ করেন। প্রথম পুত্রের নাম লেখা নাই। দ্বিতীয় পুত্র জয়চন্দ্র গুপ্ত, তৃতীয় পুত্র সুখময় গুপ্ত। ভাগিনেয় গুরুচরণ ও গুরুদাস কবিরাজ কৃতবিদ্য ছিলেন। নিধুবাবুর কণ্ঠ ছিল সুমধুর। নিজের রচিত গানে তিনি নিজেই সুর সংযোগ করিতেন, তাল নির্ণয় করিতেন এবং নিজেই গাহিতেন।

শোভাবাজারের বটতলা-নিবাসী রামচন্দ্র মিত্র আমেরিকান কাপ্তেনের মুৎসুদ্দি ছিলেন। তাঁহার বাটির উত্তরাংশের আটচালায় অনেক শৌখিন লোক আসিতেন, নিধুবাবু তাঁহাদিগকে গান শুনাইতেন। বড় বড় লোক কলিকাতায় আসিয়া উক্ত আটচালায় কিংবা নিধুবাবুর বাড়িতে তাঁহার গান শুনিতেন। তিনি বড় একটা কোথাও যাইতেন না। কেহ কেহ বলিতেন, বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র গোপনে নিধুবাবুর গান শুনিয়া গিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদ

কুষ্ণঘাটার মহারাজ মহানন্দ কলিকাতায় আসিয়া প্রায় নিধুবাবুর সঙ্গীতামোদ উপভোগ করিতেন। তাঁহার এক বাইজী ছিল, নাম শ্রীমতী। সে নিধুবাবুকে খুবই ভালবাসিত ও স্নেহ করিত। নিধুবাবু প্রায় প্রতি রজনীতে তাহার বাড়িতে গিয়া গান শুনাইয়া আসিতেন। অনেক টপ্পা সেখানেই রচিত হইয়াছিল।

নিধুবাবুর টপ্পা সঙ্গীত-জগতে এক অভিনব সৃষ্টি। বাঙ্গালায় টপ্পা সঙ্গীত ছিল না। নিধুবাবুই প্রথম সোরি মিয়ার অনুসরণে টপ্পা রচনা করেন। সে রচনা মৌলিক সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। যদিও অনেক গানেই মিলের বিশেষ পারিপাট্য নাই, অর্থাৎ মন ও প্রাণ মিলাইতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। তথাপি তাঁহার বহু টপ্পা ভাবে এবং ভাষায় সাহিত্যের মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছে। নিধুবাবু প্রকৃতই একজন কবি ছিলেন। পরবর্তী শ্রীধর কথক ভিন্ন আর কেহ টপ্পা রচনায় নিধুবাবুর আসনের সমীপবর্তী হইতে পারেন নাই। নিধুবাবু আখড়াই গানেরও উন্নতিসাধন করেন। আখড়াই গানের পূর্ণাঙ্গ সংস্কারক, সর্বতোভাবে উন্নতিবিধায়ক মহারাজা নবকৃষ্ণের প্রিয় গায়ক কুলুইচন্দ্র সেন নিধুবাবুর সম্পর্কে মাতুল ছিলেন। তিনি নিধুবাবুর নিকট বিশেষ সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাজা রাজবল্লভের সভাগায়ক কালোয়াৎ আবুবয়স খাঁ নিধুবাবুর গান ও সুর শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'এক ব্যক্তির দ্বারা এইরূপ ব্যাপার নিতান্তই দৈবশক্তির কাজ।' সন ১২৪৫ সালের ২১শে চৈত্র, ৯৭ বৎসর বয়সে নিধুবাবু পুত্র পৌত্র দৌহিত্রাদি রাখিয়া লোকান্তরিত হন। নিধুবাবুর তিনটি গান তুলিয়া দিলাম—

খাম্বাজ ॥ মধ্যমান ॥

তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে।
আকাশের পূর্ণশশী সেও কাঁদে কলঙ্ক ছলে ॥
সৌরভে গরবে কে তব তুলনা ভবে
আপনি আপন সম্ভবে যেন গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে ॥

টোড়ি ॥ জলদ তেতালা ॥

ধীরে ধীরে যায় দেখ চায় ফিরে ফিরে।
কেমনে আমারে বল যাইতে সরে।
যে ছিল অন্তরে মোর বাহে দেখি তারে
নয়ন অন্তর হলে পুন চায় অন্তরে ॥

মুলতান ॥ আড়া ঠেকা

নয়ননীরে কি নিভে মনের অনল,
সাগরে প্রবেশি যদি না হয় শীতল ॥
তৃষায় চাতকী মরে অন্য বারি নাহি হেরে
ধারাজল বিনে তার সকলই বিফল ॥
যবে তারে হেরি সখি হরিষে বরিষে আঁখি
সেই নীরে নিভে সখি অনল প্রবল ॥

আখড়াই

নদে শান্তিপুর হতে খেড়ু আনাইব।
নূতন নূতন তানে খেড়ু শুনাইব ॥

—ভারতচন্দ্র, বিদ্যার বারমাস্যা

কবির গান হইতেই আখড়াই এবং হাফ-আখড়াই গানের সৃষ্টি হয়। পূজনীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বলিয়াছেন (সংবাদ প্রভাকর, ১লা ভাদ্র, ১২৬১ সাল)—

'সর্বাগ্রে শান্তিপুরস্থ ভদ্রমহোদয়েরা আখড়াই গানের সৃষ্টি করেন। ইহা প্রায় দেড়শত বৎসরের ন্যূন নহে। কিন্তু তাঁহারা ভবানী-বিষয় গাহিতেন না, কেবল খেউড় ও প্রভাতী গাহিতেন। সেই সকল গীতে ননদী ও দেওড়া এই শব্দ উল্লেখ থাকিত, এবং রচকেরা অতিশয় অশ্রাব্য কদর্য বাক্যে গীত-সমুদয় রচনা করিতেন। তৎকালে তাহাতেই অত্যন্ত আমোদ হইত। তচ্ছ্রবণে শান্তিপুরের স্ত্রী-পুরুষ মাত্রেই অশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। এই মহাশয়দের সময়ে যন্ত্রের বিশেষ বাহুল্য এবং সুরের তাদৃশ পারিপাট্য ছিল না। সামান্য টপ্পার ন্যায় সুরে গান করিয়া তাহাকেই আখড়াই নামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন।

এই দৃষ্টান্তে চুঁচুড়া ও কলিকাতার সঙ্গীতপ্রিয় লোক সকলে সুর ও বাজনার শৃঙ্খলা করিয়া আখড়াই গানে মাতিলেন। ইঁহারা প্রথমে ভবানী-বিষয় পরে খেউড় ও প্রভাতী গাহিতেন। ইতর শব্দ ত্যাগ করিয়া গান রচনা করিতে লাগিলেন। চুঁচুড়ার দলকে বাইসেরা বলিত। বড়বাজারের কাশীনাথ মিত্রের ফুলবাগানে আখড়াই হইত, অন্যত্র হইত না। আড়া তাল ভিন্ন অন্য তাল ব্যবহৃত হইত না।

পেশাদার দলের মধ্যে বৈষ্ণব দাস নামক এক ব্যক্তি অতিশয় গুণী ছিলেন। তিনি আড়া তাল হইতে দৌড়, সবদৌড়, দোলন, পিড়েবন্দী ও মোড় এইসব বাজনার সৃষ্টি করেন। ইহার পর রামজয় সেন নামক বৈদ্য বৈষ্ণব দাসের পদ্ধতির উন্নতিসাধন করেন। রসিকচাঁদ গোস্বামী ইঁহারই নিকট বাজনা শিক্ষা করেন।

এই সময় জোড়াসাঁকোর ন্যাটা বলাই নামক একজন সুবর্ণবণিক আখড়াই বাদ্যে নিপুণ ছিলেন। নবু আঢ্য, রাজু আঢ্য এবং রূপচাঁদ ইঁহার ছাত্র। দুর্গাপ্রসাদ বসু জোড়াসাঁকোর আখড়াই দলে গীত ও সুর রচনা করিতেন। ন্যাটা বলাই এই দলে ঢোল বাজাইতেন। হোগলকুড়ের পার্বতীচরণ বসু বেহালা বাজাইতেন। ইঁহারা রাধানাথ সরকারের তুল্য প্রতিযোগী ছিলেন।

কুলুইচন্দ্র সেন যে নূতন সুর সৃষ্টি করেন, নিধুবাবু তাহা হইতে আরও অনেক উন্নতি করেন। অদ্বিতীয় বাদ্যকর গোলাম আব্বাস আখড়াই বাজনার প্রশংসা করিতেন।' ভবানী-বিষয়, খেউড় ও প্রভাতীর উদাহরণ—

ভবানী-বিষয়

ত্বমেকা ভুবনেশ্বরী সদাশিব শুভকরী
নিরানন্দে আনন্দদায়িনী।
নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা অজ্ঞান বোধে সাকারা
তত্ত্বজ্ঞানে চৈতন্যরূপিণী॥
প্রণতে প্রসন্না ভব ভীমতর ভবার্ণব
ভয়ে ভীত ভবামি ভবানী।
কৃপাবলোকন করি তরিবারে ভববারি
পদতরী দেহি গো তারিণী॥

খেউড়

সাধের পীরিতে সুখে দুখ পাছে হয়।
তুমি হে চঞ্চল অতি সদা এই ভয়॥
গোপনে যতেক সুখ প্রকাশে তত অসুখ।
ননদী দেখলে পরে প্রণয় কি রয়॥

প্রভাতী

যামিনী কামিনীবশ হয় কি কখন।
হলে কি ও বিধুমুখ হেরি হে মলিন॥

নলিনী হাসিবে কেন কুমুদী বিরহানন।
এ সুখে অসুখ তবে করে কি অরুণ ॥

নারায়ণ মিত্র মহাশয় এই সময় পক্ষীর দলে করেন। পক্ষীর দলের পক্ষীরা সকলেই ভদ্রসন্তান ছিলেন। গাঁজার গুণানুসারে পক্ষীর নামকরণ হইত। একজন লোক একশত ছিলিম গাঁজা খাইয়া শেষ ছিলিমে কাশিয়াছিলেন, তাই তাঁর নাম হয় ছাতার। অনেক কান্নাকাটির পর তাঁহাকে স্বর্ণছাতার বলা হয়। ইঁহারা নিধুবাবুকে কর্তা বলিয়া অত্যন্ত মান্য করিতেন।

পক্ষীদলের পাখীদের বুলি—

ভিষিন্ কিটি কিটি কিস্ কিসিন্।
ঠুকু ঠুকু ঠুকু ঠুক ঠুকুন্ ॥
কিচি মিচি কিচি কিচিন্ কিন্।
কু কু রামশালিকে কু কু গঙ্গাবিসং ॥
ছোট বিলের পাখী মোরা বড় বিলের কে।
উড়িতে না পারি পাখী পোষ মেনেছে ॥
কু কু গাংশালিকে কু কু গঙ্গাবিসং ॥

১২১০ সালের পূর্বে মহারাজ নবকৃষ্ণের সময় আখড়াই গানের অত্যন্ত আদর ছিল। কুলুইচন্দ্র সেন (বৈদ্য), মহারাজের একজন প্রিয় গায়ক, আখড়াই গানে পারদর্শী ছিলেন। এই সময় চুঁচুড়ায় ও কলিকাতায় যে কয়জন আখড়াই গায়ক ছিলেন, তন্মধ্যে ইনিই প্রধান। ইনি অনেক নূতন সুর রাগ-রাগিণী ও বাজনার সৃষ্টি করেন। ইনি সম্বন্ধে নিধুবাবুর মাতুল। আখড়াই গানে কুলুইচন্দ্রের ধারাই চল্‌তি ছিল। ১২১০ সালে মহারাজ নবকৃষ্ণের আখড়াই গানে ঝোঁক হয়। শ্রীদাম দাস, রামঠাকুর, ননীরাম সেঁকড়া সেই সময়ে প্রসিদ্ধ আখড়াই গায়ক।

১২১১ সালে নিধুবাবুর উদ্যোগে কলিকাতায় দুইটি শখের আখড়াই দল হয়। এক পক্ষে বাগবাজার ও শোভাবাজারের ভদ্র-সন্তানগণ, অপর পক্ষে মনসাতলা অথবা পাথুরেঘাটার নীলমণি মল্লিক ও তাঁর বন্ধুবর্গ। আখড়াই যুদ্ধের স্থিরতার নাম 'বদী,' ও পক্ষ-প্রতিপক্ষের নাম 'বাদী'। উক্ত উভয় দল বদী হইলে নিধুবাবু বাগবাজারের পক্ষে এবং শ্রীদাম দাস প্রভৃতি মল্লিক-দলের পক্ষে গান ও সুর তৈয়ীর জন্য যোগ দিলেন। সে গানে খুব আনন্দ হইয়াছিল।

পাথুরেঘাটার ঠাকুর বাবুরা, জোড়াসাঁকোর সিং বাবুরা, গরাণহাটার কৃষ্ণমোহন বসাক, শোভাবাজারের কালীশঙ্কর ঘোষের পুত্রগণ, শ্যামপুকুরের দিগম্বর মিত্র ও হলধর ঘোষ, সকলেই এক একটা দল করিলেন। ইঁহাদের সকলের সঙ্গেই বাগবাজারের দলের যুদ্ধ হইয়াছিল। নিধুবাবুর জন্য বাগবাজারই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জয়লাভ করেন।

বাগবাজারের মোহনচাঁদ বসু যখন বালক, তখন এই দলে 'জীল' দিতেন। পরে প্রধান গায়কের পদ প্রাপ্ত হন। নিধুবাবু তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; কারণ ইঁহার কণ্ঠ মধুর ছিল, এবং তিনি অত্যন্ত সুগায়ক ছিলেন। মোহনচাঁদ সুপুরুষ ছিলেন। শেষ জীবনে দেহ ভাঙ্গিয়া যায়। লোকে মোহনচাঁদকে নিধুবাবুর খাস ভাণ্ডার বলিত।

হাফ-আখড়াই

মোহনচাঁদের পূর্বে জোড়াসাঁকোর রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় ও পাথুরেঘাটার রামলোচন বসাক হাফ-আখড়াই করেন। কিন্তু তাঁহারা দাঁড়া-কবির সুরে বসিয়া বসিয়া গাহিতেন। মোহনচাঁদ আখড়াই ভাঙ্গিয়া হাফ-আখড়াইয়ের নূতন সুরের সৃষ্টি করেন। বড়বাজারের রামসেবক মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে এক শীতকালের শনিবারের রাত্রে বোধহয় মোহনচাঁদ প্রথম হাফ-আখড়াই গান করেন। সেদিন জোড়াসাঁকো ও পাথুরেঘাটার বাবুরা পরাজিত হন।

আখড়াই গানে উত্তর-প্রত্যুত্তর নাই। সুর ও গান ভাল হইলেই জয় হইত। উভয় পক্ষেই তিনটি করিয়া গীত গাহিতেন। প্রথমে ভবানী-বিষয়, পরে খেউড়, শেষে প্রভাতী। দুই দলেই যুদ্ধ হইত। কোন কোন বার তিন দলেও হইত। ভবানী-বিষয়ের মহড়ায় ছাব্বিশটি অক্ষরের একটি ত্রিপদী, চিতেনেও ঐরূপ একটি ত্রিপদী, এবং পাড়ঙ্গে দুইটি ত্রিপদী। ইহাতেই কেবল সুর ও রাগ-রাগিণীর পাণ্ডিত্য এবং বাদ্যের পরিপাট্য দেখাইতে হইত। সঙ্গতের বাদ্য পিড়েবন্দী, দোলন, দৌড়, সবদৌড় এবং গান-সমাপনের যে বাদ্য তাহার নাম মোড়। কি মহড়া, কি চিতেন, কি পাড়ঙ্গ, সকল গাহনার বাদ্যই প্রায় একরূপ, কিঞ্চিৎ প্রভেদ মাত্র।

প্রথমে মহড়া গাহিয়া গায়কেরা একবার বিশ্রাম করেন। ঐ সময়ে সাজ বাজিয়া থাকে। সেই সাজ সাঙ্গ হইলে গায়কেরা আবার চিতেন ধরেন।

চিতেন সাঙ্গ হইলে আবার সাজ বাজে। তৎপরে পাড়ঙ্গ গাহিয়া গান সমাপন করেন। ঠাকুরাণী-বিষয়ে গাহনার নিয়ম ও সঙ্গত যেরূপ, খেউড় ও প্রভাতীর নিয়ম অবিকল সেইরূপ। আখড়াই, খেউড় ও প্রভাতী গীতে কি মহড়া, কি চিতেন, কি পাড়ঙ্গ অর্থাৎ অন্তরা—ইহার প্রত্যেকটিতেই চতুর্দশটি অক্ষর অর্থাৎ একটি করিয়া পয়ার। আখড়াই তিন গানের তিনখানি ভিন্ন ভিন্ন সাজ।

আখড়াই বাজনার প্রধান যন্ত্র তানপুরা, বেহালা, মন্দিরা, ঢোল, মোচঙ্গ, খরতাল, সিটি ইত্যাদি। ইহার সঙ্গে সপ্তস্বরা, জলতরঙ্গ, বীণা, বেণু, সেতার যোগ করা চলে। কোন কোন দলে কুড়ি-একুশখানা যন্ত্র বাজানো হইত।

রাজা গোপীমোহন ঠাকুরের বাড়িতে আখড়াই গান বহুবার হইয়াছে। এই গান দশ-বারোজন গায়ক একত্র এক বৎসর সুর ও তাহার মিল অভ্যাস করিয়া, গলার মিল সাধিয়া, প্রথমে গোপনে দুই-এক আসর গাহিয়া যখন দেখিতেন কোনরূপ অনৈক্য বা দোষ নাই, তখন প্রকাশ্যে সঙ্গীতযুদ্ধে নামিতেন। কাজেই এ গানে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিত না।

আখড়াই সাজের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ঢোল, তার নিচেই বেহালা। বাগবাজারের রসিকচাঁদ গোস্বামী ঢোলে ও উক্ত পল্লীর রাধানাথ সরকার বেহালায় নিপুণ ছিলেন। গরাণহাটার কৃষ্ণমোহন বসাক অনেকবার দল করিয়াছিলেন। গোবিন্দ মালা তাহার দলে সুর করিত। গোবিন্দ এ বিষয়ে অত্যন্ত নিপুণ ছিল। এই ব্যক্তি রাজা রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসভায় ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিত। মাধবচন্দ্র ঘোষ সেতার-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি গোবিন্দ মালার সঙ্গে শোভাবাজারের দলের পক্ষে সুর প্রস্তুত করিয়া দিতেন। কাঁচড়াপাড়া-নিবাসী বৈদ্যবংশীয় রামচাঁদ রায় একবার শ্যামপুকুরের দলে সুর প্রস্তুত করিয়া দেন। তিনি এ বিষয়ে পটু ছিলেন। ১২৬০ সালে শ্যামপুকুরের বাবুরা দল করিবার চেষ্টা করেন, ১২৬১ সালের প্রথম চেষ্টায়ই বিরত হন।

আখড়াই-এর সৃষ্টিকর্তা-কে কেহ জানে না। ভোলা ময়রা একটা লহর গানে একবার বলিয়াছিলেন—'আখড়াই-এর সৃষ্টি কল্লে কুলুইচন্দ্র সেন'

—সংবাদ প্রভাকর, ১লা শ্রাবণ, ১২৬১ সাল

হাফ-আখড়াই, দাঁড়া শখের কবি ও পেশাদারী কবিতার গাহনা-প্রণালী একপ্রকার, কিছুমাত্রই প্রভেদ নাই। প্রথমে চিতেন, পরে মহড়া, সর্বশেষে

অন্তরা গাহিতে হয়। কিন্তু লিখনকালে অগ্রে মহড়া পরে চিতেন, শেষে অন্তরা লিখিতে হইবে। পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা অবিদিত আছেন, তাঁহারদিগের বিদিতার্থে লিখিতেছি যে পাঠকালীন প্রথমে চিতেন পরে মহড়া তৎপরে অন্তরা পাঠ করিবেন এবং সুর করিয়া গাহিতে হইলেও উক্ত নিয়ম অবলম্বন করিবেন।

কবির দলের কবিতা-সকল পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী ইত্যাদি কেবল গ্রন্থের ছন্দে বর্ধিত নহে। শুদ্ধ সুরের উপরই নির্ভর করে। সুরানুযায়ী শব্দ বসিয়া থাকে, ইহাতে কথার ন্যূনাধিক্য হইলে কোনরূপ দোষ হইতে পারে না।

—সংবাদ প্রভাকর, ১লা কার্তিক, ১২৬১ সাল

হাফ-আখড়াই যুদ্ধের উদাহরণ

(১২৬১ সালে) জোড়াসাঁকোর নবকুমার মল্লিকের বাড়ীতে কার্তিক পূজার রাত্রিতে হাফ-আখড়াই হয়। একপক্ষে বাগবাজার, অপরপক্ষে জোড়াসাঁকো।

বাগবাজারের সখী-সংবাদের প্রথম গীত—

মহড়া : কৃষ্ণ কৃষ্ণময় হলো ব্রজ সকলে।

কৃষ্ণরূপ ভেবে কৃষ্ণরূপ এ-কি রূপ অপরূপ
হয়ে যতনে কৃষ্ণপক্ষ দিবসে কৃষ্ণপক্ষ
কৃষ্ণ হে রাধায় কৃষ্ণ করিলে।
এ সময় কোথা রহিলে ॥
জিনি কমলিনী ব্রজের কমলিনী।
আহা শ্রীমতী কিশোরীর হইল কি শরীর
তারে করিলে কালী কুরূপিণী ॥
রাধা যেন রাধা নয়।
শ্রীরাধার সে আকার নাহি আর চেনা ভার
আহা তার হাহাকার প্রাণে নাহি সয় ॥
শ্রীমুখ-কমল ভাসে কমলে ॥

চিতেন : কে সব কে শব দেখ শ্যাম শ্যাম হে
বিরহে তোমার।
সুখ বৃন্দাবন শ্মশান সম কৃষ্ণ হে
সবাকার শবাকার ॥

যেন শব সবে সবে সবে সবে।
ভাবে ভাবিয়ে পরিণাম করিছে হরিনাম
দহে শুধু প্রাণ কৃষ্ণ রবে রবে।
তোমা বিনে গোকুলে
প্রতিকূল অনুকূল শোকাকুল উভয় কূল
গোপকুল গোপীকুল ভাসে অকুল।
হা কৃষ্ণ বলে কাঁদে কুটিলে ॥

জোড়াসাঁকোর দলের উত্তর—
মহড়া : ওগো রঙ্গময়ী শ্রীমতী তোমার ভাব দেখে হতেছে বিস্ময়।
বাজায় শ্যাম গুণধাম তোমার নাম বাঁশীতে—
তুমি মন দিলে শ্যামের ঠাঁই শ্যামের মন নিলে রাই
তার সনে তোমার বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ নয় ॥
চিতেন : শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে খেদে কেন শোকাকুল।
গোপকুল আর গোপীকুল মিছে ভাবিয়ে আকুল ॥
আমরা জানি শ্যামের মন কৃষ্ণ ছাড়া নহে এই শ্রীবৃন্দাবন।
হলে কি জন্যে এত উচাটন ॥
শ্যাম অঙ্গ আর রাই অঙ্গ আমরা জানি এক অঙ্গ
সে প্রেম হবে ভঙ্গ মনে নাহি লাগে—
মিছে ভাব অনুরাগে প্রেমডোরে বাঁধা কৃষ্ণ রসময় ॥
অন্তরা : আমরা সঙ্গিনী তোমার।
তোমার সকল জানি কেন ভুলাও গো আর ॥
তুমি গোলকেশ্বরী মূলাধার ॥
রাধাকৃষ্ণ দুটি নাম নামের অগ্রে তোমার নাম,
এত মান দিয়েছেন শ্যাম তোমায় ভালবেসে,
সেভাবে অভাব ঘটিবে কিসে,
এভাবে বিচ্ছেদ কে করে প্রত্যয় ॥
বাগবাজারের পাল্টা গীত—
মহড়া : কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম করে আমরা ত্যজি প্রাণ।
এ সময় দীন দয়াময় ধর রূপ মনোময়

ভবের ভরসা তুমি হরি তব রূপধ্যানে মরি
প্রাণান্তে পদপ্রান্তে দিও স্থান ॥
দেখা দাও করুণানিধান।
দুঃখে প্রাণে মরি নাহি ভাবি হায়—
এই ভাবনা অন্তরে কলঙ্ক সাগরে
পাছে ডুবে হে হরি হরি নামের তরী
রাধাশ্যাম যুগল নাই।
রাধাশ্যাম যুগল নাম মোক্ষধাম তাহে বাম
এখন শ্যামরূপি নাম কুবুজা কানাই।
দুই বাঁকায় কর সখা পরিত্রাণ ॥

চিতেন : জীবনে জীবন ত্যজি শ্যাম শ্যাম হে
কৃষ্ণ প্রণয়ে।
ওহে নিদয় শ্যাম সদয় হয়ে গোপীকার
উদয় হও হে হৃদয়ে ॥
কোথা প্রাণ হরি আমাদের প্রাণহরি ॥
বাঁকা ত্রিভঙ্গভঙ্গিঠাম জন্মের শোধ হেরি শ্যাম
ভবজলধি তরি দেহ পদতরী ॥
প্রাণের আশা নাহি আর—
সবিশেষ সদা দ্বেষ কৃপালেশ কর শেষ
হৃষীকেশ ব্রজের বেশ দেখাও একবার ॥
কর আজ মরণকালে চরণ দান ॥

জোড়াসাঁকো দলের উত্তর—

মহড়া : তোমার বিচ্ছেদজ্বালা রবে না খেদে খেদে ত্যাজ না
ত্যাজ না পরাণ !
ব্রজধাম সুখধাম নিত্যধাম জানে না—
তোমরা অবলা কুলবালা হইও না উতলা
সময়ে শ্রীচরণে পাবে স্থান।

চিতেন : জীবন ত্যজ না খেদে মলে কি হবে,
দুদিন পরে প্রাণেশ্বর ব্রজে প্রাণ জুড়াবে।

যাবে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা।
মিছে আকুল হয়ে দুকুল হারাও না—
পাবে ব্রজের ধন ব্রজে ভেবো না ॥
ধড়া চূড়া পীতাম্বর পরে বাঁকা বংশীধর
নয়নেতে নটবর দেখিবে নিশ্চিন্তে
যাবে যাবে সব বিচ্ছেদ চিন্তে
ব্রজেতে হবে শীতল তাপিত প্রাণ ॥

—সংবাদ প্রভাকর, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১২৬১ সাল

দাশু রায়

দাশরথি রায়—দাশু রায় জনসাধারণের কবি এবং একটা যুগের চিহ্নিত কবি। যুগের প্রয়োজনেই তাঁহার আবির্ভাব। ১২১২ সালে জন্ম; ১২৪২ সালে পাঁচালীর দল গঠন, ১২৬৩ সালে তিরোধান। দুই বৎসর দল গড়িতে এবং সুনাম কিনিতে কাটিয়া যায়। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর ধরিয়া তিনি সারা বাঙ্গালাকে মাতাইয়া রাখিয়াছিলেন। ১২৪৬ সালে দাশু রায় নবদ্বীপে গান করিতে আসেন। নবদ্বীপের গৌরবসূর্য তখন প্রায় অপরাহ্ণের দিকে হেলিয়াছে। কিন্তু তখনও তাঁর অলোকের মাধুর্য যত, প্রাখর্যও তত। স্বনামধন্য শ্রীরাম শিরোমণি এবং মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত নবদ্বীপের গৌরব রক্ষা করিতেছিলেন। দাশু রায়ের গান শুনিয়া অপরাপর অধ্যাপকমণ্ডলীসহ শ্রীরাম শিরোমণি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। রায় মহাশয়কে প্রতিশ্রুতি দিতে হইল, প্রতি বৎসর ৺রাসযাত্রার সময় তিনি নবদ্বীপে গান করিতে আসিবেন।

ভাটপাড়ার হলধর তর্কচূড়ামণি, যদুরাম সার্বভৌম, ত্রিবেণীর রামদাস তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি বৃহস্পতিকল্প পণ্ডিতমণ্ডলীও দাশুর গুণমুগ্ধ ছিলেন। এদিকে পল্লীবাসী নিরক্ষর কৃষক, মধ্যবিত্ত গৃহী, অর্থশালী জমিদার—সেই সঙ্গে ইংরাজি-শিক্ষিত দুই-চারিজনও দাশুর নামে যেন মাতিয়া উঠিতেন। সাধারণে ভালবাসিত দাশুর প্রতিটি পালার অন্তর্নিহিত ভক্তিরসকে। আর সেই সঙ্গে সমসাময়িক সমাজের নানা ঘটনার সংযোগে রচিত তিরস্কার-শ্লেষ-ব্যঙ্গ-রঙ্গকে।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থ তখনও সমাজ মানিত, ধর্ম মানিত; সুতরাং দাশুর ভক্তিরসাশ্রিত উপাখ্যান ও সেই সঙ্গে কালোচিত নরনারী-চরিত্রের উপর টীকা-টিপ্পনী তাহাদের মনোরঞ্জন করিত। জমিদারগণ সেকালে বারো মাসে তের পার্বণের অনুষ্ঠান করিতেন। যাত্রা, কবি, পাঁচালী, কীর্তন, কথকতা সেই অনুষ্ঠানেরই অঙ্গ ছিল। দাশরথিকে না ডাকিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইত। পণ্ডিতগণ আনন্দিত হইতেন দাশুর শব্দের ছটায়, অনুপ্রাসের ঘটায়, অলঙ্কারের ঝঙ্কারে। রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং পুরাণাদির কাহিনী দাশু রায় সকলের সম্মুখে নূতন করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। সমাজের অসঙ্গতির উপর কটাক্ষ, সেকালের পাত্র-পাত্রী-বিশেষে একালের নরনারী-চরিত্রের আরোপ এবং কালোপযোগী মন্তব্য সকলের রুচিকর হইত।

বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তনীয়ার মুখে শুনিয়া প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায়। পদাবলী পড়িয়াও কম আনন্দ পাওয়া যায় না। কৃত্তিবাস কাশীদাস পড়িয়া সমান আনন্দ। কিন্তু পাঁচালীর পালা শুনিয়া যে আনন্দ পাওয়া যায়, পড়িয়া তাহার এক-দশমাংশও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। দাশু রায় নিজের রচিত ছড়া যখন যথাযথ ভাবের সঙ্গে আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে আবৃত্তি করিতেন, লোকে মুগ্ধ হইয়া শুনিত। ছোট ভাই তিনকড়ির কণ্ঠ মধুর ছিল। বিশুদ্ধ সুরে উপযুক্ত তালমানের সঙ্গে তিনি দাশুর রচিত গানগুলি গাহিতেন। সঙ্গত করিবারও যোগ্য লোক ছিল দলে। সুতরাং দাশুর জীবৎকালে তাঁহার পাঁচালীর যে সমাদর ছিল, তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। আজকালকার দিনে পাঁচালীর সাহিত্যিক মূল্যও খুব বেশি আছে বলিয়া মনে হয় না। বাঁচিয়া আছে দাশুর কতকগুলি গান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই গানগুলি লইয়া বিস্তৃত সমালোচনা কেহ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ব্যতিক্রম ডক্টর শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী। চক্রবর্তীর 'দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালী' একখানি অতি সুন্দর সংকলন। বহুপরিশ্রমে তিনি দাশরথির নানা দিক লইয়া সার্থক আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু পুস্তকখানি বহুল প্রচারিত হয় নাই। এবং তাহাতে গান-বিষয়ক আলোচনায় কিছু ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে। আমি সংক্ষেপে সে বিষয়ে বলিতেছি।

দাশরথি কৃষ্ণলীলা-বর্ণনায় বৈষ্ণব কবিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার পাঁচালী বা গানে অবিমিশ্র মাধুর্যের বর্ণনা কোথাও নাই। তিনি সর্বত্রই ঐশ্বর্য ও মাধুর্যকে একসঙ্গে মিশাইয়াছেন। তাহা হইলেও অনেক গান তাঁহার কবিত্বপূর্ণ, গানের রচনাশৈলীও মনোরম, শব্দ-চয়নেরও পারিপাট্য আছে।

গানের অপসিদ্ধান্তের উদাহরণ দিতেছি। দাশুর একটি গানের অনেকেই প্রশংসা করেন। কেহ কেহ এই গানটিকে দাশুর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। গানটির প্রথম পংক্তি হইল—

হৃদি বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি।

দাশুর নিজ হৃদয়কে বৃন্দাবন বলিবার অধিকার ছিল কিনা জানি না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরাধা বলিতেছেন—

আনের যে অন্য মন   আমার মন বৃন্দাবন
মনে বনে এক করি জানি।

এ অধিকার বোধহয় তাঁহারই ছিল। কোন বৈষ্ণব কবিও আপন হৃদয়কে বৃন্দাবন বলিতে সাহস করেন নাই। বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে কমলাপতি বলিয়া সম্বোধন কতখানি নিরাপদ বুঝিতে পারিতেছি না। দ্বিতীয় পংক্তি—'ওহে ভক্তি-প্রিয় আমার ভক্তি হবে রাধা-সতী।' আচার্যগণ বলেন—'সাধন-ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়! রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেম নাম কয়॥' প্রেম হইতে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব। মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী। ভক্তির রাধা হইবার অধিকার আছে নাকি? অতি সাংঘাতিক কথা বলিয়াছেন দাশরথি—'মুক্তিকামনা আমারি হবে বৃন্দে গোপনারী, দেহ হবে নন্দের পুরী স্নেহ হবে মা যশোমতী॥' যে কোন বৈষ্ণব শুনিলেই ধিক্কার দিবেন। মুক্তিকামনাকে তাঁহারা অতি ঘৃণ্য বলিয়া মনে করেন। আচার্যগণ বলেন—'তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।' অজ্ঞান-অন্ধকারের নাম কৈতব। এবং প্রধান কৈতব হইল মুক্তিকামনা। তাহাকে কিনা ব্রজবনের অধিষ্ঠাত্রী বৃন্দাদেবী বলিয়া অভিহিত করা? যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলার অন্যতম সাহায্যকারিণী, তাঁহাকে এইরূপে হেয় করিয়া দাশু অপরাধী হইয়াছেন। আচ্ছা হৃদয় যদি বৃন্দাবন, তবে আবার দেহ নন্দের পুরী নন্দালয় হইবে কিরূপে? এ কেমন কথা? দাশু নিজের স্নেহকে মা যশোমতী বলিয়াছেন, অন্যায় করিয়াছেন। আমি মাত্র গানটির অসামঞ্জস্য দেখাইলাম। কিন্তু এই গানটি লইয়া দাশুকে বিচার করা চলিবে না। দাশরথির কতকগুলি উৎকৃষ্ট গান আছে। কোন কোন গানের দুই একটি কলি আজও প্রবচনের মত লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছে। 'ননদিনী বোলো সবারে নগরে, ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণকলঙ্ক-সাগরে'। 'দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা'। এসব বহু-পরিচিত। আমি গুটিকয়েক গান তুলিয়া দিলাম—

বংশীধ্বনি ॥ সিন্ধু ভৈরবী, পোস্তা

যাব না করি মনে মন কি মানে বাঁশী শুনে ॥
বাঁশীতে মন উদাসী হইগে দাসী শ্রীচরণে ॥
মনে হয় মানে বসি হেরব না আর কালশশী
কাল হলো মোহন বাঁশী না হেরিলে মরি প্রাণে।
পারিস কেউ সহচরি রাখতে মোর মনকে ধরি
কালাচাঁদ প্রেমডুরি বেঁধে মনে মনে টানে ॥

কৃষ্ণরূপ ॥ সুরট মল্লার, ঢিমে তেতালা

সই লো ডুবিলাম ঐ রূপসাগরে।
ওই গোকুল নগরে, আছে কে হেন সুহৃদ
আসি তরঙ্গে রাধারে ধরে ॥
মরি কি রূপমাধুরী নীলোৎপলে নিল হরি
দিল লাজ নীল গিরিবরে ॥
কাল তো কত দেখিলো সখি লো ওকি লো কালো
অখিল ভুবন আলো আলো করে ॥
আমি একা কোথা রাখি কিছু ধর ধর সখি
রূপ আমার আঁখিতে না ধরে ॥

আক্ষেপানুরাগ ॥ ঝিঁঝিট ঠেকা

ননদিনী বোলে সবারে নগরে।
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণকলঙ্ক-সাগরে ॥
কাজ কিবা সে কাজ কি বাসে
কাজ কেবল সেই পীতবাসে
সে থাকে যার হৃদয়বাসে সে-কি বাসে বাস করে ॥
কাজ কি গো কুল কাজ কি গোকুল
অনুকূল সব হোক প্রতিকূল
আমি ত সঁপেছি গো কুল
অকূল কাণ্ডারীর করে ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখী ॥ পরজ, একতালা

এ কলঙ্ক তোমার কালা কলঙ্কী হয় রাজবালা।
যার গলে হে গোকুলচন্দ্র অকলঙ্ক চাঁদের মালা ॥
যে চাঁদে করেছে দূর সদানন্দের মনের অন্ধকার
রাধার পক্ষে ঘটলো কি দায় খাটলো না সে চাঁদের আলা।
নাথ হে গোকুলের মাঝে কুলকন্যা হয়ে কুল ত্যজে
অকুলের কাণ্ডারী ভজে রাই হলো না কুলোজ্জ্বলা ॥

বিদেশীনী বেশে কৃষ্ণকে দেখিয়া ॥ বিভাস একতালা

আর কি থাকে কুল এসেছ গোকুল
ডুবাইতে কুল অকূল সাগরে।
একবার দেখলে কালশশি আর কি যাবে কাশী
দাসী হবে বাঁশী শুনলে পরে ॥
আমরা নারী করি অন্তঃপুরে বাস
অন্তরে প্রবেশ করেন শ্রীনিবাস
স্বামী সহবাস ঘুচাই গৃহবাস বাসনা গো
শ্যামের বাঁশের বাঁশী বনবাসিনী করে ॥
বংশীরবে সতীর সতীত্ব দমন
হরে লয় সতীর পতি প্রতি মন
মত্ত জগজন যমুনা উজান বেগে ধায় গো
যখন বংশীধর বাঁশী ধরেন অধরে ॥

বলহরি রায় ও অন্যান্য কবিওয়ালাগণ

কবিওয়ালা বলহরি রায় লালু নন্দলালের শিষ্য। ইঁহার নিবাস বরুল গ্রাম, বীরভূমের সদর সিউড়ী হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। রাজা মানসিংহের সঙ্গে যে সমস্ত রাজপুত সৈন্য বা কর্মচারী এদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্যে দুই একজন বীরভূমের তুরীগ্রাম ও বরুল প্রভৃতি গ্রামে বাস

করেন। বলহরি রায় এইরূপ কোনো রাজপুতের বংশধর। বলহরির পিতার নাম আলমচাঁদ রায়। অনুমান ১১৫০ সালে বলহরির জন্ম এবং ১২৫৬ সালে শতাধিক বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। বলহরির কনিষ্ঠপুত্র রাধাচরণও কবির গানে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৩০১ সালে রাধাচরণের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

বরুলে আরও কয়েক ঘর রাজপুতের বাস আছে। ইঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণদাস রায়ের পুত্র নিতাইদাস ও আনন্দচাঁদ রায়ের পুত্র রাইচরণও বিখ্যাত কবিওয়ালা ছিলেন। ১২৯০ সালে রাইচরণ এবং ১৩০৬ সালে নিতাইদাস পরলোকগত হন। ইঁহারা সকলেই বলহরির শিষ্য। বীরভূমে বলহরি রায় কবিওয়ালাদের গুরু বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। একটি গান শুনিতে পাওয়া যায়—

কবির গুরু সেই বলহরি
ছিরু ঠাকুর সঙ্গে ফেরে কৈলাসের যাই বলিহারি।

ইঁহাদের সমসাময়িক কবিওয়ালাগণের মধ্যে রাইপুরের রামাই ঠাকুর, বাঁশশঙ্কা গ্রামের রাজারাম গণক, পুরন্দরপুরের কৈলাস যুগী, এবং কুড়মিঠা গ্রামের বনওয়ারী চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা কাহার নিকট গান শিখিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। সেকালে সাধারণত সন্ধ্যায় অথবা প্রাতে কবির গান আরম্ভ হইত, এবং পরবর্তী প্রাতে অথবা সন্ধ্যায় ওস্তাদগণের মুখোমুখি পাল্লা গানে তাহার সমাপ্তি। এই সমাপ্তিগান সাধারণত 'বোল' নামে পরিচিত। আসরে দাঁড়াইয়াই সুমুখো-সুমুখি ইহার উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিত। আমরা এই কবিওয়ালাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, এক একটি গান ও 'বোল' গানের উদাহরণ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কবির গান 'ভবানী-বিষয়', 'সখীসংবাদ', 'লিহর' ও 'খেউড়' এই কয় ভাগে বিভক্ত ছিল। ভবানী-বিষয়ের একটি অংশের নাম ছিল আগম, এবং সখীসংবাদ, বৃন্দাবন ও মাথুরলীলা এই দুই নামে অভিহিত হইত। বোল-গানে আগম, গোষ্ঠ, উত্তর গোষ্ঠ, সখীসংবাদ ইত্যাদি সব রকম গানেরই প্রথা ছিল। লিহর শ্লেষাত্মক গান এবং খেউড় সাধারণত মোটা (অশ্লীল) গান নামে পরিচিত। বলহরির একটি গান (দাঁড়া-কবির গান) নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

এ কি শুনি বংশীধ্বনি রাধে বাজে গহন কাননে,
শ্যামের বাঁশীতে ডাকিছে বারেবার চল নিকুঞ্জবনে,
আগুসারি সুকুমারী চল ওগো রাই,
রাধা রাধা রাধা বলে ডাকিছে শ্যামরায়,

তোমা বিনে সে গহন বনে, তোমার পথ
নিরখিয়া আছেন শ্রীহরি।
নিকুঞ্জে চল কিশোরী,
রাইগো হবে মহারাস মনে অভিলাষ
অই বাজিছে সংকেতে বনে শ্যামের বাঁশরী ॥
শ্যামের মনোমোহন বেশ কর ওগো প্যারী,
কুলনারী সুমাধুরী শুনে বাঁশীর রব,
ঘরে হ'তে আকুল হ'ল ব্রজের গোপী সব,
ত্যজে লোকলাজ ছেড়ে গৃহ কাজ,
এলো চল ভেটী গিয়া সে বংশীধারী।
রাই জাতী যুথী মল্লিকা মালতি নানা ফুলে,
কমল অপরাজিতা করবী বকুলে,
হার গাঁথ মনোমত আজ কুতূহলে,
শ্যাম গলে দিব কুসুমের হার,
রাই ত্বরিতে কুঞ্জে চল আশা পুরাইতে গোপীকার।
ওগো শীঘ্রগতি রসবতি ছাড়ি কুললাজ
রাসস্থলে ভেটী গিয়া নবীন রসরাজ,
মনের আহ্লাদে ওগো শ্রীরাধে,
নয়নভ'রে হেরব আজ কুঞ্জবিহারী ॥
আর কৃষ্ণদরশনে বিলম্বে কি কাজ চল নিধুবনেতে,
কি করিবে গুরুগঞ্জনা কি করিবে কুললাজেতে,
কৃষ্ণসনে একাসনে রঙ্গে হবে প্রেমের সঞ্চার,
মনের আনন্দে গোবিন্দে লয়ে মহানিশি করিবে বিহার,
শারদ পূর্ণিমার শশী কিরণ বিলায়,
মনের আনন্দে গোপী কৃষ্ণগুণ গায়,
বলহরি দাস করে প্রতি আশ,
আজ হেরবো দোঁহার রূপ যুগল মাধুরী ॥

কৈলাস ঘটকের নিবাস কচুজোর গ্রাম, সিউড়ী হইতে সাত মাইল দক্ষিণে— সিউড়ী-দুবরাজপুর পাকা রাস্তার উপরে। ইহার পিতামহ সর্বানন্দ সরস্বতী কুল-পরিচয়ে বিশেষজ্ঞ এবং দেশবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। নিকটবর্তী মল্লিকপুর

গ্রামে ইঁহার নিবাস। কচুজোড়ের জমিদার রাজা রুদ্রচরণ রায় ইঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। সর্বানন্দের পুত্র হরমোহন, তাঁহার পুত্র কৈলাসচন্দ্র কচুজোড়ে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ে বাস করেন। ১২০৫ সালে কৈলাসের জন্ম এবং ১২৮০ সালের কার্তিক মাসে তাঁহার লোকান্তর ঘটিয়াছে। আগমনী, বিজয়া, ডাকনাম, প্রভৃতি গান রচনায় ইঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। লিহরে এবং খেউড়ে সেকালে ইঁহার কেহ সমকক্ষ ছিল না। কৈলাসের দাঁড়া-কবির একটি গান—

গগনে উঠেছে বেলা দেখ ভাই চিকণকালা
যতসব রাখাল ডাকে,
তুই বিনে ভাই কালিয়ে রতন যত ধেনুগণ
চেয়ে আছে উর্ধমুখে,
তুমি কোন্ ঠাকুরের বেটা একি ঠাকুরাল,
নিতুই নিতুই তোমার কেবা চরাবে ধেনুর পাল
এমন মিনিকড়ির নফর
তোমার কোন্ রাখাল আছে কেনা।
আর বিলম্ব করোনা, গোষ্ঠে এস কালিয়া সোনা,
জানিরে ভাই নীলমণি, খেয়েছিলে নবনী,
তোমার যুগল করে বেঁধেছিল জননী,
আমি তাথেই বলি বনমালী মায়ের গরব করোনা॥
চল চল বিলম্বে কাজ নাই, ওরে ভাই কানাই,
আর তুমি বিনে যায়না বনে তোমার ধবলী সাওলী গাই॥
তুমি বিনে বিপিনে ধবলী যায়না,
শিঙ্গা পাচনী বাধা আমরা নিব ব'য়ে
আমরা ফিরাব ধেনু তোমার চাঁদ মুখ চেয়ে,
তোমার মা দিয়েছে টাড় বালা আমরা কোথা পাব,
বনে গিয়ে বনফুলের মালা তোর গলাতে পরাব,
ঐ রাখাল মণ্ডলের মাঝে তোরে নইলে সাজে না॥
তুমি সব রাখালের শিরোমণি, বট নীলকান্ত মণি
তাই নিতুই আসি ভাই তোমায় নিতে,
তুমি না গেলে ভাই ওরে কৃষ্ণধন যত রাখালগণ
বাঁচবে না মরবে প্রাণেতে॥

আজকের মত গোষ্ঠে চল আসবো নাকো আর,
আমরা কাল হতে ভাই ধেনু চরাব আপনার আপনার ॥
কৈলাস কহে জোড় করে, এত নফরালী ক'রে
তোমার মনের কথা ভাইরে পেলাম না ॥

একবার বলহরির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়া 'বোল' গানে কৈলাস যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন সেই 'চাপান' ও উত্তর উদ্ধৃত করিতেছি।

বলহরি বোল ধরিলেন—

আকুল হ'লাম আমি ঐ বাঁশীর গানে।
শুনে শ্যামের বাঁশী মন উদাসী প্রাণে না ধৈরয মানে ॥
গুরুজনার মধ্যে বসি নাম ধ'রে ডাকে বাঁশী, শুন গো আসি,
ঘরে রৈতে নারি বল কি করি নিষেধ না মানে প্রাণে।
বাঁশীতে কি গুণ জানে গুরু গৌরব নাহি মানে কত সয় প্রাণে,
তোরা কর গো মানা যেন আর বাজেনা যাই কৃষ্ণ দরশনে ॥

কৈলাস ঘটক ইহার উত্তরে মাথুর বিরহের অবতারণা করিলেন; বলিলেন—"কৃষ্ণ তো বৃন্দাবনে নাই, কে বাঁশী শুনাইবে? ও তোমার মনের ভ্রম", ইত্যাদি।

সব গান পাওয়া যায় না, একটি গান এইরূপ—

বৃন্দাবনে কে শুনাবে বাঁশীর গান।
কাজ নাই বেশভূষণে, কৃষ্ণ বিনে এখনি ত্যজিব প্রাণ ॥
ব্রজেতে নাই বংশীধারী, নীরবেতে শুকশারী, শূন্যময় হেরি,
যত পশুপাখী মুদে আঁখি সকলে মৃত সমান।
বিনে বাঁকা মদনমোহন শূন্য হেরি বন উপবন, ঝরে দুনয়ন।
আর কি দেখতে পাব সেই মাধব, কার কাছে করিব মান ॥

সৃষ্টিধর ঠাকুরের নিবাস ছিল বোলপুরের পশ্চিমস্থিত কাঁকুটিয়া গ্রামে। ইনি জাতিতে বৈদ্য। ইহারই কোন পূর্বপুরুষ চৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা কবি লোচনদাসকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। লোচনের সঙ্গে কাঁকুটিয়ার এই সম্বন্ধ-গৌরবে সৃষ্টিধর আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। গৃহবিবাদের ফলে তিনি কচুজোড়ের নিকটবর্তী জাম্বুরী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। সৃষ্টিধর ছিরুঠাকুর নামেই সমধিক পরিচিত। ছিরু বলহরির শিষ্য। কৈলাসের মৃত্যুর পরেও ইনি কিছুদিন জীবিত ছিলেন। মৃত্যুকালে ইহার বয়স প্রায় আশির কাছাকাছি হইয়াছিল। ছিরুর একটি গান—

বিচ্ছেদ শেল হেনে গেছেন সেই বংশীধর।
তার উপরে পঞ্চমস্বরে কোকিল করে সুমধুর কুহুস্বর।
শুনি কুহুরব যত সখী সজল আঁখি সবে নীরব শবাকৃত সব,
ব্রজে নাই মাধব, কেন্দে কন সেই কেশব বিনে শূন্য এ সব।
এলি হ'য়ে কৃষ্ণের পক্ষ, তুই রে কোকিল পক্ষ,
রাধার পক্ষে কি দুর্দশা তা তো চক্ষে দেখিস না।
এখন যা রে যা বিহঙ্গ বৈরঙ্গ রাই অঙ্গ দগ্ধ করিস না,
সোনার কমলিনী কৃষ্ণবিরহিণী মণিহারা ফণী শ্যামকাঙ্গালিনী,
কোকিল এখন কুহুরবে যেন ডাকিস না।
দেখে দুঃখ দয়া হলো না,
কোকিল পেয়ে মাধবীপ্রিয়ে মত্ত হয়ে পিয়ে সৌরভ,
কর কুহুরব বেড়েছে গৌরব,
আবার ভ্রমর তায় দ্বিগুণ জ্বালায় করি গুণগুণ রব।
সাধের গোকুল শূন্য করি, মথুরায় গেছেন হরি,
আকুল হয়ে কাঁদছেন প্যারী জেনে তুই জানিস না॥
সেই শ্রীকৃষ্ণের বিরহেতে রাই অধরা,
কুহুরব শুনি আকুল কমলিনী চক্ষে বয় সহস্রধারা।
এখন দেখি না কোন আধার শ্রীরাধিকার নাই অন্য বল,
জ্বলছে এই বিচ্ছেদ অনল তাই তাহে দুর্বল।
বলের মধ্যে আছে কৃষ্ণের নামটি সম্বল,
বলে সঙ্কটে প্রাণ রক্ষে করহে মাগি ভিক্ষে,
আছে সৃষ্টিধর মনের দুঃখে যা যা হেথা থাকিস না॥

কবিওয়ালা নিতাই দাসের সঙ্গে ইঁহার একটি বোল-গানের উদাহরণ দিলাম। এই বোল-গানগুলি বৈশাখ মাসে নামকীর্তনের কালে ডাকনাম রূপে ব্যবহৃত হইত। পূর্বে প্রত্যেক হিন্দুপল্লীতে বৈশাখের প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামবাসী হরিনাম সঙ্কীর্তন করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিত। অনেকে কবিওয়ালাদের লইয়া গিয়া নূতন নূতন গান বাঁধাইয়া লইত। এই সব গানে আবার পাড়ায় পাড়ায় দুইদলে উত্তর প্রত্যুত্তরও চলিত। বোল-গানে এইজন্যই দশকুশী, ছোট দশকুশী ইত্যাদি তালের উল্লেখ দেখিতে পাই।

নিতাইয়ের বোল—

কাল অঙ্গে ধূলা কে দিল বাপধন।
কেন কেঁদে এলি বনমালী মলিন তোমার চাঁদবদন॥
ছল ছল যুগল আঁখি বুক মাঝে ধারা দেখি, কি দুখের দুখী,
আমার প্রাণ বিদীর্ণ জীবন শূন্য এখনি ত্যজিব জীবন।
মা হয়ে কি দেখতে পারি ধূলা ঝাড়ি কোলে করি, আ মরি মরি,
কার গৃহে গেলে কে কাঁদালে তার হিয়ে বটে কেমন॥

সৃষ্টিধর ঠাকুর উত্তর দিলেন—

যশোদে গো রব না আর গোকুলে।
গোপীরা সব ধূলা দেয় কাল বলে॥
তোমায় আমি জিজ্ঞাসিলাম, কেন আমি কাল হলাম,
জিজ্ঞাসিলাম, গৌরী পূজেছিলে তুমি কোন্ ফুলে।
(দশকুশী) গোলোক ছাড়িয়ে এলাম, তোমার ঘরে বিকাইলাম,
তবে কেনে অঙ্গে ধুলা দেয়—কেন কাল হলাম গো—
(ছোট দশকুশী) ক্ষীরসর নবনীর তরে জনমিলাম তোমার ঘরে,
তুমি কি দিয়েছিলে জবা বিল্বদল গো, সেই গৌরীপদমূলে॥

চাকর যুগীর নিবাস পুরন্দরপুর,—সিউড়ীর দক্ষিণ-পূর্বে তিনক্রোশ। ইনি ছিরুঠাকুরের সাগরেত বলিয়া পরিচিত। চাকরদাসের একটি গান—

গোচারণ জন্যে ছিদাম আনন্দে চললেন নন্দালয়।
গিয়ে আঙ্গিনাতে মৃদু বচনেতে যতনে কৃষ্ণ প্রতি কয় ;
ভাইরে কানাই দেখরে কত গগনে বেলা হয়েচে,
এখনও মায়ের কাছে ননী খাও নেচে নেচে,
দাদা সেই ধেনুর পাছে দাঁড়ায়ে আছে।
তো বিনে সব ধেনুগণে চেয়ে আছে পথ-পানে ;
ডাকছে রে দাদা বলাই আয়রে ভাই যাই গোচারণে,
বিনে তোর বেণুর সাড়া ধেনুগণ দেয়না সাড়া,
যায় না রে বনে তারা ও মাখনচোরা,
বলাই দাদা দাঁড়িয়ে আছে শীঘ্র চল রে সেইখানে॥
এখন মায়েরি কোলে দুগ্ধ পানে আছ মগনে,
দেখরে যত পথের ধুলি উত্তপ্ত হ'তেছে বনে,
একে তোর কোমল চরণ কেমনে করবি গমন,

ঘামবে তোর ও চাঁদবদনী রবির কিরণে,
চাকর দাস আজকে পথে থাকবে রে সাথে সাথে
অনিবার আতপ বারণে,
(এখন) নে রে বেণু ধরাচুড়া নূপুর পর রে চরণে ॥

বনওয়ারী চক্রবর্ত্তীর নিবাস কুড়মিঠা গ্রাম, সিউড়ীর আট ক্রোশ দক্ষিণে। ইহার পিতার নাম মধুসূদন চক্রবর্ত্তী। ইনি বাল্যে স্বগ্রামে হরিচরণ ভট্টাচার্য্যের টোলে অধ্যয়ন করিয়া যৌবনে মঙ্গলডিহি-নিবাসী বিষ্ণুচন্দ্র চট্টরাজের নিকট কবির গান শিক্ষা করেন।

নিম্নের ছড়াটি বনওয়ারীর রচিত বলিয়া শুনিয়াছি—

সীতার সাথে রঘুনাথে পঞ্চবটীর বনে,
জনক-ঝিয়ারী পাশা সারি খেলছে রামের সনে।
দেখ সে দৈবের ঘটন,
দেখ সে দৈবের ঘটন বন ভ্রমণ কত্তে এল চেড়ী,
নাম তার স্পূর্পণখা চাহন বাঁকা কানে মদনচেরী।

ইত্যাদিরূপে সুবৃহৎ ছড়াটি বীরভূমের অনেকের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়।

চাকর যুগীর সঙ্গে বনওয়ারীর বোল-গানের একটি উদাহরণ দিতেছি। চাকর যুগী বোল গাহিলেন—

চাঁদ নিব মা, চন্দ্র চাই।
(কপালেতে) চিত্তা দিতে হাতছানিতে ডাকছিলে যে বলছি তাই।
মণিময় অঙ্গনতলে সমুজ্জলো ঐ যে জলে
আমি মাখবো কজ্জলে,
ভাল করে ডাকলে ভালে দিবে এসে চিৎ পরাই।
ভাল ক'রে ডাক মাগো চাঁদ বিনে আজ
মানবো নাকো শুধু কাঁদবো গো,
না পেলে চাঁদ তেজব জীবন ঝাঁপ দিব যমুনায় যাই।

বনওয়ারী চক্রবর্ত্তী উত্তর দিলেন—

চন্দ্রবদন চন্দ্র চায় কি হলো দায়।
চাঁদ নিব বলে দুধের ছেলে ধূলায় গড়াগড়ি যায়।
চেয়ে দেখ তোর অঙ্গপানে কত চাঁদ তোর নখের কোণে,
চাঁদ কাঁদেয়ে কেনে,

এ চাঁদ কোথা পাব এনে দিব ঘরে আসুক নন্দরায়।
চাঁদ হ'য়ে চাঁদ চাইলি নিতে চাঁদ কোথা মোর প্রাঙ্গণেতে,
দিব যে হাতে,
ওতো বৃষভানু রাজনন্দিনী চন্দ্র নয় রে যাদব রায়॥

রামাই ঠাকুর—রামানন্দ চক্রবর্তী, নিবাস রাইপুর। ইনি সুবর্ণ-বণিকের ব্রাহ্মণ; কাহার নিকট কবি শিখিয়াছিলেন জানা যায় না। অনেকে ইহাকেও বলহরির শিষ্য বলিয়া নির্দেশ করেন।

রাধানাথ দাস ইঁহার সহিত বোল-গানের উত্তর-গোষ্ঠে গোপালকে আনিয়া যশোদার করে অর্পণ করিলেন—

ওমা নন্দরাণী এই নাও তোমার গৌরী আরাধিত ধন।
গোষ্ঠে যাবার কালে প্রাণ গোপালে ক'য়েছিলে দুঃস্বপন॥
আমরা যত রাখাল মেলি মাঝে ল'য়ে বনমালী ফিরাই ধবলী,
আমরা ছিদাম সুদাম দাম বসুদাম গোপালে করি যতন।
গোপালে কে চিন্তে পারে, বনে গিয়ে গিরি ধরে, হেরি বাম করে,
কৃষ্ণের বাঁশীর স্বরে সুধা ক্ষরে আপনি ফেরে ধেনুগণ॥

রামাই ঠাকুর গাহিলেন—

বলরামরে একি দেখি রঙ্গ।
গোচারণে লয়ে গেলি নীলরতনে এনে দিলি ধূলায় ধূসর অঙ্গ।
শুখায়েছে মুখ ইন্দু অঙ্গে সকল ঘর্মবিন্দু
কুশাঙ্কুরে ক্ষত পদারবিন্দ,
আমার গোপাল দুধের ছাওয়াল
দিয়েছিলাম তোমার সঙ্গ॥

রাজারাম গণকের নিবাস বাঁশশঙ্কা গ্রাম; সিউড়ীর দক্ষিণে প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে। ইঁহার একটি গান—

কি অপরূপ হেরি ও বাপ নয়নে।
থাকতে ক্ষীর ননী ও নীলমণি মৃত্তিকা খাও বদনে।
কোলে আয় বাপ রতনমণি নিরখি তোর বদনখানি দিব নবনী,
তুমি সর্বস্বধন কাল রতন পেলাম অনেক সাধনে।
ছিদাম বলে মাটী খেলে গোলোক ব্রহ্মাণ্ড দেখাইলে বদন কমলে।
দেখে কোটি ইন্দ্র কোটি চন্দ্র অধৈর্য হলাম প্রাণে॥

এই গানের উত্তর পাই নাই। শুনিয়াছি কৈলাস ঘটকের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়া নাস্তানাবুদ হইয়া ইনি কিছুদিন বায়না বন্ধ রাখিয়াছিলেন।

বিষ্ণুচন্দ্র চট্টরাজ কবির আসরে নামিয়া কখনও গান করেন নাই; তবে অনেক কবিওয়ালা তাঁহার বাড়ীতে গিয়া গান শিখিয়া আসিত। তিনি বহু গান রচনা করিয়াছিলেন। অনেকে তাঁহারই রচিত গান আসরে নিজের ভণিতা দিয়া গাহিত; চট্টরাজ মহাশয়ের এইরূপই অনুমতি ছিল। মঙ্গলডিহি গ্রামের অনেক তথাকথিত ইতর-জাতীয় লোকে তাঁহার নিকট লেখাপড়া শিখিয়াছিল। এইজন্য চট্টরাজ মহাশয় সাধারণত 'মাশয়' নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। চট্টরাজের একটি গান তুলিয়া দিলাম। এই গানে তিনি স্বগ্রামে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীশ্যামচাঁদ বিগ্রহের নিকট অন্তরের প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছেন।—

এই ক'রো হে বাঁকা শ্যাম রায়।
ব'সে আধ গঙ্গাজলে হরি ব'লে প্রাণ যায়।
ব'সে নারায়ণ ক্ষেত্রে, হরিনাম লিখিব গাত্রে,
যখন ঘেরবে ঐ কৃতান্তে রে'খ হরি রাঙ্গা পায়।
পাপে ভারি তনুতরী জীর্ণ হলো ওহে হরি,
তোমার চরণ ধ'রে তরি যেন ভুলোনা আমায়।

কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকণ্ঠ

প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রা বা কালীয়দমন যাত্রার সঙ্গে বাঙ্গালার নাট্যশালার একটি অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র আছে। রঙ্গমঞ্চের গঠন-প্রণালী, দৃশ্যাবলী এবং প্রসাধন-পারিপাট্য আমরা পশ্চিম হইতে আমদানী করিয়াছি, কিন্তু আমাদের দৃষ্টি এবং মন যদি যাত্রা দেখিয়া অভ্যস্ত না থাকিত, তাহা হইলে ঐ সমস্ত আমাদিগকে কতখানি মুগ্ধ করিতে পারিত অনুমান করা কঠিন নহে। যাত্রার আসরে আমাদিগকে বৃন্দাবন মথুরার দৃশ্যও কেহ দেখাইত না, ঘটনাক্ষেত্রের নামও কেহ বলিয়া দিত না। আমরা পাত্র-পাত্রীর কথোপকথন এবং আখ্যানবস্তুর সহিত পূর্ণ পরিচয় নিবন্ধন সে সমস্ত বুঝিয়া লইতাম। তজ্জন্য আমাদিগকে কোন অসুবিধা বা অসোয়াস্তি ভোগ করিতে হইত না। খোলা মাঠে একটা চাঁদোয়া

টাঙ্গাইয়া যাত্রার আসর করা হইয়াছে ; চারিদিকে লোকারণ্য, মাঝখানে খান কতক তাল বা খেজুর-চাটাই বা বড় জোর কয়েকখানা সতরঞ্চ বিছাইয়া অধিকারী মহাশয় যাত্রা গাহিতেছেন। নিজেই দূতী সাজিয়াছেন, কিংবা দলের কেহ দূতী সাজিয়াছে, তিনি কাঁধের উপর একখানা নামাবলী ফেলিয়া আসরে নামিয়াছেন। সঙ্গে কয়েকজন দোহার জুরী এবং অভিনেতা ; একজোড়া তবলা-বাঁয়া, জোড়াকয়েক মন্দিরা, দুইখানা খোল, খানকয়েক সেতার, তানপুরা, বেহালা, হাত-ঢোল ইদানীং আসিয়া জুটিয়াছে ; হারমোনিয়মও খুব বেশী দিনের নহে। ইহাতেই লোক হাসিয়া-কাঁদিয়া আনন্দে আত্মহারা হইত। বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও অবস্থা অবলম্বনপূর্বক পাত্রপাত্রীর কথোপকথনের মাঝে মাঝে অধিকারী মহাশয় দুই-চারি কথা বলিয়া সমস্ত বিষয়টির সংযোগ-শৃঙ্খল বজায় রাখিতেন। চণ্ডীর গানে, রামায়ণে, ধর্মমঙ্গলে আবার এসব কিছুই থাকিত না। কয়েক জোড়া মন্দিরা হাতে লইয়া কয়েক জন দোহার, আর মাথায় ফেটা-বাঁধা চামর-হাতে নূপুর-পায়ে মূল গায়ক, ইহাতেই আসর সরগরম থাকিত। মূল গায়ক কোন একজন দোহারকে অবলম্বন করিয়া মাঝে মাঝে কথোপকথন ছলে গল্পের সূত্র ধরাইয়া দিতেন, বাকীটা সব গানের মধ্য দিয়াই বুঝিয়া লইতে হইত। মনসামঙ্গলও পূর্বে এই ধরনেই গাওয়া হইত, ইদানীং এই গানে খোলের ব্যবহার দেখিয়াছি। কীর্তনে খোল-করতালই প্রধান অবলম্বন। গানের মাঝে মাঝে মূল গায়কের বক্তৃতার পদ্ধতি কীর্তনেও আছে, ইহাকে 'কথা' বলে। কীর্তনের 'আখর' একটি অপূর্ব জিনিষ, গানের বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে ইহার ইঙ্গিত মানুষকে কত কথাই না জানাইয়া দেয় ! আখরের ব্যঞ্জনা কত গভীর, কত দূর-প্রসারী এবং রহস্যময়, না শুনিলে ধারণা হয় না। ঝুমুর এবং কবির মধ্যে দুই দলের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে সমস্ত বিষয়টা পরিষ্কার হইত। যাত্রার এই সমস্ত উক্তি-প্রত্যুক্তি, বিশ্লেষণ এবং গান প্রভৃতিই অভিনেতাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। থিয়েটারে যে একখানা পট দেখিয়া আমরা হস্তিনা, অযোধ্যা, নদী, পর্বত কল্পনা করিয়া আনন্দ পাই, তাহার মূলে নিসর্গপ্রীতি বা কথানুরাগ যাহাই থাকুক, ইহার মধ্যে পৌরাণিক সংস্কারের প্রভাবও অস্বীকার করিতে পারি না। গিরিশচন্দ্র হইতে অপরেশচন্দ্র পর্যন্ত যে কয়জন নাট্যকারের নাটক বঙ্গ-রঙ্গালয়ে জনপ্রিয় হইয়াছে, তাঁহাদের পৌরাণিক নাটকের সংখ্যা ও প্রচার দেখিয়াও আমাদের যাত্রানুরাগের ধারা অনুমান করা চলে। বহু পূর্ব হইতেই এ দেশের ধর্মমূলক উৎসবগুলি

যাত্রা নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। এই যাত্রা অর্থাৎ শোভাযাত্রা একস্থান হইতে অন্য স্থানে পরিচালিত হইবার সময় পথের মাঝে স্থানে স্থানে দাঁড়াইলে যে নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান হইত, তাহা হইতেই 'যাত্রাগান' নাম প্রচলিত হইয়াছে অনুমান করা চলে। আমরা ভালমন্দ বিচার করিতেছি না, অতীতে ফিরিয়া যাইতেও অনুরোধ জানাইতেছি না, মাত্র ইতিহাসের দিক হইতে কৃষ্ণযাত্রা বা কালীয়দমন যাত্রার একটা বিবরণ দিয়া ইহাই নিবেদন করিতেছি যে আমাদের সমাজ, সাহিত্য তথা বঙ্গ-রঙ্গালয়ের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ কতখানি, সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন।

বীরভূম জেলায় কেন্দুলী গ্রামে শিশুরাম অধিকারী নামক একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুবিখ্যাত যাত্রাওয়ালা স্বর্গীয় নীলকণ্ঠের নিকট শুনিয়াছি, এই অধিকারী মহাশয়ই কালীয়দমন যাত্রার প্রবর্তন করেন। শ্রীদাম এবং সুবল, দুই যমজ ভ্রাতা ইঁহারই ছাত্র। পরমানন্দ অধিকারী শ্রীদাম সুবলের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। পরমানন্দের ছাত্রের নাম বদন, তাঁহার ছাত্র গোবিন্দ অধিকারী। নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় গোবিন্দের ছাত্র। ইহাই কালীয়দমন যাত্রার গুরুপরম্পরা।

প্রায় দুইশত বৎসর গত হইতে চলিল কীর্তনের স্রোত মন্দীভূত হইয়া আসিলে প্রাচীন ঝুমুর ও কীর্তন মিলিয়া যাত্রার সৃষ্টি হয়। তাহার একটু পূর্বেই দাঁড়া-কবির সৃষ্টি হইয়াছিল। দাঁড়া-কবি ঝুমুরেরই নূতন সংস্করণ, বোধ হয় উন্নত সংস্করণ। ঝুমুরে যেমন 'আগম' অর্থাৎ ভবানী-বিষয় এবং সখী-সংবাদ অর্থাৎ কৃষ্ণলীলা দুইটি ভাগ ছিল, দাঁড়া-কবিও প্রধানত সেই দুই ভাগ লইয়াই গড়িয়া উঠে। কালীয়দমন যাত্রা কিন্তু আগম-বর্জিত, কৃষ্ণলীলাই তাহার একমাত্র উপজীব্য। কৃষ্ণলীলারও অপরাপর অংশ বাদ দিয়া মাত্র 'যুগলমিলন' 'কলঙ্কভঞ্জন', 'মান' এবং 'মাথুর' এই চারটি পালাই 'কালীয়দমনে' গৃহীত হয়। কালীয়দমনের দেখাদেখি 'রামযাত্রা' ও 'গৌরাঙ্গ-যাত্রার'ও খুব চল হইয়াছিল। পাতাইহাটের প্রেমচাঁদ অধিকারী রামযাত্রা গাহিতেন, লোচন অধিকারী নিমাই-সন্ন্যাস যাত্রায় খুব নাম করিয়াছিলেন। ইনি আবার কালীয়দমনের মাথুর পালার একটা অংশ লইয়া অক্রুর-সংবাদ গান করিতেন। গোবিন্দের যাত্রার দলের প্রতিপত্তি দেখিয়া কাটোয়ার পীতাম্বর অধিকারী একটা স্বতন্ত্র কালীয়দমন যাত্রার দল করেন। ইঁহাদের জাতিগত উপাধি কি ছিল জানি না। যাত্রার দলের অধিকারী বলিয়া ইঁহারা 'অধিকারী'

উপাধিতেই পরিচিত হইয়াছিলেন। সেকালে কেহ 'কালীযাত্রা'র দল করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। কালে রামযাত্রা ও নিমাই-সন্ন্যাস উঠিয়া গেল। কিন্তু রামায়ণ ও চৈতন্যমঙ্গল আজও টিকিয়া আছে। পরে 'সখের যাত্রার' দল হইয়াছে। তাহার মধ্যে কৃষ্ণকালী, রামচন্দ্র, গৌরাঙ্গদেব প্রভৃতির লীলা এবং আরও কত পৌরাণিক, ঐতিহাসিক পালা স্থান পাইয়াছে। মতি রায়ের দল সখের যাত্রার দল নামে পরিচিত। কলকাতায় যেমন পেশাদারী ও সখের যাত্রার অর্থ ভিন্ন প্রকার, পশ্চিমবঙ্গে সেরূপ নহে। কালীয়দমন হইতে পার্থক্য রক্ষার জন্যই মতি রায়ের যাত্রার নাম 'সখের যাত্রা' হইয়াছিল।

'যুগলমিলনে' কালীয়দমন দিনে রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগের সূচনা ও রাধার সূর্যপূজার ছলে মিলন হইলে পালা শেষ হইত। কংসবধ যেমন মাথুর পালারই একটা অংশ, 'কৃষ্ণকালী' তেমনি 'যুগলমিলন' পালারই একটা অংশ। অনেক সময় 'যুগলমিলন' না বলিয়া লোকে গোটা পালাটাকেই 'কৃষ্ণকালী' বলিত। এই যুগলমিলন বা কৃষ্ণকালী যাত্রার প্রথম পালা এবং কালীয়দমন দিনের পূর্বরাগে তাহার আরম্ভ বলিয়াই যাত্রার নাম হইয়াছিল 'কালীয়দমন'। কীর্তনের পালা-গানেও কালীয়দমন দিনের পূর্বরাগের একটি পালা আছে, শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ। এই পদে পালা আরম্ভ হয়—

কালীদমন দিন মাহ। কালিন্দী তীর কদম্বক ছাহ॥
কত শত ব্রজ নব বালা। পেখলুঁ জনু থির বিজুরিকি মালা॥
তঁহি ধনী মণি দুই চারি। তঁহি মনোমোহিনী এক নারী॥
সো রহু মঝু মন পৈঠি। মনসিজ ধূমেহুঁ ঘুম নাহি দিঠী॥

পদটি গোবিন্দদাসের। কেহ কেহ বলেন শিশুরাম অধিকারী যাত্রার কোন নামকরণ করেন নাই। তাঁহার ছাত্র শ্রীদাম সুবল তাঁহাদের পুষ্করিণীতে বাঁশের বাখারীর প্রকাণ্ড একটা কালীয় সর্প প্রস্তুত করাইয়া সাপের মাথায় একটি কৃষ্ণমূর্তি বসাইয়া দেন। পুষ্করিণীটি হইল কালিদহ, কৃষ্ণ যেন সেখানে কালীয়কে দমন করিতেছেন। 'শ্রীদাম সুবল এই উপাখ্যান লইয়াই সেই পুষ্করিণীর সম্মুখের আসরে প্রথম যাত্রাগানের সূত্রপাত করেন, তাই ইহার নাম হইয়াছে কালীয়দমন যাত্রা।' আমরা এ মত সমর্থন করি না, কারণ শ্রীদাম সুবল যে কালীয়দমনের প্রবর্তক বা সৃষ্টিকর্তা একথার কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে শিশুরাম অধিকারীই যে এ যাত্রার উদ্ভাবয়িতা, যাত্রার দলের অধিকারী-পরম্পরাক্রমে তাহার গুরুপ্রণালীর এইরূপ একটা জনশ্রুতি চলিয়া

আসিতেছিল। সুতরাং নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের কথা অবিশ্বাস করিবার কোন সঙ্গত হেতু নাই।

শিশুরাম অধিকারীর কোনও পরিচয় আমরা জানি না। মাত্র এইটুকু জানিতে পারি যে শিশুরাম ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার নিবাস ছিল কেন্দুবিল্ব বা কেন্দুলী। শিশুরামের জাতিগত উপাধিই ছিল অধিকারী। আমাদের মনে হয় এই জন্যই হয়তো যাত্রার দলের মূল গায়কগণ পরবর্তীকালে সকলেই অধিকারী উপাধিতেই চলিয়া গিয়াছেন। শিশুরাম ও শ্রীদাম সুবলের রচিত কোন পালা বা গান-আদিরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

পরমানন্দ অধিকারীর সঙ্গে শ্রীদাম সুবলের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না জানিবার উপায় নাই। আমরা পুরানো কাগজপত্র হইতে জানিতে পারি, পরমানন্দের বাড়ী ছিল রামটবাটী। যে কাগজখানিতে আমরা এই গ্রামের নাম পাইয়াছি, তাহার উপরে ১১৭৫ সাল লেখা আছে। লেখা আছে—'শ্রীপরমানন্দ অধিকারীর বাটী রামটবাটী—শ্রীআনন্দচাঁদ গোস্বামী।' মনে হয় আনন্দচাঁদ ইহার ঠিকানা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং সে সময় পরমানন্দের যাত্রার দলের খুব চলতি ছিল। এই কাগজের সঙ্গে পরমান্দের দুইখানি তুক্ গান পাওয়া গিয়াছে। আমরা কাগজখান স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখাইয়াছিলাম। 'রামটবাটী' পাঠ তিনিও সমর্থন করিয়াছেন। অনেকের মতে পরমানন্দ অধিকারী বীরভূম জেলার অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু বীরভূম জেলায় এখন রামবাটী নামে একটি গ্রাম খুঁজিয়া পাইতেছি। বীরভূমে কোথায় পরমানন্দের নিবাস ছিল কেহ বলিতে পারে না। অন্য কোন জেলায় রামবাটী নামে কোন গ্রাম আছে কিনা জানাইলে বাধিত হইব। পরমানন্দ কালীয়দমন যাত্রার কাঠামো গড়িয়া তাহার একটা সুস্পষ্ট রূপ দান করেন। ঝুমুরের সঙ্গে কীর্তন মিশাইয়া যাত্রার গড়নের কথা বলিয়াছি, কিন্তু বলিতে ভুলিয়াছি ইহার সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের ঢঙেরও খানিকটা যোগ ছিল। নাটকের 'নান্দ্যন্তে সূত্রধারের' মত পরমানন্দ যাত্রার দলে 'বাসদেবে'র প্রবর্তন করেন। তিনি কীর্তনের মত যাত্রার পূর্বে একটু গৌরচন্দ্রিকাও রাখিয়াছিলেন। গৌরচন্দ্রিকায় কীর্তনের মত যাত্রার কি পালা গান হইবে তাহার পূর্বাভাস জানানো হইত না। মাত্র শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বন্দনাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। মোটামুটি ইহাই ছিল যাত্রার দলের নান্দী বা মঙ্গলাচরণ। তাহার পর বাসদেব আসিয়া সেকেলে রসিকতায় একটু রং-ঢঙের চেষ্টা পাইত। অনেক সময় একটি বালক কৃষ্ণ সাজিয়া

বাসদেবের সঙ্গে উত্তর-প্রত্যুত্তর করিত। তারপর আসিত ঝুমুরের দল। কতকগুলি বালক বালিকার পোষাকে আসরে আসিয়া এক সঙ্গে একটি গান গাহিত ও নাচিত। এই ঝুমুরই ছিল কীর্তনের গৌরচন্দ্রিকা। অর্থাৎ ঝুমুর হইতেই বুঝা যাইত আজ যাত্রার কোন্ পালা গাওয়া হইবে। ঝুমুরের পর দোহারেরা কিছুক্ষণ গানের করতব দেখাইতেন। তাহার পর বৃন্দা দূতী আসিতেন এবং কৃষ্ণ, রাধা কিংবা অপরাপর অভিনেতাগণ আসিতেন। ইঁহারা জটিলা, কুটিলা, কংস, অক্রুর, নারদ, নন্দ, যশোদা ইত্যাদি সাজিয়া অভিনয় করিতেন।

পরমানন্দের হাতেই এই বিষয়গুলি বেশ সুসম্বদ্ধ হয়। পরমানন্দের পিতা-মাতার নাম জানা যায় না। আজ পর্যন্ত পরমানন্দ-রচিত কোন গান কোথাও ছাপা হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। আমরা পরমানন্দের চারিটি গান পাইয়াছি। একটি ঝুমুর, ইহা 'মান' গানের পূর্বে গাওয়া হইত। একটি মাথুরের গান ও দুইটি তুক বা তুক্ক। পরমানন্দের তুক সেকালে খুব জনপ্রিয় ছিল। পরমানন্দ বেশ সুকণ্ঠ ছিলেন, তিনি নিজে দূতী সাজিয়া আসরে নামিতেন। এস্থলে পরমানন্দের দুইটি গান (ঝুমুর ও মাথুরের গান) এবং একটি তুক উল্লেখ করিলাম।

ঝুমুর : যার অঙ্গ বাঁকা বচন বাঁকা বাঁকা যুগল আঁখি।
হৃদয় নিদয় পাষাণময় যার শোন গো বিধুমুখী॥
যে মন চুরি করে বাঁশীর স্বরে জানে জগত-জনে।
তার সঙ্গে প্রেমপ্রসঙ্গ সে কি প্রেমের মর্ম জানে॥
সদা চরায় গো-পাল গোঙার গোপাল ফেরে বনের মাঝ।
তারই জন্যে ও রাজকন্যে কেনে লোকসমাজে লাজ॥
আজ দেবো সাজা দেখবো মজা ঘুচাবো বাড়াবাড়ি।
পথ চেয়ে তার আকুল হ'য়ে পরমা আছে পড়ি॥

—৺নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে সংগৃহীত

মাথুরের গানটি যাত্রাওয়ালা শ্রীবাসের ভ্রাতা কাঙ্গাল দাস দিয়াছিলেন। ইনি বোধ হয় বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী ছিলেন, জাতিতে বৈরাগী। পরমানন্দের পর বদন ও গোবিন্দ অধিকারী যাত্রার অনেক উন্নতি করেন। নীলকণ্ঠের হাতে তাহা আরও উন্নত হয়, নীলকণ্ঠের কালীয়দমন যাত্রা যেন নূতন আকার লাভ করিয়াছিল। শ্রীবাস কিন্তু পুরানো ঢঙের গায়ক ছিলেন। তিনিও গোবিন্দ অধিকারীর ছাত্র। গোবিন্দ বদনের নিকট হইতে যে পালাগুলি যে আকারে

লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীবাস গুরুর নিকট হইতে সেই সমস্ত সংগ্রহপূর্বক অনেকটা অবিকল তাহাই বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি গোবিন্দ অধিকারীর পদ গাহিতেন বটে, তবে কীর্তনের পদই বেশী পছন্দ করিতেন। সেই জন্য নীলকণ্ঠের পাশে শ্রীবাসের যাত্রা আমাদের নিকট বেশ একটু নূতন মনে হইত। শ্রীবাসের যাত্রারও এক সময় খুব নাম ছিল। শ্রীবাসের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা কাঙ্গাল দাস কিছু দিন দল চালাইয়াছিলেন। দুই ভাই-ই খুব সজ্জন এবং অমায়িক লোক ছিলেন। আমরা জীবনে বহুবার শ্রীবাস ও কাঙ্গাল দাসের গান শুনিয়াছি। নীলকণ্ঠের গানে আমরা যেরূপ মাতিয়া উঠিতাম শ্রীবাসের গানও আমাদিগকে প্রায় তেমনই মাতাইয়া তুলিত। শ্রীবাস এবং কাঙ্গাল দাস নিজেরাও গান রচনা করিতে পারিতেন।

মাথুর : ব্রজের হরি ব্রজে চল দিনেক দু'য়ের মত।
মন মানেত থাকবে না হয় হবে প্রত্যাগত॥
যদি বল চলতে চরণ ধূলায় ধূসর হবে।
ব্রজগোপীর নয়নজলে চরণ পাখালিবে॥
যখন এসেছিলে তখন হাঁটু খানেক জল।
এখন পশু পাখী তরুলতা কাঁদছে অবিরল॥
ও তাই যমুনা অতল বল কেমনে পার হবে।
না হয় শ্রীযমুনার কূলে থেকে ব্রজ নিরখিবে॥
শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম কাঁদছে অবিরত।
কানাই ভাই কি আসবে নারে এ জনমের মত॥
তোমার প্রাণেশ্বরী বলে আসবে হরি কবে।
ক'দিন রবে এছার পরাণ কালায় কে আনিবে॥
বাঁচে কি না বাঁচে প্যারী কখন হয় বা গত।
তাই এলো পরমানন্দ সখীর অনুগত॥

শ্রীবাসের মুখে এই গান শুনিয়া আবালবৃদ্ধ নরনারী কাঁদিয়া আকুল হইত। গানটির বিষয়বস্তু চির-পরিচিত, এবং ইহার ভাবে ভাষার ছন্দে কেমন যেন একটু মাধুর্য আছে। এই বিখ্যাত গানটি আমরা কতদিন কত ভাবে কত গায়কের মুখে শুনিয়াছি, শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এখন নাকি গ্রামোফোন রেকর্ডেও এ গান স্থান পাইয়াছে। অথচ আমরা জানিতাম না এ গানের রচয়িতা কে। এ গান বাঙ্গালার পদাবলী-সাহিত্যের অনুপযুক্ত নহে। পদাবলী-রচয়িতাগণের

মধ্যে পরমানন্দের নামও সমাদরে উল্লিখিত হইতে পারে। অনেকে গানটির প্রথম কয়েকটি ছত্রমাত্রই জানেন, সম্পূর্ণ পদ প্রায়ই লোকে জানেন না। 'সখীর অনুগত' কথাটির দুই রকম মানে হয়। এক 'শ্রীমতী রাধিকার অনুগত সখী', আর 'সখীর অনুগত ভজননিষ্ঠ অর্থাৎ ব্রজের রাগানুগা মার্গে ভজনাকারী।'

পুরানো কাগজপত্রের মধ্যে পরমানন্দের দুইটি তুক্ক পাওয়া গিয়াছে। একটি তুক্ক এইরূপ—

তুক্ক : সই কয়ি শ্যাম আসিলো।
শশি অস্তাচলে গেলো নিশি পোহাইলো॥
কে বাদী হ'লো সাধে বাদ সাধিলো।
আমার শ্যাম গুণধামকে ভাঙ্গাইলো॥
আমি মরি শ্যাম বিহনে গহন বনে।
শ্যাম রইলো কার কুঞ্জে সুখ শয়নে॥
কি আশে প্রাণ রাখবো বলো।
এ ছারো প্রাণ গেলেই ভালো॥
পরমানন্দের গেলো কুল শীলো।
শেষে সকলি বিফল হ'লো॥

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করিতেন ১১৪০ সালে পরমানন্দের জন্ম হয়। ১২৩০ সালে তাঁহার পরলোক ঘটে। পূর্বে বলিয়াছি, পুরানো কাগজপত্র হইতে জানা যায় ১১৭৫ সালে পরমানন্দের যাত্রার বেশ চলতি ছিল।

খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী জাঙ্গীপাড়া (হুগলি জেলায়) গ্রামে গোবিন্দের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ভাল কীর্তনগায়ক ছিলেন। বাল্যে পিতৃহীন হইয়া গোবিন্দ বদনের দলে ভর্তি হন এবং অল্পদিনের মধ্যেই অধিকারীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। বদনের পরলোকের পূর্বেই ইনি স্বাধীন ভাবে যাত্রার দল করিয়াছিলেন। গোবিন্দ জাতিতে বৈরাগী ছিলেন; লোকে বলিত গোবিন্দ অধিকারী। কণ্ঠ মহাশয় বলিতেন, ১২০১ সালে গোবিন্দের জন্ম হয় এবং ১২৭৭ সালে তিনি লোকান্তরিত হন। বদনের মত গোবিন্দও নিজে দূতী সাজিয়া আসরে গান করিতেন। কিন্তু যাত্রাগানে গোবিন্দ বদনের অপেক্ষাও সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। গোবিন্দের যাত্রার কথা প্রাচীনগণ প্রবাদের মত গল্প করিতেন। গোবিন্দ দল লইয়া অনেক সময় হাবড়া শালিখায় থাকিতেন। গোবিন্দের কবিত্বশক্তি ছিল। তুক্কের ধরনে

গোবিন্দের গানে অনুপ্রাসের প্রাচুর্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গোবিন্দের শুকসারীর দ্বন্দ্ব আজিও পুরাতন হয় নাই। এখনও যাত্রার শেষে রাধাকৃষ্ণের মিলনের পর প্রত্যেক কালীয়দমন যাত্রার দলেই শুকসারীর দ্বন্দ্ব গাওয়া হয়। গোবিন্দের একটি গান—

যার বরণ কাল স্বভাব কাল অন্তর কি ভাল তার।
কাল ভালবেসে ভাল কোন্ কালে হয়েছে কার॥
না বুঝিয়ে ভজে কাল দুঃখে মজে গেল কাল
কাল ভালবেসে হ'ল আসন্নকাল গোপিকার॥
এক কালর কথা বলি ছিল বামন মহাছলি
তারে ভালবেসে বলি উপকারে অপকার॥
ভুঞ্জিয়া বলির বলি ত্রিপাদ ভূমি ছলে ছলি
বলিরে লইয়া বলী পাতালে দিল আগার॥
রামাচন্দ্র ছিল কাল শূর্পণখা বেসে ভাল
সঙ্গ আশে পাশে গেল তারে কল্লে কদাকার
ছিল সীতা মহাসতী নির্দোষে ব'লে অসতী
পঞ্চ মাসের গর্ভবতী কল্লে বনে পরিহার॥

গোবিন্দের বিখ্যাত শুকশারীর দ্বন্দ্বও নীচে তুলিয়া দিলাম।—

বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের॥
রাই আমাদের রাই আমাদের আমরা রাই-এর রাই আমাদের॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
শারী বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ॥ নইলে শুধুই মদন॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।
শারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল। নৈলে পারবে কেন॥
শুক বলে আবার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা।
শারী বলে আমার রাধার নামটি তাতে লেখা। ঐ যে যায় গো দেখা॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে।
শারী বলে আমার রাধার চরণ পাবে বলে। চূড়া তাইত হেলে॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ যশোদাজীবন।
শারী বলে আমার রাধা জীবনের জীবন। নৈলে শূন্য জীবন॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতচিন্তামণি।

শারী বলে আমার রাধা প্রেমপ্রদায়িনী। তোমার কৃষ্ণ জানে॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান।
শারী বলে সত্য বটে রটে রাধার নাম। নৈলে মিছে যে গান
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু।
শারী বলে আমার রাধা বাঞ্ছাকল্পতরু। নৈলে কে কার গুরু॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারী।
শারী বলে আমার রাধা প্রেমের লহরী। প্রেমের ঢেউ কিশোরী॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণের কদমতলায় থানা
শারী বলে আমার রাধা করে আনাগোনা। নৈলে যেত জানা॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ রূপে চিকণ কালো।
শারী বলে আমার রাধা জগত করে আলো। নৈলে আঁধার কালো॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণের শ্রীরাধিকা দাসী।
শারী বলে সত্য বটে সাক্ষী আছে বাঁশী। হত কাশীবাসী॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ করে বরিষণ।
শারী বলে আমার রাধা স্থগিত পবন। মেঘে স্থির যে রাখে॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের প্রাণ।
শারী বলে আমার রাধা প্রাণ করে দান। নৈলে কোথায় পে'ত॥
শুক শারী দুজনারই দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল।
রাধাকৃষ্ণের প্রীতে একবার হরিহরি বল।
বলে বৃন্দাবনে চল্॥

স্বর্গীয় নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গোবিন্দের ছাত্র। নীলকণ্ঠের সময় কালীয়দমন যাত্রা উন্নতির শেষসীমায় পৌছিয়াছিল। কবিত্বে, লোকরঞ্জনে, প্রতিষ্ঠায় প্রতিপত্তিতে তিনি পূর্ববর্তী অধিকারীগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তথাপি প্রতি যাত্রার আসরে গোবিন্দকে প্রণাম না করিয়া তিনি যাত্রা আরম্ভ করিতেন না। তুলনা করা উচিত হইবে না, কিন্তু যদি একথা বলা যায়, বঙ্গের প্রাচীন সঙ্গীতের ধারায় রামপ্রসাদ, দাশু রায় এবং নীলকণ্ঠের কবিত্ব-মাধুরী প্রায় পাশাপাশি বহিয়া চলিয়াছে, তাহা হইলে বোধহয় নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালার প্রধান প্রধান সহরে এবং পল্লীতে, বাঙ্গালার বাহিরে কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি ক্ষেত্রে নীলকণ্ঠ যে সমাদর লাভ করিয়াছিলেন তাহা যে কোন দেশের যে কোন কবির কাম্য বস্তু। কি ইংরাজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়, কি সংস্কৃতজ্ঞ

পণ্ডিতমণ্ডলী, কি অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত আপামর জনসাধারণ, সকলেই নীলকণ্ঠের সমান অনুরাগী ছিলেন। কণ্ঠের কণ্ঠ ছিল যেমন সুমধুর—কি কীর্তন গানে, কি ধ্রুপদ খেয়াল-আদি বৈঠকী সঙ্গীতে, আর কি বাউলের গান-আদি লোকগীতে—তেমনি তাঁহার পারদর্শিতাও ছিল প্রচুর। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সর্বসাধারণের সহিত তাঁহার সদালাপের ক্ষমতা, তাঁহার বিনয়-মধুর ব্যবহার, তাঁহার সৌজন্য, তাঁহার দেশপ্রীতি ও গার্হস্থ্য-জীবন মনে রাখিবার মত।

সন ১২৪৮ সালের ৬ই মাঘ তারিখে নীলকণ্ঠ ধবনি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ধবনি নীলকণ্ঠের জন্মসময়ে বীরভূম জেলার অন্তর্গত ছিল। প্রায় পঞ্চাশ ষাট বৎসর গত হইল বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। নীলকণ্ঠের পিতার নাম বামাচরণ মুখোপাধ্যায়। মাতার নাম সরস্বতী দেবী। বামাচরণের তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ নীলকণ্ঠ, মধ্যম সিতিকণ্ঠ, কনিষ্ঠ শ্রীকণ্ঠ। তিন ভাইয়েরই নামের শেষে কণ্ঠ ছিল; কিন্তু একা নীলকণ্ঠই 'কণ্ঠ' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। নীলকণ্ঠ দরিদ্রের সন্তান। বাল্যে গ্রাম্য পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পান নাই। পিতার নিকট যৎসামান্য যাহা শিখিয়াছিলেন, তাহাতেই রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করিতে পারিতেন। নীলকণ্ঠ বাল্য হইতেই সঙ্গীতানুরাগী, কণ্ঠও তাঁহার খুবই সুমিষ্ট ছিল। তিনি বাল্যেই কিছু কিছু পল্লীপ্রচলিত গান গাহিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। ধবনি গ্রামের জমিদার ব্রজনাথ রায় বালক নীলকণ্ঠের নিকট রামায়ণ শুনিতেন এবং আদর করিয়া নিজ বাড়ীতে খাওয়াইতেন।

কণ্ঠের বয়স যখন তের বৎসর, সেই সময় তাঁহার পিতা পাগল হইয়া যান। অত্যন্ত অর্থকষ্টে পড়িয়া নীলকণ্ঠ তাঁহার খুড়ার সঙ্গে কলিকাতায় আসেন এবং রামমোহন পাঁড়ের দোকানে খাতা লেখার কাজে নিযুক্ত হন। সেখানে রামমোহনের অনুগৃহীতা কোন স্ত্রীলোকের যত্নে তিনি কিছুদিন গান শিখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। পরে কণ্ঠ ধবনির নিকটস্থ জামবন গ্রামের গোপাল রায়ের যাত্রার দলে ভর্তি হন এবং কিছুদিন শিক্ষানবিসীর পর তাঁহার মাহিনা হয় মাসে ছয় টাকা। মাহিনা ঠিক হওয়ার পূর্বে আট দিন গান করিয়া তিনি চারি আনা পারিশ্রমিক পাইয়াছিলেন। নীলকণ্ঠ গোপাল রায়ের দলে দুই বৎসর ছিলেন। সকলে নীলকণ্ঠের গান শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে দেখিয়া গোপাল রায় নিজের প্রতিপত্তিহানির ভয়ে কণ্ঠকে তাড়াইয়া দেন। গোপালের খুড়া গঙ্গানারায়ণও ঐ দলে গান করিতেন। তিনি নীলকণ্ঠকে লইয়া একটি স্বতন্ত্র যাত্রার দল করেন। গঙ্গানারায়ণ নীলকণ্ঠকে বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা

মাত্র বেতন দিতেন। আর নীলকণ্ঠ গান করিয়া টাকাকড়ি, শাল-দোশালা বাসনকোসন যে সব পেলা পাইতেন সেগুলি তাহাকে না দিয়া নিজে আত্মসাৎ করিতেন বলিয়া অতিরিক্ত পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দিতেন। একবার মানভূম পঞ্চকোটে বৈশ্যবংশীয় কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়ীতে গান করিয়া কণ্ঠ একটি ঘোড়া পেলা পাইয়াছিলেন। তিনি খঞ্জ ছিলেন বলিয়া ভদ্রলোক তাঁহাকে যাতায়াতের জন্যই ঘোড়াটি দিয়াছিলেন। বাড়ী আসিয়া গঙ্গানারায়ণ সেটি কাড়িয়া লন এবং আগাম কিছু দেওয়া ছিল বলিয়া নীলকণ্ঠকে বসাইয়া রাখেন। গঙ্গানারায়ণ জামবনের অধিবাসী ছিলেন। জামবনের নিকট কাঁটাবেড়ে গ্রাম। ঐ গ্রামে নীলকণ্ঠের খুড়া যাদবেন্দুর শ্বশুরবাড়ী। যাদবেন্দুর শ্যালকের নামও গোপাল রায়, তিনি আসিয়া গঙ্গানারায়ণের প্রাপ্য টাকা মিটাইয়া দিয়া নীলকণ্ঠকে লইয়া যান। অতঃপর এই গোপাল রায়ের পরামর্শ মত কণ্ঠ গোবিন্দ অধিকারীর সঙ্গে বর্ধমানে গিয়া সাক্ষাৎ করেন। কণ্ঠের গান শুনিয়া গোবিন্দ অধিকারী তাঁহাকে দলে লইয়া মাসিক ষোল টাকা বেতন নির্দিষ্ট করিয়া দেন। বিশুদ্ধ তানলয়-যোগে গান গাহিবার পদ্ধতি তিনি এখানেই সম্পূর্ণ রূপে শিখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। গান-রচনার দীক্ষাও তাঁহাকে গোবিন্দই দিয়াছিলেন। গোবিন্দ স্বীয় পরম গুরু পরমানন্দের গুরু বদনের কথা এবং নিজের শিক্ষা-জীবনের খুঁটিনাটি কথা কণ্ঠের নিকট গল্প করিতেন, কণ্ঠও শুনিতেন। পরবর্তী জীবনে কণ্ঠ এই সমস্ত কথা গল্প করিতে খুব ভালবাসিতেন, গোবিন্দের কথা বলিতে গিয়া তিনি চোখের জল রোধ করিতে পারিতেন না। কণ্ঠের বয়স যখন উনিশ বৎসর তখন তিনি নিজে স্বাধীনভাবে যাত্রার দল করেন। কণ্ঠ দল গড়িবার জন্য বর্ধমান জেলার অন্তর্গত লাউদহ গ্রাম-নিবাসী রামেশ্বর ঘটকের নিকট একশত টাকা কর্জ লইলেন, জামগড়া-নিবাসী কণ্ঠের পুরোহিত রামেশ্বর ভট্টাচার্য ঐ টাকার জামিন রহিলেন। দশ টাকার কাপড়েই দলের পোষাক তৈরী হইল, বাকী টাকা আগাম দাদন দিয়া জন-একুশ লোককে দলে পাওয়া গেল। নীলকণ্ঠ কখনও বা নিজ বাড়ীতে আনাইয়া কখনও বা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। দল প্রস্তুত হইলে তিনি ১২৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে নবান্নে অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে সোঁয়াইগ্রামে অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে প্রথম গান করেন। ঐ সালের শ্রীপঞ্চমীতে বীরভূম সুপুর গ্রামের রায়দের বাড়ীতে গানেও তিনি বিশেষ প্রশংসা পাইয়াছিলেন। তখন কণ্ঠের দলের দৈনিক দক্ষিণা ছিল দশ টাকা। পরে দক্ষিণা দৈনিক একশত

টাকা উঠিয়াছিল। তিনি বর্ধমান এবং হেতমপুর রাজবাটি হইতে বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। নীলকণ্ঠ যাত্রার প্রত্যেকটি পুরাতন পালা নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন। নিজে কয়েকটি নূতন পালাও রচনা করিয়াছিলেন। আসরে বেশীর ভাগ তিনি নিজের রচিত গানই গাহিতেন। সময়ে সময়ে প্রয়োজনমত আসরে দাঁড়াইয়াই গান রচনা করিতেন। সখের যাত্রাওয়ালা মতি রায়ের সঙ্গে কণ্ঠের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। নবদ্বীপ হইতে কণ্ঠ 'গীতরত্ন' উপাধি প্রাপ্ত হন। কলিকাতাতেও কণ্ঠের যাত্রার যথেষ্ট আদর হইয়াছিল। মহারাজা স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কণ্ঠের গানে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বর্ণপদক দানে পুরস্কৃত করেন। পদকে লিখিত আছে—

প্রাচীনো রীতিসম্পন্নঃ কৃষ্ণযাত্রাধিকারিণঃ।
মুখঃ শ্রীনীলকণ্ঠায় প্রবীণায় লয়েস্বরে॥

জাস্টীস্ রমেশচন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে গান করিয়াও তিনি একটি স্বর্ণপদক পান। এইরূপ স্বর্ণপদকের সংখ্যা তাঁহার নিতান্ত কম ছিল না। নীলকণ্ঠ রামপ্রসাদ এবং দাশু রায়ের বাসগ্রামে গিয়া রামপ্রসাদের সিদ্ধাসনের সম্মুখে এবং রায়-পত্নীর নিকট যাত্রা গান শুনাইয়া আসিয়াছিলেন। উভয় স্থানেই কোন বাবদে এক কপর্দকও গ্রহণ করেন নাই। আজকাল আমরা সম্মেলন করি, সঙ্ঘ সংসদ চক্র গড়ি; কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যের উপর আমাদের শ্রদ্ধা কতখানি তাহা দূরবীক্ষণ কষিয়া দেখিতে হয়। প্রাচীন সাহিত্যিকগণকে কত সম্মান করি, কি ভাবে সম্মান দেখাই তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। সমসাময়িক সাহিত্যিক বন্ধুর মধ্যে সম্প্রীতিও পাঁচজনকে দেখাইবার মত। তাহার পাশে প্রাচীন সমধর্মার প্রতি কণ্ঠের এই শ্রদ্ধানিবেদনের ভঙ্গী ও মতি রায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের কাহিনী স্মরণ করিতেও আনন্দ হয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কণ্ঠের গান শুনিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। কণ্ঠ কয়েকবার বিনা দক্ষিণায় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া পরমহংসদেবকে গান শুনাইয়া গিয়াছিলেন। কয়েকবার রাণী রাসমণি ও তাঁহার জামাতা দক্ষিণা দিয়াছিলেন।

সন ১৩১৭ সালের ফাল্গুন মাসে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গান করিতে গিয়া কনিষ্ঠ শ্রীকণ্ঠ পরলোকগত হইলে কণ্ঠ ভ্রাতৃশোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। সেই যে দেহ ভাঙ্গিয়া পড়ে, আর তিনি সামলাইয়া উঠিতে পারেন নাই। সন ১৩১৮ সালের ২০শে শ্রাবণ বাঙ্গালার মুক্তবেণীর পুণ্যক্ষেত্রে সজ্ঞানে তাঁহার গঙ্গালাভ ঘটে। মৃত্যুর পূর্বে ১৯শে ত্রিবেণীতে উপস্থিত হইয়া তিনি নীচের লিখিত গানটি

রচনা করিয়াছিলেন। পুত্র কমলের মুখে স্বরচিত এই গান শুনিতে শুনিতে পশ্চিমবঙ্গের গৌরব নীলকণ্ঠ সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেন।

গানটি এই—

আমি যখন আমি নই মন আর মরণে ভয় কি আছে।
যাঁরই জীবন তাঁরই মরণ তাঁর ভাবনা তাঁরই কাছে॥
বারম্বার আমি সাজে ভুগলাম ভাল ভবের মাঝে
আর ভেবনা মিছে কাজে তোমার আসা-যাওয়া ঘুচিয়াছে॥
কি স্থকর্ম কি কুকর্ম কিবা ধর্ম কি অধর্ম
তিনি ভিন্ন সকল কর্মের কর্মকর্তা আর কে আছে॥
পাপ-পুণ্য করে গণ্য ভাবিয়ে হয়োনা জীর্ণ
হয়ে যাওরে উভয় শূন্য তবে ধন্য হবে পাছে।
ছায়ার বাজি মায়ার বাঁধন একবারেতে খুলে দে মন
তবেরে দুরন্ত শমন আর আসবে না তোমার পাছে।
কণ্ঠ কহে হাসি হাসি পরম ভাবেতে ভাসি
শ্যামা মা আমার যে মুক্তকেশী, আমি মুক্তি পাব তাঁরই কাছে॥

নীলকণ্ঠের প্রথম বিবাহ হয় বীরভূম ভবানীপুরে। প্রথমা পত্নী পরলোকগতা হইলে তিনি ভবানীপুরেই দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। এই পত্নীর কোন সন্তান-আদি না হইলে ইঁহারই অনুরোধে বীরভূম রাজহাটে কণ্ঠ তৃতীয় বার বিবাহ করিয়াছিলেন। এই পত্নীর গর্ভে নীলকণ্ঠের তিন কন্যা ও দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠপুত্র রামকমল পিতৃ-পরিচালিত দল বজায় রাখিয়াছিলেন; কালীয়দমন যাত্রায় রামকমলও স্থনাম অর্জন করিয়াছিলেন। লোকে রামকমলকে কমলাকান্ত বলে।

নীলকণ্ঠের ছাত্রগণের মধ্যে গদাধর দাস, হিতলাল গোস্বামী, পঞ্চানন ভট্ট প্রভৃতি দেশব্যাপী প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। গদাধর দাস, যোগীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ বাগ প্রভৃতি ছাত্রগণ নিজেরা স্বাধীন ভাবে যাত্রার দল পরিচালনা করিতেন।

রামপ্রসাদ, দাশুরায়ের মত কণ্ঠের গানও বাঙ্গালার সম্পদ। আজিও পশ্চিমবঙ্গে প্রতি প্রভাতে পল্লীবৃদ্ধের মুখে প্রথম ভাষা দেয় এই গান। জননী তাহার শিশুর দেয়ালার তালে তালে আবৃত্তি করেন এই গান। এই গানে পল্লীর যুবক হৃদয়ের চাঞ্চল্য প্রকাশ করে, যুবতীরা প্রিয়সখীর কানে মনের

গোপন কথার আভাষ জানায়। এ গান নিরালা পথের পথিকের সঙ্গী, ভিখারীর জীবিকার অবলম্বন, দুঃখীর সান্ত্বনা, পল্লী-বৈঠকের অনাবিল আমোদের উৎস। কণ্ঠের প্রথম গান—'শ্যাম আমারে করলে পাগলিনী'। কণ্ঠ যখন গাহিতেন 'মুনি গো সুখ চেয়ে দুখ বড় ভাল', 'কারে সুখে রেখেছ হে সুখময়', পল্লীর দুঃখদিগ্ধ প্রাণ যেন সে-গানে একটা আশ্বাসের অবলম্বন লাভ করিত। তিনি গাহিতেন—'হরি দুখ দাও যে জনারে। তার কেউ দেখে না মুখ ব্রহ্মাণ্ডবৈমুখ দুখের উপর দুখ, সুখ নাই সংসারে ॥' আপনার জীবনব্যাপী দুঃখের সঙ্গে মিলাইয়া চিরদুঃখী সে-গানে সকল দুঃখের রহস্য উপলব্ধি করিত। নিরুপায় জীবনে ভগবন্নির্ভরতার শান্তি খুঁজিয়া পাইত। কণ্ঠের 'সব রূপে রূপ মিশাইয়া আপনি নিরাকার', 'সংসারে পরমারাধ্য যেই সে একজনা', 'শ্যামা মা আমার মাতা কি পিতা' প্রভৃতি গান তত্ত্বান্বেষীর কণ্ঠভূষণ। তাঁহার 'কেমন করে এমন ঘরে করি বাস', 'আমি বলা সাজে না নরে', 'কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার', 'আমি শ্যামকে চাই না, শ্যামের চরণ চাইগো' প্রভৃতি গানে সংসারবিরাগীর মনে অপার আনন্দের উদয় হইত। 'আমায় লিখিতে শিখিতে দিলে কই' প্রভৃতি গানে ভগবানের ভক্তের কাছে ধরা দেওয়ার যে নিবিড় চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, 'শুধাতে এসেছি নিতে আসি নাই' প্রভৃতি গানে রাধা-সহচরীর অন্তরঙ্গতার অভিমানভরা যে দাবী প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা মহাজন পদাবলীর অনুসরণ হইলেও কবিত্ব-বর্জিত নহে। কণ্ঠের 'শারদ চাঁদ ফাঁদবদন', 'কলিত কলধৌত রুচি শচীতনয় তনুকর', 'সজল জলদাঙ্গ' ও 'ত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুতলে' প্রভৃতি গান পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনার উদাহরণ। দুঃখ হয়, বাঙ্গালার সাহিত্যিকমণ্ডলী বৎসরে অন্তত একটা দিনের জন্যও রামপ্রসাদ, দাশু রায়, নীলকণ্ঠের স্মৃতি-তর্পণের কোন ব্যবস্থা করেন না। দুঃখ হয় রামপ্রসাদ, দাশু রায়, নীলকণ্ঠের গানের একটা বিশুদ্ধ সংস্করণ নাই। দুঃখ হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রগণকে ইঁহাদের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিবার কোন ব্যবস্থা নাই। দেশের সাহিত্য-পরিষদ, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অপরাপর সঙ্ঘ-সংসদ-আদি এবিষয়ে সমান উদাসীন।

কণ্ঠের একটি গান উদ্ধৃত হইল।—

শ্যামের বাঁশী আমি যদি পেতাম।
মোহন মুরলীর স্বরে সবার মন হ'রে
মনোহরের মন ভুলাইতাম।
উচ্চ বেণী বেঁধে দিতিস শিখিপাখা

বামে হেলাইয়ে ক'রে দিতিস্ বাঁকা
পীতাম্বর দিয়ে সর্ব অঙ্গ ঢাকা
বাঁকা হ'য়ে না হয় দাঁড়াইতাম।

শ্যামের সাধা বাঁশী বাজে রাধা বলে
আমার করে বাঁশী বাজতো কৃষ্ণ বলে
বাঁশী বাজায় গোকুলে কালিন্দীর কূলে
কালাচাঁদের কুলে কালী দিতাম।
বনফুলের মালা গেঁথে দিতিস বলে
বনমালী হয়ে থাকতেম নিধুবনে
কণ্ঠ কহে রাই চিন্তা কর কেনে
আমি ঐ চরণে নূপুর হতাম।

আধুনিক সাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্র

স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীকে এবং জন্মভূমিকে, মাতাকে এবং দেশমাতৃকাকে প্রণাম করি। জননী গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, জন্মভূমি বক্ষে স্থান দিয়াছেন এবং নিরাপদ না হইলেও সেই ভুবনপাবন বক্ষই আজিও নিজবাসভূমে পরবাসী, অনন্যশরণ বাঙ্গালীর একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়া আছে। যে মানুষ জননী ও জন্মভূমিকে প্রণাম না করে, ভক্তি না করে, অথবা প্রণতি ও ভক্তির পথে বিঘ্ন উপস্থিত করে, সে অকৃতজ্ঞ অমানুষ—সে নরাধম। বুদ্ধিনাশ না হইলে কাহারও এহেন দুর্মতি ঘটে না। বুদ্ধিনাশ বিনাশেরই পূর্ব লক্ষণ। বাঙ্গালীর বার বার এইরূপ বুদ্ধিনাশ ঘটিয়াছে, সর্বনাশ সমীপবর্তী হইয়াছে, বার বার যুগাবতার জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীকে জননীর এবং জন্মভূমির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, তাহাকে নিশ্চিত বিনাশের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। তাই বাঙ্গালী আজিও বাঁচিয়া আছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে যুগমানব বাঙ্গালীকে আত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, মৃত্যুপথ যাত্রীকে অমৃতের সন্ধান দিয়াছিলেন, যিনি জননীকে বিশ্বজননী-মূর্তিতে এবং বিশ্বজননীকে জন্মভূমির বিগ্রহে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার সহিত বাঙ্গালীর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের হেতু হইয়াছিলেন, তিনি বন্দেমাতরম্ মহামন্ত্রের উদ্গাতা আচার্য বঙ্কিমচন্দ্র। আজ তাঁহাকে স্মরণ করিবার দিন, তাঁহাকে প্রণাম।

আমি বঙ্কিমচন্দ্রকে শতাব্দ-পুরুষ নামে অভিহিত করিতেছি। কথাটা ব্যাকরণসম্মত হইতেছে কিনা জানি না। সৌভাগ্যবান জাতির ভাগ্যেও শতাব্দীর মধ্যে বঙ্কিম একজনই জন্মগ্রহণ করেন। জাতির শতাব্দীর সাধনা, শতাব্দীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ঐরূপ একজন বঙ্কিমেই মূর্তি পরিগ্রহ করে। শতাব্দীর পুঞ্জীভূত বেদনা, সঞ্চিত গ্লানি একজন বঙ্কিমই দূরীভূত করিতে পারেন। তাই আমি বঙ্কিমের নাম দিয়াছি শতাব্দ-পুরুষ।

আমার নিকট একটি কষ্টিপাথর আছে। পাথরখানি আমার মাতামহ বংশের সম্পত্তি। পল্লীর মানুষ শহরে ঘুরিবার সময় কখনও সেখানি সঙ্গে লইতে

ভুলি নাই। সেই নিকষে কষিয়া আমি বাঙ্গালার মানুষ পরখ করিয়া বেড়াই, বাঙ্গালীকে যাচাই করি, অন্তরঙ্গের অনুসন্ধান লই। শ্রীচৈতন্যদেবকে যে ভালবাসে না, বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী যাহার হৃদয় স্পর্শ করে না—আমি তাহাকে বাঙ্গালী বলিয়া বিশ্বাস করিতে ভয় পাই। মধুসূদনকে বুঝিয়াছিলাম ব্রজাঙ্গনা পড়িয়া, রবীন্দ্রনাথকে চিনিয়াছি ভানুসিংহ নামে। বঙ্কিমের পুস্তক যেদিন হাতে পাইয়াছিলাম, আমার জীবনে সে এক স্মরণীয় দিন। পুস্তকখানির অনেকগুলি পাতা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। প্রথমেই চোখে পড়িল, '...অকস্মাৎ বিনষ্ট বিস্মৃত অপরিজ্ঞাত গ্রীকসাহিত্য ইউরোপ ফিরিয়া পাইল। ফিরিয়া পাইয়া যেমন বর্ষার জলে শীর্ণা স্রোতঃস্বতী কুলপ্লাবিনী হয়, যেমন মুমূর্ষু রোগী দৈব ঔষধে যৌবনের বল প্রাপ্ত হয়, ইউরোপের অকস্মাৎ সেইরূপ অভ্যুদয় হইল। আজ পেত্রার্ক, কাল লুথার, আজ গেলিলিও, কাল বেকন—ইউরোপের অকস্মাৎ সৌভাগ্যোচ্ছ্বাস হইল। আমাদের একবার সেইরূপ হইয়াছিল। অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্য-চন্দ্রোদয়, তারপর রূপ-সনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি, ধর্মতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিত। এদিকে দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ ; স্মৃতিতে রঘুনন্দন এবং তৎপরগামিগণ। আবার বাঙ্গালা কাব্যের জলোচ্ছ্বাস। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস চৈতন্যের পূর্বগামী। কিন্তু তাহার পরে চৈতন্যের পরবর্তিনী যে বাঙ্গালা কৃষ্ণ-বিষয়িণী কবিতা, তাহা অপরিমেয়া, তেজস্বিনী, জগতে অতুলনীয়া। সে কোথা হইতে?'

পড়িলাম, পড়িয়া মুগ্ধ হইলাম। পড়িয়া প্রাণ ভরিয়া গেল। একটা আত্মপ্রত্যয়ের আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিলাম। মনে হইল বঙ্কিম দ্রষ্টা, বঙ্কিম ঋষি ; প্রাণে দারুণ আকাঙ্ক্ষা লইয়া একে একে বঙ্কিমের সমস্ত বইগুলি সংগ্রহ করিলাম। এক এক করিয়া সব কয়খানি বই-ই পড়িয়া ফেলিলাম। একটা অপূর্ব বিস্ময়। চোখের সম্মুখে এক অভিনব জগত আবির্ভূত হইল। মনে হইল বঙ্কিম শুধু পড়িবার বস্তু নয়, শুধু অনুভবের সামগ্রী নয়। বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করিতে হইবে। বঙ্কিমের বাণী জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে হইবে। মনে হইল যাহা দেশ-কালের অতীত, যাহা সার্বভৌম এবং শাশ্বত, বঙ্কিম তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন—আপনার দেশে এবং কালে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ। তাই বঙ্কিম সত্যদ্রষ্টা, এবং সাধ ও সাধনা থাকিলে সে সত্য আমাদের জীবনেও রূপান্তরিত হইতে পারে। মনে হইল, যে তীব্র দেশাত্মবোধ এবং স্বাজাত্যবোধ সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মত বঙ্কিমের প্রাণ এবং মনে

জাজ্বল্যমান ছিল, বঙ্কিম-সাহিত্য তাহারই বাঙ্ময় প্রকাশমাত্র। বঙ্কিমকে জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে পারি নাই, তথাপি বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।

মুসলমান রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। যে বিনাশের বীজ তাহার ভিত্তি-মধ্যেই লুপ্ত ছিল, কালে তাহা দিগন্ত-বিস্তৃত শত-শাখ বিশাল বনস্পতিরূপে পরিণত হইয়া সেই আকাশস্পর্শী প্রাসাদকে ভূমিসাৎ করিয়া দিল। এক মহতী বিনষ্টি তাহার ভিত্তিমূল পর্যন্ত উৎখাত করিয়া ফেলিল। যে অর্ধচন্দ্র-লাঞ্ছিত পতাকা বাঙ্গালার সান্ধ্য গগনে অভ্যুত্থিত হইয়া ত্রিযামা যামিনী আলোকময় করিয়া রাখিয়াছিল, রজনীর চতুর্থ যামে সে আলো অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। দুঃখ-রজনীর প্রভাতে আবার দুর্দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। পলাশী-প্রাঙ্গণের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে অকস্মাৎ—'বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী, দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।'

এক চতুর কর্মনিষ্ঠ, নববলদৃপ্ত, স্বজাতিগর্বী, স্বদেশসর্বস্ব জাতি বাঙ্গালা অধিকার করিল। মুসলমান অধিকারকালে বাঙ্গালী ধনীব্যবসায়ী অথবা উচ্চপদস্থ রাজবল্লভ—রাজদরবারে তাঁহাদের যত প্রতিপত্তিই থাকুক, প্রত্যেকেই সমাজকে সম্মান করিয়া চলিতেন, সমাজের পায়ে মাথা নোয়াইতেন, কিন্তু দীর্ঘ পাঁচশত বৎসরের পরাধীনতা ধীরে ধীরে জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিল। সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া গেল। সাহস নাই, সততা নাই, সংযম নাই, সদাচার নাই; বাঙ্গালীর স্মৃতিভ্রংশ ঘটিল। এমনই দিনে বাঙ্গালায় ইংরেজের আবির্ভাব। ইংরেজ বাঙ্গালীকে চিনিয়া লইল। উচ্ছিষ্টলোভী বেনিয়ান, মুৎসুদ্দী, মুন্সী সংগ্রহ করিতে তাহাকে একটি দিনও অপেক্ষা করিতে হইল না। ইহারাই ইংরেজ-সৃষ্ট নূতন জাতি, ইহারাই বাঙ্গালার বাবুজাতি। ইহারা বিলাতী জিনিসের বেসাতি করিয়াছে। বাঙ্গালার তাঁতিদের সর্বনাশের সহায় হইয়াছে। ইহারাই নীলকর-বিষধরদের জন্য স্বজাতি কৃষকের বুকে গর্ত খুঁড়িয়া দিয়াছে। ফলে একদিকে মুষ্টিমেয় বাবুমহলে আরাম-আয়েস, ভোগবিলাস, অন্যদিকে অগণিত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে উদয়াস্ত সহনাতীত শ্রম এবং অনশন-অর্ধাশন। একদিকে বিঘত-প্রমাণ স্থানে কল্পিত শান্তির মৃতকল্প জড়তা, অন্যদিকে সারা বাঙ্গালা ব্যাপিয়া শোষণের অগ্নিদাহ, দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস, মহামারীর তাণ্ডব। এমনই দিনে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

ইংরেজ ধীরে ধীরে বাঙ্গালীকে করায়ত্ত করিল, দলে দলে কেরাণী তৈয়ারী হইয়া উঠিল। ইংরেজের ইতিহাস, ইংরেজের সাহিত্য, তাহার ব্যাখ্যা-বিবৃতি,

বাঙ্গালীকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। বাঙ্গালীর স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়াছিল, বাঙ্গালীর বুদ্ধিনাশ ঘটিল। পরানুকরণ পরানুচিকীর্ষা বাঙ্গালীকে পাইয়া বসিল। সে এক ভীষণ প্লাবন, সে স্রোতে গড্ডলিকার দল কোথায় তলাইয়া গেল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঐরাবত ভাসিয়া চলিল। সেদিন কালস্রোতে উজান বাহিয়া বুক ফুলাইয়া দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙ্গালীকে সাবধান করিয়াছিলেন— 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ'। বঙ্কিমচন্দ্র যেন বলিতে চাহিয়াছিলেন—বাঙ্গালী তুমি ভাসিয়া গেলে ক্ষতি ছিল না; জয়দেব-চণ্ডীদাস-শ্রীচৈতন্য-জননী, রঘুনাথ-রঘুনন্দন-প্রসবিনী, কেদার-প্রতাপের ধাত্রী, ভুবনবিধাত্রী বঙ্গভূমি যে ভাসিয়া যায়। বন্দেমাতরম্, ঐ কালসাগরের বক্ষ হইতে মাকে উদ্ধার কর। তুমি ভুলিয়াছ, কিন্তু আমি তো ভুলিতে পারি না যে, তোমারও গৌরবান্বিত অতীত আছে, তোমারও ইতিহাস আছে, সাহিত্য আছে, তুমি আত্মস্থ হও, প্রবুদ্ধ হও। ইহাই বঙ্কিমের বঙ্কিমত্ব, তাঁহার ঋষিত্ব। ইহা তাঁহার সহজাত দেশাত্মবোধ ও স্বাজাত্যবোধেরই ফল। ইহার জন্য তাঁহাকে সাধনা করিতে হয় নাই। কাহারও সাহায্য লইতে হয় নাই। ইহা তাঁহার প্রাণধর্মেরই স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। তাঁহার মনোধর্মেরই স্বাভাবিক লীলাবিলাস।

বঙ্কিমচন্দ্র কবি, স্বভাব-কবি। এ কবিত্বশক্তি তাঁহাকে চেষ্টা-যত্নে অর্জন করিতে হয় নাই; তেমনই তাঁহার দেশপ্রাণতা, তাঁহার জাতীয়তাবোধও সহজাত —ইহাও কাহারও নিকট ধার করিতে হয় নাই। কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টির পথে কবি-কল্পলোক পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাকে দেশাত্মবোধ ও স্বাজাত্যবোধের বাস্তব ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল এবং ইহারই ভূমিকায় তিনি আজীবন তপস্যারত ছিলেন। ইহাই বঙ্কিমসাহিত্যের অধিষ্ঠানভূমি। কথাটি আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। কবিত্বের সঙ্গে দেশাত্মবোধ ও স্বাজাত্যবোধের কোন বিরোধ নাই। কিন্তু নির্বিশেষ রসসৃষ্টির মূলে কোন উদ্দেশ্য থাকে না। সাহিত্যসৃষ্টির যে প্রেরণা, তাহা কবিপ্রাণ-সঞ্জাত রসভাব প্রকাশেরই বেদনা। এই প্রেরণাই পাঠক-হৃদয়কে অনুপ্রাণিত করে, এই বেদনাই পাঠক-চিত্তে স্পন্দন জাগায়। ফলে রসপিপাসু পাঠক কবির সৃষ্টির সঙ্গে একটা অন্তরঙ্গতা অনুভব করেন এবং ইহাতেই রসসৃষ্টি সার্থক হয়। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। 'উত্তরচরিত' সমালোচনায় প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছেন —'কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে। কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন, চিত্তশুদ্ধি-জনন।

কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতি-ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ-সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।' আমার মনে হয়, কথাটা খুবই সত্য। চিত্তশুদ্ধি না হইলে সাহিত্যবোধ জন্মে না। অন্তত প্রকৃত সাহিত্য আস্বাদনকালে যে রসানুভূতি জন্মে, তাহাতেই পাঠকের চিত্তশুদ্ধি হয়। পাঠকের প্রকৃতি-ভেদে কাহারও চিত্তে এই শুদ্ধির স্থায়িত্ব ঘটে, কাহারও বা শ্মশানবৈরাগ্য, ক্ষণিকের আলো, ক্ষণপরে অন্ধকারে কোথায় মিলাইয়া যায়। তীব্র দেশাত্মবোধ ছিল বলিয়াই বাঙ্গালীর দুঃখ-দুর্দশা বঙ্কিমকে ব্যথিত করিয়াছিল। তাই বাঙ্গালীর চিত্তশুদ্ধির দিকেই সর্বপ্রকারে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তাই কবি-কল্পনার ধ্যানলোক হইতে বার বার সজ্ঞানে তাঁহাকে দেশাত্মবোধের ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। একটা বৃহত্তম আদর্শের ছন্দে তাঁহার দুর্লভের আকাঙ্ক্ষালুব্ধ প্রাণ বন্দী হইয়াছিল। একটা মহত্তম ভাবের সুর তাঁহার মনোবীণায় ঝঙ্কার তুলিয়াছিল। তাই বিরাট সৃষ্টিপ্রতিভার উত্তরাধিকারী হইয়াও তিনি অনধিকার-চর্চাতে লজ্জিত হন নাই। তিনি বাঙ্গালার ইতিহাস খুঁজিয়াছেন, বাঙ্গালীকে বিজ্ঞানের বার্তা শুনাইয়াছেন। অনুশীলন ও ধর্মতত্ত্ব লিখিয়াছেন, কৃষ্ণচরিত্র ও গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সর্বত্রই একই উদ্দেশ্য—বাঙ্গালীর চিত্তশুদ্ধি, বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব, বাঙ্গালীর আত্মজ্ঞান—তাহার বাঙ্গালীত্বের উদ্বোধন। ইহাতে যদি কেহ বলেন বঙ্কিমসাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক, আমরা সে কথার প্রতিবাদ করিব না। প্রতিবাদ করিব না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলিব যে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গবাণী-মন্দিরের যে কয়েকটি প্রকোষ্ঠের দ্বার খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী আজিও তাহারই মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নূতন প্রকোষ্ঠের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় নাই, এমন কথা বলিতেছি না। বঙ্কিমের পূর্বেই মধুসূদন স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সমসাময়িক কবি বিহারীলাল যে অভিনব প্রকোষ্ঠের দ্বারে করাঘাত করিতেছিলেন, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সে প্রকোষ্ঠের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। হয়তো এমনই আরও দুই-একটি প্রকোষ্ঠের উল্লেখ করিতে পারি। তথাপি একথা অতি সত্য যে, বর্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের সর্ববিধ প্রচেষ্টার মূলেই বঙ্কিমের ইঙ্গিত অঙ্গীভূত রহিয়াছে। বঙ্কিমের স্বদেশ নদী-পর্বত-ব্যবধান-বহুল মাটির মূর্তি নয়। বাঙ্গালা তাঁহার ভূগোলের মানচিত্রের রেখা-সমষ্টি নয়। এই দেশ তাঁহার প্রাণময়ী, রূপময়ী, শোভাময়ী, মাধুর্যময়ী মা। তাঁহার হৃদয়ে এই মৃন্ময়ী চিন্ময়ী মূর্তিতে নিত্য প্রত্যক্ষ ছিলেন।

বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষের যে প্রকাশ, সীমার মধ্যে অসীমের যে বিলাস, সত্যের সেই দেশকালাতীত রূপ এই দেশে-কালেই তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল। বাঙ্গালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা, বাঙ্গালীর ঐতিহ্যের পারম্পর্য-প্রবাহ, এক কথায় জাতিগত বৈশিষ্ট্য তিনি দেশমাতৃকার রূপের আলোতেই সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আনন্দমঠে ভাগ্যবান মহেন্দ্র এই রূপের সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন—'বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এক মোহিনী মূর্তি,—লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী-সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্যান্বিতা। গন্ধর্ব কিন্নর দেব যক্ষ রক্ষ তাঁহাকে পূজা করিতেছে।' এই মাতৃমূর্তির উপাসনাই তাঁহার সারধর্ম ছিল। এই মায়ের পূজাই তিনি বাঙ্গালীর পরম ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। বন্দেমাতরম্ মন্ত্র এই ধর্মেরই বীজমন্ত্র।

বাঙ্গালী মানুষ, মনুষ্যত্বই বাঙ্গালীর স্বধর্ম। এই মাতৃ-আরাধনাই সেই মনুষ্যত্ব। বাঙ্গালীর ধর্মই যে মানুষের ধর্ম, ধর্ম যে কতকগুলি তত্ত্ব ও তথ্যের সমষ্টিমাত্র নহে, শুষ্ক আচারের কঙ্কালমালা নহে, ইহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি দেশ ও জাতিকে এক অখণ্ড ঐক্যে সম্বদ্ধ দেখিয়াছিলেন। এই দেশজননীর পূজার জন্যই, পূজার মন্ত্র ও স্তব রচনার জন্যই তিনি ভারতীর শরণ লইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে নূতন ভাষা তৈয়ারী করিতে হইয়াছিল। বঙ্কিমের ভাষা বঙ্কিমেরই সৃষ্টি,—এক অভিনব সৃষ্টি। বিদ্যাসাগরী ভাষা এবং টেকচাঁদী ভাষা মিলাইয়া তিনি এমন এক সর্ববিষয়-প্রকাশক্ষম ভাষা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাহার জন্য বাঙ্গালী আমরণ তাঁহাকে স্মরণ করিবে। বঙ্কিমের ভাষায় মেঘনার বিশালতা, পদ্মার তরঙ্গোচ্ছ্বাস, ব্রহ্মপুত্রের স্রোতোবেগ এবং ভাগীরথীর স্নিগ্ধতার সমাবেশ দেখিতে পাই। হয়তো বাঁশরী অপেক্ষা পাঞ্চজন্যই তাঁহার প্রিয় ছিল, তথাপি তিনি বাঁশরীকেও উপেক্ষা করেন নাই।

দুই

বঙ্কিম পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। পশ্চিমের সংস্কৃতি এবং সভ্যতার বিদ্যুদ্দীপ্তি তাঁহাকেও আকৃষ্ট করিয়াছিল। পাশ্চাত্যের ভাব-সংঘাতে বঙ্কিমের চিত্তও আলোড়িত হইয়াছিল। কিন্তু তৎসমস্তই আত্মস্থ করিয়া তিনি তাহারই আলোকে দেশ ও জাতির মহিমময়মূর্তির সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। পার্থিব সুখের মধ্যে দেহসুখই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, দেহই প্রয়োজনীয় এবং দেহের

প্রয়োজনই প্রধান, ভারতীয় শাস্ত্রকারগণও একথা বহুবার বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেহবাদ আরও কিছু নূতন কথা শুনাইল। নরনারীর হৃদয়-দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিগত জীবনের ঈর্ষা-দ্বেষ, স্নেহ-প্রীতি, ক্রোধ-লোভ, প্রতিহিংসা—পাশ্চাত্য সাহিত্যের মধ্যস্থতায় এক অভিনব রহস্যরূপে আসিয়া দেখা দিল। বঙ্কিম সে রহস্য আপন আদর্শবাদের সঙ্গে গাঁথিয়া স্বরচিত ভাষায় আপন নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রকাশ করিলেন। তাহাই বঙ্কিমের উপন্যাস-লহরী। সে লহরী-লীলার বিচিত্র ভঙ্গিতে বাঙ্গালী আপন জীবনের নব পরিচয় লাভ করিয়াছে। বঙ্কিমের উপন্যাস-সাহিত্যের দিক দিয়াও যেমন, রঙ্গালয়ের দিক দিয়াও তেমনই একদিন শত শত নরনারীর চিত্তশুদ্ধির সহায় হইয়াছে। উপন্যাসের মধ্যে এমন নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত আর কোন বাঙ্গালীর লেখায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এহেন লোকোত্তর প্রতিভা সত্ত্বেও বঙ্কিম অনুশীলন ও ধর্মতত্ত্বে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। এক ক্ষেত্রে যাহা সার্থক, অন্য ক্ষেত্রে তাহা বিফল না হইলে ক্ষুণ্ন হইয়াছে। পুরী, কোনার্ক, ভুবনেশ্বর-গঠনে সিদ্ধহস্ত শিল্পী বাঙ্গালীর আশ্রয়গৃহ রচনায় শক্তিক্ষয় করিয়াছে। ইহা তাঁহার দেশাত্মবোধ ও স্বজাত্য-বোধেরই পরিণতি।

বঙ্কিম দেশাত্মবোধের কবি। তাঁহার এই দেশাত্মবোধের সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশাত্মবোধের বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। পরজাতি-পীড়ন, পররাজ্য-লুণ্ঠন এবং পরাধীন অসহায় প্রজাকে শোষণ করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতি-পোষণের নামই ইউরোপীয় দেশাত্মবোধ। ভারতীয় ভাবধারার ধারক ও বাহক, বাঙ্গালীর অভিনব বৈশিষ্ট্যের প্রতিবোধক বঙ্কিম এহেন দেশাত্মবোধের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তাঁহার গীতার ব্যাখ্যা, অনুশীলন ও ধর্মতত্ত্ব এবং বিবিধ প্রবন্ধাদি পাঠে মানবতার উপাসক যে বঙ্কিমকে আমরা চিনিতে পারি, তাঁহার দেশাত্মবোধ যে নিষ্কলুষ হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি আছে। এইরূপ দেশাত্মবোধ ছিল বলিয়াই তিনি 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের স্রষ্টার গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের মর্ম বুঝিতে হইলে পরাজিত-বিদ্বেষহীন এই সর্বজনীন অভয় মন্ত্রের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, আমাদিগকে গীতার অনুবাদক, অনুশীলন ও ধর্মতত্ত্বের রচয়িতা বঙ্কিমের সঙ্গে পরিচিত হইতে হইবে। 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের প্রভাব সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বর্তমান যুগের চাণক্য-প্রতিম মনীষি মহারাষ্ট্র-কেশরী লোকমান্য তিলক পুণায় শিবাজী স্মৃতি-মন্দিরের দ্বারদেশে এই মন্ত্র উৎকীর্ণ করাইয়া গিয়াছেন। এই মন্ত্র আসমুদ্র ভারতকে এক

অখণ্ড ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে। 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতটি এই মন্ত্রেরই ব্যাখ্যা। একটি মন্ত্র, অন্যটি স্তব। উভয়েই কাহারও প্রতি কোন বিদ্বেষ নাই, কাহারও কোন গ্লানি নাই;—থাকিতে পারে না, থাকা অসম্ভব। অমরার অমৃত যদি কোনদিন সদ্যোপ্রাণনাশী গরলে পরিণত হয়, তথাপি 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে মালিন্য স্পর্শ করিবে না।

দেশ ও কালের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ সত্য কেমন করিয়া দেশাতীত ও কালাতীত রূপ ধারণ করে, কালোচিত ব্যাখ্যায় এক কালের সামগ্রী কেমন করিয়া যুগান্তরের সম্পদে পরিণত হয়, পরাধীনতার বেদনা কেমন জ্বালাময়ী এবং কত অসহনীয় হয়, আর সেই সঙ্গে কবির রসানুভূতি কত মধুর এবং তাঁহার প্রকাশভঙ্গি কেমন চমৎকৃতিজনক হয়, বঙ্কিমের একটি ক্ষুদ্র রচনা হইতেই ইহার সব কয়টির উদাহরণ দিতেছি। উদাহরণের উপলক্ষ্য বাঙ্গালার সর্বজনপরিচিত বৈষ্ণবকবিতা—'এস এস বঁধু এস, আধ আচরে বস, নয়ন ভরিয়া তোমা দেখি।'

সার্ধ চারিশত বৎসর পূর্বে এক বাঙ্গালী প্রেমিক তাঁহার প্রিয় দয়িতকে, বাঙ্গালীর হৃদয়-দেবতাকে যে মন্ত্রে আহ্বান করিয়াছিলেন, বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবি সেই মন্ত্রের অনুবাদ করিয়াছিলেন—

এস এস বঁধু এস।
মণি নয় মাণিক নয় হার করি গলায় পরি
ফুল নয় যে কেশের করি বেশ।
যদি নারী না-করিত বিধি তোমা হেন গুণবিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশ ॥
তোমায় যখন পড়ে মনে চাহি বৃন্দাবন পানে
আউলাইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি ॥

বৈষ্ণব কবি বলিতেছেন—বন্ধু, মণি-মাণিক্যের সঙ্গে তোমার তুলনা হয় না, তবু মনে হয়—কেন মণিমাণিক্য হইলে না। তোমায় হার করিয়া গলায় পরিতাম। তোমায় বাহিরে রাখিয়া সোয়াস্তি হয় না, হৃদয়ে ধরিয়া তৃপ্তি পাই না। তাই তো তোমার পূজা করি। পূজার ছলে ধ্যানের ধন তুমি তোমায় হৃদয় হইতে বাহিরে আনিয়া দেখি, আবার বাহির হইতে হৃদয়ে লইয়া রাখি। তুমি যদি সেই পূজার ফুল হইতে, তোমায় মাথায় ধরিতাম, কেশে লুকাইয়া

রাখিতাম। বিধি যদি নারী না করিত, তোমায় লইয়া দেশত্যাগী হইতাম। এই গৃহ-কারাগারে বন্দিনী আমি, পায়ে পরাধীনতার শৃঙ্খলভার, তাই তোমায় যখন মনে পড়ে, আমার কামনার কল্পনিকেতন ঐ বৃন্দাবন-পানে চাহিয়া থাকি। যেখানে অসুরের আক্রমণ নাই, কালিয় সর্পের ভীতি নাই, দাবদাহের বিভীষিকা নাই।—কোথায় আমার সেই আনন্দনিকেতন শ্রীবৃন্দাবন। আমি কাঁদিতে পাই না বন্ধু, আমায় ছলনা করিয়া কাঁদিতে হয়।

এই গান শুনিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—

যখন এই গান প্রথম কর্ণ ভরিয়া শুনিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল, নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত গাই। মনে হইয়াছিল, সেই বিচিত্র সৃষ্টিকুশলী কবির সৃষ্ট দৈববংশী লইয়া মেঘের উপর যে বায়ুস্তর শব্দশূন্য দৃশ্যশূন্য, পৃথিবী যেখান হইতে দেখা যায় না, সেইখানে বসিয়া সেই মুরলীতে একা এই গীত গাই। কখন ভুলিতে পারিলাম না, কখনও ভুলিতে পারিব না।

অনেক দিবসে মনের মানসে
তোমাধনে মিলাইল বিধি।

আমি কখনও কখনও মনে করিয়া থাকি, কেবল দুঃখের পরিমাণ জন্যই দয়া করিয়া বিধাতা দিবসের সৃষ্টি করিয়াছেন। নহিলে কাল অপরিমেয়, মনুষ্য দুঃখ অপরিমিত হইত। দিবস গণনায় সুখ আছে। সুখ আছে বলিয়া দুঃখীজন দিবস গণিয়া থাকে। দিবসগণনা—দুঃখ-বিনোদন। কিন্তু এমন দুঃখীও আছে যে, সেই দিবস-গণনা তাহার পক্ষে চিত্তবিনোদন নহে। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী—পৃথিবীতে ভুলিয়া মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি; সুখহীন, আশাহীন, উদ্দেশ্যশূন্য, আকাঙ্ক্ষাশূন্য—কি জন্য দিবস গণিব? এই সংসার-সমুদ্রে আমি ভাসমান তৃণ, সংসার বাত্যায় আমি ঘূর্ণ্যমান ধূলিকণা, সংসার-অরণ্যে আমি নিষ্ফল বৃক্ষ, সংসার-আকাশে আমি বারিশূন্য মেঘ, আমি কেন দিবস গণিব? গণিব। আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে। ১২০৩ সাল হইতে দিবস গণি। যে দিন বঙ্গে 'হিন্দু' নাম লোপ পাইয়াছে, সেই দিন গণি।······হায় কত গণিব। দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাতবার গণি। কৈ—অনেক দিবসে মনের মানসে বিধি মিলাইল কৈ? মনুষ্যত্ব মিলিল কৈ? এক-জাতীয়ত্ব মিলিল কৈ? ঐক্য কৈ? বিদ্যা কৈ? গৌরব কৈ? শ্রীহর্ষ কৈ? ভট্টনারায়ণ কৈ? হলায়ুধ কৈ? লক্ষ্মণ সেন কৈ? আর কি মিলিবে

না ? হায় ! সবারই ঈপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের মিলিবে না ?

'মণি নয় মাণিক নয় যে, হার করে গলায় পরি'। আর বঙ্গভূমি ! তুমিই বা কেন মণিমাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন আমি হার করিয়া কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না ? তোমায় যদি কণ্ঠে পরিতাম, তোমায় সুবর্ণের আসনে বসাইয়া হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউরোপে, আমেরিকায়, মিশরে, চীনে দেখিত—তুমি আমার কি উজ্জল মণি !

'আমায় নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।' সম্পূর্ণ অসহ্য সুখের লক্ষণ শারীরিক চাঞ্চল্য মানবিক অস্থৈর্য। এ সুখ কোথায় রাখিব, লইয়া কি করিব, আমি কোথায় যাইব, এ সুখের ভার লইয়া ফিরিব ? এ সুখের ভার লইয়া আমি দেশে দেশে ফিরিব। এ সুখ এক স্থানে থাকে না, ধরে না, যেখানে যেখানে পৃথিবীতে স্থান আছে, সেইখানে সেইখানে এ সুখ লইয়া যাইব। এ জগত-সংসার এই সুখে পুরাইব। সংসার এ সুখের সাগরে ভাসাইব। মেরু হইতে মেরু পর্যন্ত সুখের তরঙ্গে নাচাইব। আপনি ডুবিয়া উঠিয়া ভাসিয়া হেলিয়া ছুটিয়া বেড়াইব। এ সুখে কমলাকান্তের অধিকার নাই। এ সুখে বাঙ্গালীর অধিকার নাই। সুখের কথাতেই বাঙ্গালীর অধিকার নাই। গোপীর দুঃখ—বিধাতা গোপীকে নারী করিয়াছেন কেন ? আমাদের দুঃখ—বিধাতা আমাদের নারী করেন নাই কেন, তাহা হইলে এ মুখ দেখাইতে হইত না !

'তোমায় যখন পড়ে মনে, আমি চাই বৃন্দাবন পানে'—এই কথা সুখ-দুঃখের সীমারেখা। যাহার নষ্ট-সুখের স্মৃতি জাগরিত হইলে সুখের নিদর্শন এখানেও দেখিতে পায়, সে এখন সুখী, তাহার সুখ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। তাহার বন্ধু, তাহার প্রিয় বাঞ্ছিত গিয়াছে, কিন্তু তাহার বৃন্দাবন আছে, মনে করিলে সে সেই সুখভূমির পানে চাহিতে পারে ; যাহার সুখ গিয়াছে, সুখের নিদর্শন গিয়াছে, বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে, এখন আর চাহিবার স্থান নাই, সেই দুঃখী, অনন্ত দুঃখে দুঃখী। বিধবা যুবতী মৃতপতির যত্নরক্ষিত পাদুকা হারাইলে যেমন দুঃখী হয়—তেমনই দুঃখে দুঃখী।'

আমার এই বঙ্গদেশে সুখের স্মৃতি আছে,—নিদর্শন কই ? দেবপাল, লক্ষ্মণ সেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ, প্রয়াগ পর্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ীরীতি—এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই ? সুখ মনে পড়িল কিন্তু চাহিব কোন্ দিকে ? সে গৌড় কই ? সে যে ভগ্নাবশেষ ! আর্য-রাজধানীর চিহ্ন কই ?

আর্যের ইতিহাস কই? জীবনচরিত কই? কীর্তি কই? কীর্তিস্তম্ভ কই? সমরক্ষেত্র কই? সুখ গিয়াছে, সুখ-চিহ্ন গিয়াছে, বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে, চাহিব কোন্ দিকে?

রবীন্দ্রনাথের কবিতা

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভারতের বহুমূল্য সম্পদ। 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' দাঁড়াইয়া কবি যেমন লক্ষ্য করিয়াছেন—কত দেশ হইতে কত মানুষের ধারা দুর্বার স্রোতে আসিয়া ভারত মহাসমুদ্রে হারাইয়া গিয়াছে, এবং তাহাদের মিলিত রূপ এক অভিনব রূপে যুগ হইতে যুগান্তরের পথে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আমরাও তেমনি দেখিতেছি—পূর্ব ও পশ্চিমের ভাবপ্রবাহ কবি-হৃদয়ে আশ্রয় খুঁজিয়াছে এবং তাহাদের সম্মিলিতরূপ তাঁহার লেখনীমুখে—কত বিচিত্র বাণী মূর্তিতে ছন্দায়িত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেমন বিশাল তেমনই গভীর, যেমন সুন্দর তেমনই মধুর। পৃথিবীর সমস্ত সুন্দর বস্তুর মত রবীন্দ্রনথের কবিতাও সহজেই হৃদয় আকর্ষণ করে, অনুভূতির আনন্দে হৃদয়কে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করিয়া দেয়।

রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের ভাবধারা আত্মসাৎ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রকাশ-ভঙ্গিতে ভারত-ভারতীর ব্যত্যয় ঘটে নাই। বরং তাঁহার মধ্যে ভারতীয় সাধনার, সভ্যতার ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য-পরম্পরা অতি সুষ্ঠুরূপেই সুবিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথকে ভারতের বাণীমূর্তি বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। ভারতের উপনিষদ, দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির কাব্য-নাটক, বাঙ্গালার বৈষ্ণব পদাবলী, উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথের সাধু-সন্তগণের রচনা, পুরাণ, ইতিহাস কথা, গাথা ও লোকশ্রুতি এ সমস্তই রবীন্দ্র সাগরকে তরঙ্গায়িত করিয়াছে। ভারতবর্ষ আর একজন ব্যক্তির মধ্যেও স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছিল, তিনি মহামানব মহাত্মা গান্ধী। রবীন্দ্রনাথ ভাব, গান্ধীজী রূপ; রবীন্দ্রনাথ কল্পনা, গান্ধীজী কর্ম। বর্তমান ভারতবর্ষের ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর সাহিত্য ও জীবনেতিহাস।

যে গ্রন্থখানির মাধ্যমে আমি রবীন্দ্র-কবিতার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হইয়া-

ছিলাম—সে গ্রন্থখানি চয়নিকা—অজিত চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্কলন। স্মরণ হইতেছে—বেশ সুন্দর বাঁধাই, প্রথমেই একটি চিত্র ছিল, আর তাহারই নীচে 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে' কবিতাংশ মুদ্রিত ছিল, কিংবা পূর্ব পৃষ্ঠায় চিত্র, আর তাহারই সম্মুখের পৃষ্ঠায় সমগ্র কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছিল। গ্রন্থখানি চুরি গিয়াছে। পরবর্তী আর একখানি চয়নিকা বোধহয় কবির নিজের সঙ্কলিত, সেখানি কোন বন্ধুপত্নীকে উপহার দিয়াছিলাম। সম্প্রতি কবির সঙ্কলিত 'সঞ্চয়িতা' আমার অন্যতম অবলম্বন।

অপরাধ অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, বাঙ্গালা সংবাদপত্র পাঠে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার কবিতার প্রতি আমার একটা বিরূপ ধারণাই ছিল। অজিত চক্রবর্তীর চয়নিকাখানি আমার একজন বন্ধুর বিবাহ উপলক্ষে নববধূ উপহার প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। পত্নীর কবিতাপ্রীতির কোন লক্ষণ না দেখিয়া বন্ধু গ্রন্থখানি আমাকেই দান করেন। কারণ আমি রবীন্দ্র-কবিতা লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট তাঁহার এবং তাঁহার সহোদরের সঙ্গেই বেশী বিরুদ্ধ বিতর্ক করিতাম। চয়নিকা পাঠে অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। এই রবীন্দ্রনাথের কবিতা, এমন চমৎকার? আর এই মধুর হইতে মধুরতম—এমন সুন্দর হইতে সুন্দরতম কবিতার রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ। সাম্রাজ্য-জয়ের আনন্দ কেমন জানি না, নব আবিষ্কারের উন্মাদনা কি বস্তু বুঝাইতে পারিব না। সে দিনের সে আনন্দ—আজ কত দিনের কথা, কিন্তু 'আজো মনে হয় যেন সেদিন সকাল' চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। কবির কবিতা সাজাইবার একটি পদ্ধতি দেখিতেছি রচনার কালানুক্রমের অনুসরণ। অজিতকুমার কেমন ভাবে কবিতা সাজাইয়াছিলেন, স্মরণ করিতে পারিতেছি না। তবে এ কথাটি বেশ স্মরণ আছে যে তিনি দুই-একটি কবিতার কোন কোন গুচ্ছ বর্জন করিয়াছিলেন, কবি স্বীয় সঙ্কলিত চয়নিকায় সেগুলির পুনর্যোজনা করেন। উদাহরণস্বরূপ 'পুরস্কার', 'পরশ পাথর' ও 'উর্বশী'র কথা স্মরণ হইতেছে। আবার এমন দেখিতেছি, অজিতকুমারের সঙ্কলিত চয়নিকায় ছিল এরূপ দু-একটি ছত্র যাহা কবি বর্জন করিয়াছেন। উদাহরণ, মনে হয় 'পতিতা'র এই ছত্র দুটি ছিল—

মন্ত্রি, আবার সেই বাঁকাহাসি না হয় দেবতা আমাতে নেই।
ছেড়েছি ধরম তা বলে ধরম ছেড়েছে কি মোরে একেবারেই॥

পরবর্তী সঙ্কলনে এই দুই ছত্র আর দেখিতে পাই নাই। 'গুপ্ত প্রেম' কবিতায়—

আমি আপন অপমান সহিতে পারি—
প্রেমের সহে না তো অপমান,
অমরাবতী তেজে মরতে এসেছে সে
তোমার চেয়ে সে যে মহীয়ান।

সঞ্চয়িতায় এই গুচ্ছটিও বর্জিত হইয়াছে।

ইদানীংকার কবিতার মধ্যে 'সাগরিকা'র শেষের গুচ্ছের আগেকার 'পরের দিনে তরুণ উষা বেণুবনের আগে' গুচ্ছটি কবি বাদ দিয়াছেন। ইহার মধ্যে হয়ত স্বয়ং-কবির সংশোধন-স্পৃহা অথবা সমালোচক বা সঙ্কলয়িতার অথবা পাঠকের সঙ্গে কবির রুচিভেদের কথা থাকিতে পারে।

আমার মনে হয়, কবিতার কালানুক্রমিক আলোচনায় পাঠকের রসোপভোগের বিশেষ সহায়তা হয় না। কবিতা যতদিন কবিতা হয় নাই, ঐতিহাসিকের পক্ষে সেই দিনগুলির একটা প্রয়োজন থাকিতে পারে। কিন্তু কবিতা যখন সত্যই কবিতা হইয়া উঠিল, তখন হইতে কালের হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে বলিয়াই মনে করি। কবিতা এমন বস্তু নয় যে, কালের অঙ্কপাতে তাহার রস নিরূপিত হইবে। রসের গণ্ডি দিয়া তাহার পরিমাপ করিব কিরূপে? কবির স্থায়ীভাব নিশ্চয়ই একটা আছে। সময় সময় সঞ্চারী ও ব্যভিচারী ভাব আসিয়া তাহাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে, তাহার রূপান্তর ঘটাইয়াছে। কে সেই ক্ষণঘটি পলকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে? কবিতা যেদিন কবিতা হইয়া উঠিয়াছে, সেই দিনই এই স্থায়িভাব উদিত হইয়াছে। সেই রসোত্তীর্ণ কবিতার রসের বিষয় ও আশ্রয়, অবলম্বন ও উদ্দীপনা-আদি হইতেই পাঠকের রসানুভূতি ঘটিবে। অবশ্য কোন বিশেষ ঘটনা বা ব্যক্তি অথবা কাল লইয়া লিখিত কবিতার কথা স্বতন্ত্র।

রবীন্দ্র-কবিতার আলোচনায় অনেকে কবির মনস্তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতে বসেন। আমার মনে হয় কাব্যালোচনায় কবিমনের বিচার, আর রসতত্ত্বের সঙ্গে মনস্তত্ত্বের মিলনসাধনের চেষ্টা প্রায় সমান। এ যেন স্রষ্টার তত্ত্বানুসন্ধানের পথে সৃষ্টির পরিচয় গ্রহণ। আমরা কিন্তু সৃষ্টির মধ্য দিয়াই স্রষ্টার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিতে চাই। কবির সৃষ্টির বিষয়ে বরং এই কথাই বলিতে হয় যে আমাদের পক্ষে সৃষ্টির পরিচয়ই যথেষ্ট, স্রষ্টার পরিচয় গৌণ। সৃষ্টির মধ্য দিয়া যদি কিছু পাওয়া যায়—যথা লাভ।

অনেকে রবীন্দ্র-কবিতার আলোচনায় প্রমাণ-পঞ্জীরূপে কবির ছিন্নপত্র ও

জীবনস্মৃতির উল্লেখ করেন। অতীত দিনে কবে কখন কোন্ ভাবের বন্যা আসিয়াছিল, কিসের প্রেরণায় কবি কোন্ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, কবি কি সেই বিশেষ ক্ষণ বা প্রেরণাটিকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিলেন? তাঁহার দিনলিপিতে কি তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায়? যৌবনে লেখা কবিতা, আজ পরিণত বয়সের অধিষ্ঠানভূমি হইতে কবি যে দৃষ্টিভঙ্গিতে নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাহাকে কবিতার রসোপলব্ধির মানদণ্ড বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? কিন্তু তাই বলিয়া সহৃদয় সামাজিকের নিজস্ব অনুভূতিরও অমর্যাদা করা চলিবে না। এ বিষয়ে কবির সঙ্গে পাঠকের রসবোধের পার্থক্য ঘটিতে পারে। কালিদাসের কাব্য-রসাস্বাদের সময় আমরা কি কবিমনের কোন পরিচয় গ্রহণের জন্য ব্যগ্র হই, না প্রত্নতাত্ত্বিকগণের নিকট তাঁহার দিনলিপির কোন অনুসন্ধান করি। এই সমস্তের অভাবে কি আমাদের আনন্দ উপভোগের কোন ব্যাঘাত ঘটে?

রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি কবিতা যেন এক-একটি খণ্ডকাব্য। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে কবির একটি কবিতা অন্য একটি কবিতার অনুপূরক, কিংবা পরিপূরক, অথবা কবি কোন একটি বিশেষ রস ও ভাবকে নানা ভাষায় নানা ছন্দে ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি কবিতার মধ্যে রূপান্তরিত করিয়াছেন, তথাপি এই কথা বলাই সঙ্গত যে, কবির অধিকাংশ কবিতাই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তাহার সমগ্রতাই আমাদিগকে আনন্দ দান করে। কাব্য-আলোচনা সম্বন্ধে কবির সংক্ষিপ্ত অভিমত এইরূপ—

'...কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়; তখন স্ব স্ব প্রকৃতি-অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য, কেহ বা নীতি, কেহ বা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন। এ যেন আতশবাজিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া—কাব্য সেই অগ্নিশিখা, পাঠকদের মন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আতশবাজি। আগুন ধরিবামাত্র কেহ বা হাউইয়ের মতো একেবারে আকাশে উড়িয়া যায়, কেহ বা তুবড়ির মতো উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কেহ বা বোমার মতো আওয়াজ করিতে থাকে।...অনেকে বলেন আঁঠিই ফলের প্রধান অংশ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা তাহার প্রমাণ করাও যায়। কিন্তু তথাপি অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তি ফলের শস্যটি খাইয়া তাহার আঁঠি ফেলিয়া দেন। তেমনি কোনো কাব্যের মধ্যে যদি বা কোনো বিশেষ শিক্ষা থাকে তথাপি কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি তাহার রসপূর্ণ কাব্যাংশটুকু লইয়া শিক্ষাংশটুকু ফেলিয়া দিলে কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারে না। কিন্তু যাহারা আগ্রহ সহকারে কেবল ঐ শিক্ষাংশটুকুই বাহির করিতে চাহেন, আশীর্বাদ

করি তাঁহারাও সফল হউন এবং সুখে থাকুন। আনন্দ কাহাকেও বলপূর্বক দেওয়া যায় না। কুসুমফুল হইতে কেহ বা তাহার রঙ বাহির করে, কেহ বা তৈলের জন্য তাহার বীজ বাহির করে, কেহ বা মুগ্ধনেত্রে তাহার শোভা দেখে। কাব্য হইতে কেহ বা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহ বা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহ বা নীতি কেহ বা বিষয়জ্ঞান উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকেন, আবার কেহ বা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না—যিনি যাহা পাইলেন তাহাই লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিতে পারেন, কাহারো সহিত বিরোধের আবশ্যক দেখি না, বিরোধে ফলও নাই!'

—পঞ্চভূত, কাব্যের তাৎপর্য

কবি নিজের কথায় বলিয়াছেন—

'আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনায় এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।'

—জীবনস্মৃতি

সঞ্চয়িতার ভূমিকায় কবি বলিয়াছেন—'সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত ও ছবি ও গান এখনো যে বই-আকারে চলছে, একে বলা যেতে পারে কালাতিক্রমণ-দোষ।…ওই তিনটি কবিতা-গ্রন্থের আর কোনো অপরাধ নেই, কেবল একটি অপরাধ—লেখাগুলি কবিতার রূপ পায় নি।…ইতিহাস-রক্ষার খাতিরে এই সংকলনে ওই তিনটি বইয়ের যে-কয়টি লেখা সঞ্চয়িতায় প্রকাশ করা গেল তা ছাড়া ওদের থেকে আর-কোনো লেখাই আমি স্বীকার করতে পারব না। ভানুসিংহের পদাবলী সম্বন্ধেও সেই একই কথা।…তার পর মানসী থেকে আরম্ভ করে বাকি বইগুলির কবিতায় ভালো মন্দ মাঝারির ভেদ আছে, কিন্তু আমার আদর্শ অনুসারে ওরা প্রবেশিকা অতিক্রম করে কবিতার শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।'

সঞ্চয়িতায় ভানুসিংহের ভণিতাযুক্ত যে দুইটি কবিতা কবি উদ্ধৃত করিয়াছেন—যতদূর স্মরণ হয় অজিত চক্রবর্তীর সংকলনেও এই কবিতা দুইটি ছিল—আমার মতে এই দুইটি রচনা সত্যই কবিতা হইয়াছে এবং কবির নিজের কথায় তাঁহার কাব্য-রচনার যে একটিমাত্র পালা, সে পালা ঐ ভানুসিংহের পদ হইতেই সুরু হইয়াছে। কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, 'কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়' কথাটি অতি সত্য কথা, কবির নিজ জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা। কিশোর বয়সে কবি বৈষ্ণব-কবিতা পাঠে যে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে ঐ অনবদ্য কবিতা রচিত হইয়াছিল।

অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় কিশোর-কবি সেই যে সম্বোধন করিয়াছিলেন—'মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান' অতি পরিণত বয়সেও বহু কবিতায় নানাভাবে নানারূপে তিনি ঐ একই কথা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়াছেন। মৃত্যুভয় তিনি অতিক্রম করিয়াছিলেন; মরণকে প্রিয়রূপে, বররূপে, বঁধুরূপে, অতিথিরূপে কতরূপে যে তিনি দেখিয়াছিলেন! প্রথম কৈশোরে শ্যামরূপে, আবার পরিণত বয়সে শঙ্কররূপে—'যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন'—(মরণমিলন) কবি এই মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মরণ তাঁহার নিকট নবজীবনের সঙ্গে পরিণয়। সীমার সঙ্গে অসীমের মিলন। কবি আজীবন নানা ছলে এই কথাই বলিয়াছেন—

…নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে॥

—জন্ম ও মরণ

মানব-জীবনের যে চিরন্তন জিজ্ঞাসা—কিশোর-কবি-হৃদয়ে সেই জিজ্ঞাসাই জাগ্রত হইয়াছিল। যাঁহার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া মানবহৃদয়ের অসীম আকুতি ধরণীর আকাশ-বাতাসকে আকুল করিয়া তুলিতেছে—কৈশোরেই কবি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও চিনিতে পারেন নাই। তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়?' ইহা কথার কথা নহে, অলস কল্পনাবিলাস নহে; ভারতের ঋষি তপোবনে শুশ্রূষু সমিধপাণি ঋষিতনয়ের শাশ্বত প্রশ্ন যেমন—'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'—তেমনই ভারতীর আনন্দনন্দনে প্রথম প্রবিষ্ট কবির বিস্মিত জিজ্ঞাসা—

কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়।
হৃদয়মাহ মঝু জাগসি অনুখন,
আঁখউপর তুঁহুঁ রচলহি আসন—
অরুণ নয়ন তব মরণসঙে মম
নিমিখ ন অন্তর হোয়॥
হৃদয়কমল তব চরণে টলমল,
নয়নযুগল মম উছলে ছলছল—
প্রেমপূর্ণ তনু পুলকে ঢলঢল
চাহে মিলাইতে তোয়॥
বাঁশরিধ্বনি তুহ অমিয়গরল রে,
হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরল রে,

আকুল কাকলি ভুবন ভরল রে—
উতল প্রাণ উতরোয় ॥

—সঞ্চয়িতা. প্রশ্ন

এই একটিমাত্র কবিতা লিখিয়াই কবি বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর মধ্যে আসনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান' কবিতাটির কথা সকলেই জানেন। কবি কৈশোরেই অনুভব করিয়াছিলেন—…'জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্যসম্ভোগ। …সমস্ত বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে।'

'বৈষ্ণব ধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে—প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকটে আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই সমস্ত পরম প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে।'

—পঞ্চভূত, মনুষ্য

মানসীর 'অনন্ত প্রেম' এর মধ্যেই কবির এই অনুভূতির পরিচয় আছে। ভানুসিংহের পদাবলীতে যে জীবন-দেবতাকে কবি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'কো তুঁহু বোলবি মোয়', 'অনন্ত প্রেম' কবিতায় তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন—

…অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমির রজনী ভেদিয়া তোমারই মূরতি এসে
চির স্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে ॥

… … …

আজি সেই চির দিবসের প্রেম অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে।
নিখিলের সুখ, নিখিলের দুখ, নিখিল প্রাণের প্রীতি,

একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের স্মৃতি—
সকল কালের সকল কবির গীতি ॥

ভারতীয় সাধনায় জীবন-দেবতাকে; আপন অভীষ্টকে প্রিয়ারূপে পরিচিন্তনের কোন সাধনা নাই। তন্ত্রে নায়িকা-সাধনার পদ্ধতি আছে, কিন্তু এই নায়িকা দেবী নহেন, দেবীর সহচরী। সুফী ধর্মে ভগবানকে প্রিয়তমারূপে ভাবনার কথাই প্রধান। হয়ত কবি কৈশোরেই এই সাধনপথের পরিচয় পাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার জীবনে বৈষ্ণব সাধনা ও সুফী সাধনার সমন্বয় ঘটিয়াছিল। অথবা কবি ভারতীয় উপনিষদ হইতেই ব্রহ্মকে পুরুষ ও নারীরূপে দর্শনের রহস্য অবগত হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে কবির 'রমণী' কবিতাটি স্মরণীয়।—

যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি,
যে ভাবে সুন্দর তিনি সর্ব চরাচরে,
যে ভাবে আনন্দ তাঁর প্রেমে খেলা করে,
যে ভাবে লতায় ফুল নদীতে লহরী,
যে ভাবে বিরাজে লক্ষ্মী বিশ্বের ঈশ্বরী,
যে ভাবে নবীন মেঘ বৃষ্টি করে দান,
তটিনী ধরারে স্তন্য করাইছে পান,
যে ভাবে পরম-এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ গন্ধ গীত করিছে রচনা,
হে রমণী, ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য-আভাসে।

—স্মরণ, রমণী

সুতরাং কবি যে জীবন-দেবতাকে কখনও বঁধুরূপে বরণ করিয়াছেন, আবার কখনও বঁধুরূপে লাভ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নাই। আমার মনে হয় এই মানসীতেই কবি মেঘদূতের পূর্বমেঘরূপ সীমা হইতে যাত্রা করিয়া অসীমের উত্তরমেঘের অলকায় উপনীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মানস-সঙ্গিনী বা লীলাসঙ্গিনীর সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটিয়াছিল।

'সোনার তরী'তে জীবন-দেবতার ছায়া দেখিয়াছি। 'নিদ্রিতা'র স্বপ্নলোকে

গিয়া তিনি আপন অভীষ্ট দেবীর গলে মাল্যদান করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার জীবন-দেবতাও যে তাঁহার জন্য ব্যাকুল, কবিতায় তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় আছে 'সুপ্তোত্থিতায়'। সোনার তরীর 'মানসসুন্দরী' এই জীবন-দেবতারই আবাহন। জগৎ ও জীবনের সঙ্গে কবি পরিচিত হইয়াছেন, দুইকেই অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 'বসুন্ধরা' কবিতা কবি-জীবনের জগৎ-পরিক্রমারই পরিচয়। কবি জীবন-দেবতাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, এইবার জীবন-দেবতার ইঙ্গিতে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' করিয়াছেন !

চিত্রায় জীবন-দেবতার সাক্ষাৎ দর্শনের পরিচয় আছে। 'সাধনা' ও 'আবেদ'ন কবিতা দুইটি জীবন-দেবতার নিকটেই প্রার্থনা। চিত্রার অপর দুইটি কবিতা 'জীবন-দেবতা' ও 'সিন্ধুপারে'। কবি এই দুইরূপে জীবন-দেবতার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছেন। 'জীবন-দেবতা' কবিতায় কবি বঁধুরূপে তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন করিতেছেন। আর 'সিন্ধুপারে' কবিতায় জীবন-দেবতাই বঁধুরূপে তাঁহার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে মিলিত হইয়াছেন।

উপনিষদ বলিয়াছেন—'য মে বৈষং বৃণুতে'। কবি জীবন-দেবতাকে বলিতেছেন—

আপনি বরিয়া লয়েছিলে মোরে না জানি কিসের আশে।
লেগেছে কি ভালো, হে জীবননাথ,
আমার রজনী, আমার প্রভাত—
আমার নর্ম, আমার কর্ম, তোমার বিজন বাসে ?
... ...
এখন কি শেষ হয়েছে, প্রাণেশ, যা-কিছু আছিল মোর—
যত শোভা যত গান যত প্রাণ জাগরণ ঘুমঘোর ?
শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন,
মদিরাবিহীন মম চুম্বন—
জীবনকুঞ্জে অভিসারনিশা আজি কি হয়েছে ভোর ?
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহো আরবার চিরপুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীনজীবনডোরে ॥

এই নূতন বিবাহের কথাই কবি 'সিন্ধুপারে' কবিতায় বলিয়াছেন—

শয়ন ছাড়িয়া উঠিলা রমণী বদন করিয়া নত,
আমিও উঠিয়া দাঁড়াইনু পাশে মন্ত্রচালিতমত।
নারীগণ সবে ঘেরিয়া দাঁড়ালো একটি কথা না বলি
দোঁহাকার মাথে ফুলদল-সাথে বরষি লাজাঞ্জলি।
পুরোহিত শুধু মন্ত্র পড়িল আশীষ করিয়া দোঁহে
কী ভাষা কী কথা কিছু না বুঝিনু দাঁড়ায়ে রহিনু মোহে।
অজানিত বধূ নীরবে সঁপিল শিহরিয়া কলেবর
হিমের মতন মোর করে তার তপ্ত কোমল কর।

... ...

পাদপীঠ-'পরে চরণ প্রসারি শয়নে বসিলা বধূ;
আমি কহিলাম, 'সব দেখিলাম, তোমারে দেখি নি শুধু,

চারিদিক হতে বাজিয়া উঠিল শত কৌতুকহাসি,
শত ফোয়ারায় উছসিল যেন পরিহাস রাশি রাশি।
সুধীরে রমণী দু বাহু তুলিয়া অবগুণ্ঠনখানি
উঠায়ে ধরিয়া মধুর হাসিল মুখে না কহিয়া বাণী।
চকিত নয়ানে হেরি মুখপানে পড়িনু চরণতলে—
'এখানেও তুমি জীবন-দেবতা!' কহিনু নয়নজলে।
সেই মধু মুখ, সেই মৃদু হাসি, সেই সুধা-ভরা আঁখি—
চিরদিন মোরে হাসালো কাঁদালো, চিরদিন দিল ফাঁকি!
খেলা করিয়াছে নিশিদিন মোর সব সুখে সব দুখে,
এ অজানা পুরে দেখা দিল পুন সেই পরিচিত মুখে!
অমল কোমল চরণকমলে চুমিনু বেদনাভরে—
বাধা না মানিয়া ব্যাকুল অশ্রু পড়িতে লাগিল ঝরে।

সেই চিরসুন্দর যে কতরূপে কত ছলে কত বিভিন্ন ক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে কবির সহিত মিলিত হইয়াছেন কবিও তাহা বলিতে পারেন নাই। কবি সুন্দরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—'এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জনমান্তর'। সুতরাং কোন একটি সূত্র ধরিয়া কবিকে অনুসরণ অসম্ভব। কোন একটি ব্যাখ্যার কাঠামোতে—রবীন্দ্র-কবিতাকে আবদ্ধ করিবার প্রয়াস সমালোচনা নহে। কবি জগৎ এবং জীবনকে ভালোবাসিয়াছিলেন। ভালোবাসিয়াছিলেন

জগৎরূপে প্রকাশিত জগতে বিলসিত জগদতীত জীবন-দেবতাকে। তাই তো বলিতে পারিয়াছিলেন—'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা'।

সোনার তরী, চিত্রা প্রভৃতি গ্রন্থে এমন কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর কবিতা আছে যে সমস্ত কবিতার রসোপলব্ধির জন্য কবির বয়স, চিন্তাধারা রচনার সাল তারিখ কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না। কারণ, তাহার মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধহীন স্বয়ংসম্পূর্ণ অনেক কবিতাই পাওয়া যাইতেছে।

ভানুসিংহের পদাবলী

বৈষ্ণব পদাবলী বঙ্কিমচন্দ্রকে মুগ্ধ করিয়াছিল। 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার এই সর্বশেষ বাণী যেখানে 'এহ বাহ্য,' সেই সর্বস্ব-সমর্পণপূত সুমহতী ত্যাগধন্য গোপীপ্রেমের অনুভূতিই বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেমের আদর্শ। বঙ্কিমচন্দ্রের পদাবলী ব্যাখ্যা দেশাত্মবোধের অভিনব সংহিতা। মধুসূদন ব্রজাঙ্গনা লিখিয়া পদাবলীর প্রতি আপনার শ্রদ্ধার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, নবীনচন্দ্রের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসে পদাবলী পাঠের পরিচয় আছে। অক্ষয়চন্দ্র ও সারদাচরণ শিক্ষিত বাঙ্গালীকে পদাবলীর সঙ্গে পরিচিত করিতে যত্ন লইয়াছিলেন। ইহাদেরই যোগ্যতম উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথ কৈশোরেই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় সে দিনের কিশোর কবি পদাবলী বুঝিয়াছিলেন, তাহার মর্ম উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সমধিক আশ্চর্যের বিষয় শ্রীমন্‌মহাপ্রভু-প্রবর্তিত প্রেমধর্মের দিব্যানুভূতিই এই ভাগ্যবান্ কবিকে ভানুসিংহের পদাবলী-প্রণয়নে প্রেরণা দিয়াছিল। অধুনা প্রকাশিত পত্রাবলীর মধ্যে স্বর্গগত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত একখানি পত্রে এই অনুভূতির ইঙ্গিত আছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের নামোল্লেখ না থাকিলেও রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় এই অনুভূতির প্রকাশ অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

শ্রীভগবান মাত্র পুণ্যের পুরস্কারদাতা ও পাপের দণ্ডবিধাতাই নহেন, তিনি আমাদের একান্ত আপনার জন। তিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ হইলেও করুণ এবং মধুর। এই ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ-বন্ধনের সাধনাই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু-প্রবর্তিত প্রেমধর্মের গূঢ়তম রহস্য। শ্রীরাধিকার মহাভাব মানবানুভূতির অতীত বস্তু।

সুতরাং বলিতে হয় গোপীভাবের উপাসনাই এই ধর্মের চরম ও পরম তত্ত্ব। দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য-ভাবের উপাসনাও মাধুর্যপুষ্ট। কিন্তু কান্তাভাবের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। মাধুর্যের সার এই কান্তাভাব, ব্রজের মধুর ভাবই সর্বভাবের নিদান। অপর তিনটি ভাবে আগে সম্বন্ধ, পরে পরিচর্যা, কিন্তু কান্তাভাবে পরিচর্যার অনুরূপ সম্বন্ধ, অর্থাৎ সম্বন্ধ এখানে সেবার অনুগামী। অপর তিনটি ভাবের মত মধুরেও সেবা 'কৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্যময়' ; তথাপি এই সেবার একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। এই স্বাতন্ত্র্যই কান্তাভাবের বৈশিষ্ট্য, এই বৈশিষ্ট্যই পদাবলীর প্রাণ।

নিতান্ত অনুগতরূপে একান্ত অন্তরঙ্গভাবে ভৃত্যোচিত সেবাই দাসের পরম ধর্ম। সখার অধিকার ইহাপেক্ষাও অধিক। কাঁধে চড়ায়, কাঁধে চড়ে ; উচ্ছিষ্ট ফল আনিয়া মুখে তুলিয়া দেয়। কোনরূপ সঙ্কোচ নাই, বলে 'তুমি কোন্ বড়লোক, তুমি আমি সম!' বাৎসল্য আরও মধুর। নন্দ-যশোমতী জানিতেন, 'এই শিশু আমাদেরই প্রতিপাল্য। ইহার ভালো মন্দ বোধ নাই, ইহার হিতাহিত বুঝিয়া পুরস্কার তিরস্কারে আমাদেরই একমাত্র অধিকার।' গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণের শিশুত্ব নাই। কিন্তু ভাবের দিক দিয়া গোপীভাবের মধ্যে এই তিনটি ভাব তো আছেই, ইহার অতিরিক্ত আরও কিছু আছে। গোপীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ—

> গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্।
> প্রভব প্রলয় স্থানং নিধান বীজমব্যয়ং ॥

মাত্রই নহেন, তিনি ইহারও অধিক। আর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীগণের সম্বন্ধ—শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখেই বলিয়াছেন—

> সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
> সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি নঃ ॥

অর্জুন, তোমার নিকট সত্য বলিতেছি—গোপীগণ আমার সহায়, গুরু, শিষ্যা, ভোগ্যা, বান্ধব এবং স্ত্রী। তাঁহারা যে আমার কি নহেন, আমি বলিতে পারিতেছি না।

এই গোপীযূথেশ্বরী শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, মান, বিরহের স্বতঃস্ফূর্ত পীযূষপ্রস্রবণ বৈষ্ণব পদাবলী। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলায় অমৃতপ্রবাহিনী বৈষ্ণব পদাবলী। এই পদাবলীর সাকার ও সাবয়ব বারিবাহ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে—রসভাবের মিলিত তনু, মাধুর্য ও সৌন্দর্যের জঙ্গম হেম-কল্পতরু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে দেখিবার সৌভাগ্য অনেকেরই হইয়াছিল। ইহাদেরই

মধ্যে কেহ কেহ পদাবলীর রচয়িতা। যাঁহারা দেখিবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত, তাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন, ভক্তগণের মুখে শ্রীগৌরাঙ্গের অপ্রাকৃত প্রেম ও অপার্থিব করুণার কথা শুনিয়াছিলেন। এইরূপ কয়েকজন পদকর্তার অপরোক্ষানুভূতিই পদাবলীকে মধুর ও সুন্দর করিয়াছে। তাঁহাদের প্রেমাকুল অন্তরের উদগ্র আকুতিই পদাবলীকে স্বচ্ছন্দ, সাবলীল, চমৎকৃতিময় ও হৃদয়-সংবেদ্য করিয়া রাখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসরণেই ভানুসিংহের পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন।

ভানুসিংহের পদাবলী আলোচনা করিতে হইলে সর্বাগ্রে এই একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে রবীন্দ্রনাথ পদাবলী-প্রণেতৃগণের বহু পরবর্তী ব্যক্তি। সেকালে একালে অনেক পার্থক্য। কালের সঙ্গে সঙ্গে দেশের এবং পাত্রেরও বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এযুগে আর বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হইবে না। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা—প্রেমিক-প্রেমিকার অন্তরবেদনা যদিও নিরন্তর প্রকাশেও সমাপ্তিলাভ করে না এবং এমন কথাও বলা চলে না যে পদাবলীর মধ্যে তাহার প্রায় শেষ কথাটিই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি পদাবলীতে যাহা বলা হয় নাই, তাহার ইঙ্গিত এত গভীর, এমন ব্যাপক এবং এমনই চিরন্তন যে সেই বেদনার বাণীরূপ আজিও রসিক ও ভাবুকের প্রাণে নিত্য নূতন আস্বাদনের আনন্দ দান করিতেছে। সুতরাং আধুনিক কোন কবির রচিত প্রেমের কবিতায় নূতনত্বের ব্যঞ্জনা আমরা পদাবলীর ভাষ্যস্বরূপ স্বাভাবিক ও সহজপ্রাপ্য রূপেই গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা সত্যই নূতন। এই নূতনত্ব তাঁহার ভানুসিংহের পদাবলীতে না থাকিলেও অপর অনেক কবিতায় আছে। পদাবলীর মত রবীন্দ্রনাথেরও কতকগুলি কবিতা বুঝিতে পারি, বুঝাইতে পারি না—যাহা অন্তরকে বিহ্বল করে, যাহা ধ্যানের বস্তু, ধারণার সামগ্রী, যাহা আস্বাদ্য বেদনীয় ভোগভাব্য। সেই বেদ্যান্তর স্পর্শশূন্য অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ভানুসিংহের পদাবলী আলোচনায় কবির কয়েকটি কথাও মনে রাখিতে হইবে। ১৩৩৮ সালে প্রকাশিত কবি নিজ সঙ্কলিত সঞ্চয়িতার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—'যে কবিতাগুলিকে আমি নিজে-স্বীকার করি তার দ্বারা আমাকে দায়ী করলে আমার কোনো নালিশ থাকে না। বন্ধুরা বলেন, ইতিহাসের ধারা রক্ষা করা চাই। আমি বলি, লেখা যখন কবিতা হয়ে উঠেছে, তখন থেকেই তার ইতিহাস। এ নিয়ে অনেক তর্ক হতে পারে সে কথা বলবার স্থান এ নয়।

সন্ধ্যা সঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত ও ছবি ও গান এখনও যে বই-আকারে চলছে, একে বলা যেতে পারে কালাতিক্রমণ দোষ। বালক যদি প্রধানদের সভায় গিয়ে ছেলেমানুষী করে তবে সেটা সহ্য করা বালকদের পক্ষেও ভালো নয়, প্রধানদের পক্ষেও নয়। এও সেই রকম। ওই তিনটি কবিতাগ্রন্থে আর কোনো অপরাধ নেই, কেবল একটি অপরাধ—লেখাগুলি কবিতার রূপ পায় নি। ডিমের মধ্যে যে শাবক আছে সে যেমন পাখী হয়ে ওঠে নি—এটাতে কেউ দোষ দেবে না, কিন্তু তাকে পাখী বললে দোষ দিতেই হবে।

ইতিহাস-রক্ষার খাতিরে এই সঙ্কলনে ওই তিনটি বইয়ের যে-কয়টি লেখা সঞ্চয়িতায় প্রকাশ করা গেল তা ছাড়া ওদের থেকে আর কোনো লেখাই আমি স্বীকার করতে পারব না। ভানুসিংহের পদাবলী সম্বন্ধেও সেই একই কথা। কড়ি ও কোমলে অনেক ত্যাজ্য জিনিস আছে, কিন্তু সেই পর্বে আমার কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে।'

কবি সঞ্চয়িতায় ভানুসিংহের পদাবলী হইতে দুইটি কবিতা গ্রহণ করিয়াছেন। কবিতা দুইটি সর্বজনপরিচিত। একটি 'মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান'। অপরটি 'কো তুঁহু বোলবি মোয়'। আমরা একটি কবিতা উদ্ধার করিতেছি, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বক্তব্যও বলিতেছি।

মরণ রে,
তুঁহু মম শ্যাম সমান।
মেঘবরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট,
রক্ত কমল কর, রক্ত অধর পুট,
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব,
মৃত্যু-অমৃত করে দান।
তুঁহু মম শ্যাম সমান।

মরণ রে,
শ্যাম তোঁহারই নাম,
চির বিসরল যব নিরদয় মাধব
তুঁহু ন ভইবি মোয় বাম।
আকুল রাধা রিঝ অতি জরজর,
ঝরই নয়নদউ অনুখন ঝরঝর,

তুঁহুঁ মম মাধব, তুঁহুঁ মম দোসর,
তুঁহুঁ মম তাপ ঘুচাও,
মরণ তু আও রে আও।
ভুজপাশে তব লহ সম্বোধয়ি,
আঁখিপাত মঝু আসব মোদয়ি,
কোর-উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি,
নীদ ভরব সব দেহ।
তুঁহুঁ নহি বিসরবি, তুঁহুঁ নহি ছোড়বি,
রাধা-হৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি,
হিয় হিয় রাখবি অনুদিন অনুখন,
অতুলন তোঁহার লেহ।
দূর সঙে তুঁহুঁ বাঁশী বাজাওসি
অনুখন ডাকসি, অনুখন ডাকসি
রাধা রাধা রাধা!
দিবস ফুরাওল, অবহুঁ ম যাওব,
বিরহ তাপ তব অবহুঁ ঘুচাওব,
কুঞ্জ-বাট'-পর অবহু ম ধাওব,
সব কছু টুটইব বাধা।
গগন সঘন অব, তিমির মগন ভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘরব,
শাল তাল তরু সভয় তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর—
একলি যাওব তুঝ অভিসারে,
যাক পিয়া তুঁহুঁ কি ভয় তাহারে,
ভয় বাধা সব অভয়মুরতি ধরি
পন্থ দেখাওব মোর।
ভানুসিংহ কহে, ছিয়ে ছিয়ে রাধা,
চঞ্চল হৃদয় তোহারি—
মাধব পহু মম, পিয় স মরণসে
অব তুঁহুঁ দেখ বিচারি।

শ্রীকৃষ্ণবিরহে মৃত্যুকামনা স্বাভাবিক। কবিরাজগোস্বামী শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃতে বলিয়াছেন—

অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম যেন জম্বু নদ হেম
সেই প্রেম নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ না হয় তার বিয়োগ
বিয়োগ হইলে প্রাণে না জীয়য় ॥

কিন্তু শ্রীমতীর কথা স্বতন্ত্র। তিনি নিজেই বলিতেছেন—

'সখি, কৃষ্ণ বিরহানল বাড়বানল হইতেও কটুতর, কেমন করিয়া সহ্য করিতেছি জানি না। এই তাপের ধুমচ্ছটাও যদি আমার হৃদয় হইতে বাহির হয়, হয়ত সারা ব্রহ্মাণ্ডই জ্বলিয়া যাইবে।' এই অসহনীয় বিরহের একমাত্র উপজীব্য ছিল, যদি কোন দিন তাহার দেখা পাই—এই ক্ষীণ আশা। কখনও কোন দুর্বল মুহূর্তে মৃত্যুকামনা জাগিত, কিন্তু ভ্রমেও কোন বৈষ্ণব কবি সেই অসতর্ক ক্ষণেও মৃত্যুকে মাধব বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। তাই বলিয়া এই অনুভূতিও অসম্ভব নয়, অবাস্তব নয়। বৈষ্ণব কবি জীবনমরণের যে সন্ধিক্ষণে মরণেও গোকুলচন্দ্রকে পাওয়া যাইবে বলিয়া মৃত্যুকামনা করিয়াছেন, সেই মাহেন্দ্র মুহূর্তেই রবীন্দ্রনাথের মনে 'মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান' এই একাত্মতাবোধ অসম্ভব কি করিয়া বলিব? বৈষ্ণব কবি মৃত্যুকামনা করিয়াছেন কিন্তু সেই সঙ্গে এই দুঃখও তিনি ভুলিতে পারিতেছেন না যে মৃত্যুকালে একবার দেখিতে পাইলাম না।

হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ।
মরণ সময়ে পিয়ার না দেখিনু মুখ ॥

—গোবিন্দ চক্রবর্তী

এই বড় শেল মোর মরমে রহিল।
মরণ সময়ে তারে দেখিতে না পাইল ॥

—নরোত্তমদাস

বৈষ্ণব কবি মৃত্যুকামনা করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে এই কামনাও করিয়াছেন—

যাঁহা বহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত ॥
যে সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ ॥

এ সখি বিরহ মরণ নিরদন্দ।
ঐছনে মিলই গোকুলচন্দ॥
যো দরপনে পঁহু নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথিমাহ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত॥
যাহা পহুঁ ভরসই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরি।
সো মরকত তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি॥

'বিরহ মরণ নিরদন্দ' এই পাঠের ব্যাখ্যায় শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর বলিতেছেন— 'হে সখি, বিরহে মরণমেব নির্দ্বন্দ্বং নির্ব্বিরোধমিত্যর্থঃ। ঐছনে যেন মরণেন গোকুলচন্দ্র প্রাপ্তির্ভবতি।' অর্থাৎ সখি বিরহে মৃত্যুই নির্বিরোধ, যে মরণে গোকুলচন্দ্রের প্রাপ্তি ঘটে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সময় হইতেই আচার্য-পরম্পরায় এই ভাবের প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। প্রেমের গাঢ়তা ও গভীরতার দিক দিয়া এই অনবদ্য ভাবাম্বুধির পরিমাপ হয় না। শাস্ত্রসম্মত বলিয়াই নহে, হৃদয় দিয়াও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। তথাপি এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে 'মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান' ইহার মধ্যেও অনুভূতির একটা তীব্রতা ও স্বকীয়তা আছে। শ্রীকৃষ্ণবিরহে যেমন মৃত্যুকামনা জাগিয়াছে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে শ্যামের কথাই মনে হইয়াছে। সেই নির্দয় মাধব যদি অকরুণ হয়, ওগো মৃত্যু, তোমার করুণা হইতে তো আমি বঞ্চিতা হইব না। তুমি তো কোন দিন আমাকে ত্যাগ করিবে না, তোমার বিচ্ছেদে এ হৃদয় দীর্ণ হইবে না। শ্যাম আমারই, আমি শ্যামকে জানিয়াছি, আর সেই সঙ্গে ইহাও নিশ্চিত জানিয়াছি, তোমার মধ্য দিয়া আমি তাহাকেই পাইব। আমি অমৃত লাভ করিব। 'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি'; কিন্তু এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে কবির মনেও দ্বন্দ্ব জাগিয়াছে। তিনি বলিতেছেন —'ভানুসিংহ কহে—ছিয়ে ছিয়ে রাধা চঞ্চল হৃদয় তোহারি। মাধব পহুঁ মম পিয় স মরণসে অবতুঁহু দেখ বিচারি॥' কবি এই ভণিতায় বৈষ্ণব কবির চিরাচরিত পন্থাই অনুসরণ করিয়াছেন। ভানুসিংহ বলিতেছেন, 'ছি, ছি রাধা, চঞ্চল তোমার হৃদয়। (বিরহ বিকারে অভিমানেই তুমি এমন কথা বলিতেছ) বিচার করিয়া দেখ, আমার প্রভু মাধব মরণ অপেক্ষাও প্রিয়'। অবশ্য বৈষ্ণব

কবি বলিবেন, যে তাঁহাকে পাইয়াছে তাহার আর মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া, মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমৃতত্ব লাভের প্রয়োজন থাকে না। সাক্ষাদ্দর্শনই অমৃত। যে তাঁহাকে দেখিয়াছে সে এই জীবনেই মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছে। কবিও পরে বহু কবিতায় তাহা বলিয়াছেন।

লক্ষ্য করিবার বিষয় অনেক কবিতায় কবি মৃত্যুকে বঁধুরূপে কল্পনা করিয়াছেন। কবির সুবিখ্যাত কবিতা—'বালিকা বধূ' উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করিতে পারি। বলা বাহুল্য, বৈষ্ণব কবিগণ যাঁহাকে প্রাণপতি বলিয়া বরণ করিয়াছেন, এই কবিতা সেই উপাস্যদেবের উদ্দেশে নিবেদিত হইতে পারে। 'অতিথি', 'নব বেশ', 'মরণ', 'মিলন' কবিতাগুলি আমরা এইভাবেই গ্রহণ করিয়াছি। কবি নিজেও বলিয়াছেন—' "কড়ি ও কোমলে" যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আর-একটি প্রবল প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ।' আমাদের মনে হয়, 'কড়ি ও কোমল' রচনার পূর্বেই ভানুসিংহের পদাবলী রচিত হইয়াছিল এবং কবির জীবনের পথে মৃত্যুর প্রথম আবির্ভাব ঘটে 'মরণ রে তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান' এই কবিতায়।

কবির স্বীকৃত ভানুসিংহের পদাবলীর অপর কবিতা 'কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়'। ধীর সমীরে তরঙ্গায়িত নীলসলিলা যমুনার তটান্তে মিলিত মুকুলিত উপবনে বিকশিত-যৌবনা গোপবধূগণ যাঁহার বেণুগীতে পলকে প্রাণমন খোয়াইয়াছিল সেই অমিয়-গরলে-ভরা হৃদয়বিদারী হৃদয়হারি বংশীধ্বনি কবি শুনিয়াছিলেন। তাই তাঁহার এই ব্যাকুল প্রার্থনা—

> কো তুঁহু কো তুঁহু সব জন পুছয়ি,
> অনুদিন সঘন নয়নজল মুছয়ি,
> যাচে ভানু, সব সংশয় ঘুচয়ি
> জনম চরণ 'পর গোয়॥

ইহজীবনেই সফল হইয়াছিল। তিনি এই জীবনেই চিরসুন্দরের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। কবি এই মিলনের আনন্দ চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। আকুল আবেগে গাহিয়াছিলেন—

এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর, হে সুন্দর!
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর,
সুন্দর, হে সুন্দর ॥
আলোকে মোর চক্ষু দুটি মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি,
হৃদ্‌ গগনে পবন হল সৌরভেতে মন্থর,
সুন্দর, হে সুন্দর।
এই তোমারি পরশরাগে চিত্ত হল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন-সুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি করে নবীন করি লও যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জনমান্তর,
সুন্দর, হে সুন্দর।

ভানুসিংহের পদাবলীর যে কবিতাগুলিকে কবি স্বীকার করেন নাই, তাহার মধ্যেও এমন দুই একটি কবিতা আছে, যাহাদের অস্বীকার করিতে আমাদের দুঃখ ও সঙ্কোচ বোধ হয়। আবার ভানুসিংহের পদাবলীর বাহিরে এমন বহু কবিতা ও গান আছে যাহার কোন কোনটি বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হইবে, কোন কোনটি বা বৈষ্ণব পদাবলীর সমপর্যায়ে স্থান পাইবার যোগ্য। 'শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা নিশীথ যামিনীরে', 'গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে মৃদুল মধুর বংশি বাজে' প্রভৃতি কবিতা আমাদের মিষ্ট লাগে। 'গহন তিমির নিশি ঝিল্লিমুখর দিশি শূন্য কদম তরুমূলে। ভূমি শয়ন'পর আকুল কুন্তল, কাঁদাই আপন ভুলে' চিত্রগুলি মনোহরণ করে।—

মম যৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখি—
সখি, জাগ জাগ।
মেলি রাগ-অলস আঁখি—
অনু রাগ-অলস আঁখি সখি, জাগ জাগ ॥
আজি চঞ্চল এ নিশীথে
জাগ ফাল্গুনগুণগীতে
অয়ি প্রথমপ্রণয়ভীতে,
মম নন্দন-অটবীতে
পিক মুহু মুহু উঠে ডাকি— সখি, জাগ জাগ।

জাগ নবীন গৌরবে,
নব বকুলসৌরভে,
মৃদু মলয়বীজনে
জাগ নিভৃত নির্জনে।
আজি আকুল ফুলসাজে
জাগ মৃদুকম্পিত লাজে,
মম হৃদয়শয়নমাঝে,
শুন মধুর মুরলী বাজে
মম অন্তরে থাকি থাকি— সখি, জাগ জাগ ॥

হৃদয়-শয়নমাঝে এ কাহার মুরলীধ্বনি! আমার অন্তরে থাকিয়া থাকিয়া এ কাহার আহ্বান-গীতি ধ্বনিত হইতেছে, সখি জাগো, জাগো। জ্ঞাতযৌবনা নায়িকার এই অপূর্ব পূর্বরাগ একমাত্র বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গেই তুলনীয়।

সেদিন তিনি উতল আবেগে গাহিয়াছিলেন—

মরি লো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে ॥
ভেবেছিলাম ঘরে রব, কোথাও যাব না—
ওই-যে বাহিরে বাজিল বাঁশি, বল কী করি ॥
শুনেছি কোন্ কুঞ্জবনে যমুনাতীরে
সাঁঝের বেলা বাজে বাঁশি ধীর সমীরে—
ওগো তোরা জানিস্ যদি সখি আমায় পথ বোলে দে ॥
দেখি গে তার মুখের হাসি,
তারে ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
তারে বলে আসি 'তোমার বাঁশী
আমার প্রাণে বেজেছে' ॥

গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ মধ্যাহ্নে দিগন্তবিসারী তপ্ত ধূলি-পথের যাত্রিণী পসারিনিকে কবি বলিতেছেন—

ওগো পসারিনি, দেখি আয়
কী রয়েছে তব পসরায়।
এত ভার মরি মরি কেমনে রয়েছ ধরি,
কোমল করুণ ক্লান্তকায়!

এই পসারিনি জ্ঞানদাসের পসারিনিকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

আমার মন মানে না—দিনরজনী।
আমি কী কথা স্মরিয়া এ তনু ভরিয়া পুলক রাখিতে নারি।
ওগো কী ভাবিয়া মনে এ দুটি নয়নে উথলে নয়নবারি—
ওগো সজনি ॥
... ...
আমি এ কথা, এ ব্যথা, সুখব্যাকুলতা কাহার চরণতলে
দিব নিছনি ॥

'দিবস রজনী আমি যেন কার আশার আশায় থাকি?' 'ঐ বুঝি বাঁশী বাজে, বন মাঝে কি মন মাঝে', 'ও গো শোন কে বাজায়,' 'এখনো তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশী শুনেছি' প্রভৃতি গান দরদীর মুখে শুনিলে নূতন-পুরাতনের প্রশ্ন উঠে না, মনে রচয়িতার সম্বন্ধে অনুসন্ধান জাগে না।

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন
আকুল নয়ন রে।
কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে
কুসুম চয়ন রে।
... ...
এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া,
মরিব কাঁদিয়া রে।
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব
সাধিয়া সাধিয়া রে।
... ...
আমি সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা
প্রভাতে চরণে ঝরিব,
ওগো, আছে সুশীতল যমুনার জল,
দেখে তারে আমি মরিব ॥

প্রভৃতি কবিতায় কবির নিজস্ব সুর মর্ম স্পর্শ করে।

(১) আজ আসবে শ্যাম গোকুলে ফিরে।
আবার বাজবে বাঁশি যমুনাতীরে ॥
আমরা কী করব। কী বেশ ধরব।
কী মালা পরব। বাঁচব কী মরব সুখে।
কী তারে বলব। কথা কি রবে মুখে।

শুধু তার মুখপানে চেয়ে চেয়ে
দাঁড়ায়ে ভাসব নয়ননীরে ॥

(২) বাজিবে, সখী, বাঁশি বাজিবে—
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।
বচন রাশি রাশি কোথা যে যাবে ভাসি,
অধরে লাজহাসি সাজিবে ॥
নয়নে আঁখিজল, করিবে ছলছল,
সুখবেদনা মনে বাজিবে।
মরমে মুরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া
সেই চরণযুগরাজীবে ॥

প্রভৃতি গান ভাবসম্মিলনের গানরূপে গ্রহণ করা চলে।

রবীন্দ্রনাথ পৃথক পথের যাত্রী। রবীন্দ্রনাথের সাধনাও রসভাবের সাধনা এবং সে সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ; তথাপি বৈষ্ণব কবিগণের সঙ্গে তাঁহার সাধনার পার্থক্য আছে। বাল্যকাল হইতেই এই বিশ্বদৃশ্য রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এই ভুবনকে তিনি সুন্দররূপেই দেখিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বের মধ্য দিয়াই বিশ্বরূপের অনুভূতি লাভ করিয়াছেন। এই সুন্দর ভুবনের সৌন্দর্যই তাঁহাকে চিরসুন্দরের পদপ্রান্তে পৌছাইয়া দিয়াছিল। কত রূপে তিনি তাহাকে আস্বাদন করিয়াছেন। অনুভূতি যেমন বিচিত্র, সুবিচিত্র তেমনই তাহার প্রকাশ। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতিভাবের উপাসক এবং রসস্বরূপ স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবিগণের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য, বৈষ্ণব কবিগণ সর্বাগ্রে বিশ্বরূপেরই দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। সেই রূপ তাঁহাদের নয়নে লাগিয়াছিল এবং এই রূপের আলোকেই বিশ্বের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় ঘটিয়াছিল। উপলব্ধির পার্থক্যের সঙ্গে তাহার প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য স্বাভাবিক।

ভাবের বাজারে রসের কারবারে আমি জাতিভেদ মানি না। রস বিশ্লেষণে ভেদবাদ আমি অপরাধ বলিয়াই মনে করি। কিন্তু অধিকারীভেদের কথা আমি অস্বীকার করি না। রবীন্দ্রকাব্যের রসাস্বাদনে আমার কতটুকু অধিকার আমি তাহা জানি। তথাপি যে এই অনধিকার চর্চা করেতেছি, রবীন্দ্রকাব্যের অসাধারণ মাধুর্যই তাহার কারণ। কিন্তু সেই বহুবিচিত্র কবিতা ও গীতাবলীর আলোচনার দিঙনির্ণয়ও আমার সাধ্যাতীত। মূলধনও আমার যৎসামান্য। দুই চারিটি কবিতা ও গান মাত্র আমার সম্বল।

হে দেব হে দয়িত হে জগদেকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥

বলিয়া যাঁহাকে দেখিবার আকুল আকাঙ্ক্ষায় বৈষ্ণব কবি প্রার্থনা জানাইয়াছেন, কবির ভাষায় আমি তাঁহাকেই আহ্বান করিতেছি। এদেশে তো আসিয়াছিলে বন্ধু, আর একবার এস।

এসো এসো ফিরে এসো, বঁধু হে ফিরে এসো।
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত, নাথ হে, ফিরে এসো।
ওহে নিষ্ঠুর ফিরে এসো,
আমার করুণকোমল এসো,
আমার সজলজলদস্নিগ্ধকান্ত সুন্দর ফিরে এসো,
আমার নিতিসুখ ফিরে এসো,
আমার চিরদুখ ফিরে এসো।
আমার সবসুখদুখমন্থনধন অন্তরে ফিরে এসো।
আমার চিরবাঞ্ছিত এসো,
আমার চিতসঞ্চিত এসো,
ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন, ভুজ-বন্ধনে ফিরে এসো।
আমার বক্ষে ফিরিয়া এসো,
আমার চক্ষে ফিরিয়া এসো,
আমার শয়নে স্বপনে বসন ভূষণে নিখিল ভুবনে এসো।
আমার মুখের হাসিতে এসো,
আমার চোখের সলিলে এসো,
আমার আদরে আমার ছলনে আমার অভিমানে ফিরে এসো।

রাজার দুলাল যাবে আজি মোর

শুভক্ষণ বার বার আসে না। কাহারও ভাগ্যে একেবারেই আসে না। আবার কাহারও অদৃষ্টে একবার মাত্রই আসে। ক্ষণপ্রভার মতই স্থিতিকাল, কিন্তু প্রভাব তাহার অসামান্য। ক্ষণপুণ্যে পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, আবার ক্ষণদোষে মহাশক্তিমান্ চিরতরে অতলে তলাইয়া যায়। কানায় কানায় পূর্ণ জীবনধারাও মরুপথে দিশাহারা হইয়া পথ হারাইয়া ফেলে। আবার ক্ষুদ্র অববাহিকা সাগরবক্ষে আত্মসমর্পণ করিয়া সার্থক হইয়া উঠে। 'ক্ষণমিহ'—এই জনমেই জন্মান্তর ঘটায়, যুগ-পরিমাণকে কুক্ষিগত করে। ক্ষণপরিচয়েই চিরঅপরিচিত প্রিয়তম হয়, ক্ষণের দোষেই মিত্রও শত্রু হইয়া দাঁড়ায়।

কখনও কখনও প্রিয়দর্শনের মাহেন্দ্রলগ্নের প্রতীক্ষা করিতে হয়। শুভক্ষণের সাধনা করিতে হয়। বন্দনীয় শুভক্ষণের কথায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীমহাপ্রভুর উক্তি উদ্ধার করিয়াছেন—

পুন যদি কোন ক্ষণ করায় কৃষ্ণ দরশন
তবে সেই ঘটি ক্ষণ পল।
দিয়া মাল্যচন্দন নানা রত্ন আভরণ
অলঙ্কৃত করিমু সকল॥

কবি জয়দেব প্রিয়দর্শনের বর্ণনা করিয়াছেন—

লক্ষ্মীকেলি ভুজঙ্গ জঙ্গম হরে, সংকল্প কল্পদ্রুম।
শ্রেয়ঃ-সাধক-সঙ্গ সঙ্গরকলাগাঙ্গেয়, বঙ্গপ্রিয়।
গৌড়েন্দ্র প্রতিরাজ-রাজক-সভালঙ্কার কারার্পিত-
প্রত্যর্থিক্ষিতিপাল, পালকসতাং দৃষ্টোঽসি তুষ্টাবয়ম্॥

'রাজলক্ষ্মীর ক্রীড়ানায়ক, জঙ্গমহরি, প্রার্থীগণের কল্পতরু, শ্রেয় সাধকগণের সঙ্গী, সমরকুশলতায় ভীষ্ম, সামন্তরাজ-সভার অলঙ্কার, প্রতিস্পর্ধী ক্ষিতি-পালগণকে কারাগারে নিক্ষেপকারী হে গৌড়েশ্বর তোমাকে দর্শন করিয়াই পরিতুষ্ট হইলাম।' এমন সর্বগুণালঙ্কৃত রাজাধিরাজের নিকটে কোন কামনা নাই, প্রার্থনা নাই।

শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে কংসযজ্ঞে আহূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ মথুরার রাজপথে পদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণ-দর্শনার্থিনী পুরকামিনীগণের ব্যাকুলতার বর্ণনা আছে। কেহ বিপরীত ভাবে বস্ত্রালঙ্কার পরিয়াই প্রাসাদে উঠিতে লাগিলেন। কেহ এক পদে নূপুর দিয়া, কেহ এক হস্তে বলয় পরিয়া,

কেহ এক কর্ণে পত্র রচনা করিয়া, কেহ এক নয়নে অঞ্জন আঁকিয়া বাতায়ন সমীপে উপস্থিত হইলেন। ইহা কৌতূহলপূর্ণ ব্যগ্রতা ভিন্ন অপর কিছু নহে। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী উদ্ধব-সন্দেশে ইহারই সংক্ষিপ্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ,আমি যখন মথুরার রাজপথে অগ্রসর হইতে-ছিলাম, তখন আমাকে দেখিয়া মথুরার পুরললনাগণ একজন আর একজনকে বলিতেছিলেন—

আরূঢ়স্তে নয়নপদবীং তন্বি ধন্যাসি সোঽয়ম্
গোপীনগ্নীকরণ মুরলী কাকলীকঃ কলাবান্।
ইত্যালাপ স্ফুরিতবদনৈর্যত্র নারীকদম্বৈঃ
দৃগ্‌ভঙ্গীভিঃ প্রথমমথুরাসঙ্গমে চুম্বিতোঽস্মি॥

যাঁহার মুরলীগানে গোপীগণের নীবিগ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িত, সেই কলা-নিপুণ কৃষ্ণকে তুমি সাক্ষাৎ দর্শন করিলে, সখি, তুমিই ধন্যা। ইহার মধ্যে অবশ্য একটা বৈশিষ্ট্য আছে।

মহাকবি কালিদাস অভিমত-দর্শনে ব্যগ্র-কৌতূহলের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন কুমারসম্ভবে এবং রঘুবংশে। মহাদেব গিরিরাজ-তনয়ার পাণিগ্রহণের জন্য ওষধিপ্রস্থের তোরণদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া হিমাচলের পুরনারীগণ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন 'বর' দেখিবার জন্য। আর স্বয়ম্বরসভায় ইন্দুমতীকে লাভ করিয়া যুবরাজ অজ বধূ-সঙ্গে সভাক্ষেত্র হইতে ভোজ-রাজভবনে যাত্রা করিতেছেন, বরবধূকে দেখিবার জন্য বিদর্ভের পুরকামিনীগণ চঞ্চলপদে বাতায়নে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। কুমারসম্ভব এবং রঘুবংশের বর্ণনা প্রায় একই প্রকার। ইহার মধ্যে বিশেষ বৈচিত্র্য নাই। চিত্রটি এইরূপ—

দ্রুতপদে অগ্রসর হইবার সময় কোন রমণীর কেশকলাপের বন্ধন খুলিয়া গেল, মাল্যদাম কবরীভ্রষ্ট হইল, কাহারও বসনগ্রন্থি খসিয়া পড়িল। তাহারা কেশকলাপ, মাল্যদাম এবং নীবির ডোর মুঠিতে ধরিয়াই গবাক্ষপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পরিচারিকা কাহারও চরণাগ্র মাত্র অলক্তকে রঞ্জিত করিয়াছিল। ব্যস্ততা বশত সুন্দরী চরণাকর্ষণ পূর্বক চলিতে চলিতে বাতায়ন পর্যন্ত পথ অলক্তকে আরক্ত করিয়া তুলিলেন। কেহ দক্ষিণ নয়নে অঞ্জন দিয়াছিলেন, এখন বাম নয়নে অঞ্জন না দিয়া তুলিটি হাতে লইয়াই বাতায়নের সমীপবর্তিনী হইলেন। কোন বিলাসিনী রসনাদাম গাঁথিতেছিলেন, গ্রন্থন অর্ধসমাপ্ত রাখিয়াই অগ্রসর হইলেন। সত্বর উত্থানে অঞ্চলস্থিত মণিগুলি ছড়াইয়া পড়িল। আর দ্রুতগমনে

সূত্রে গ্রথিত মণিমালা বিগলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি যখন বাতায়নে গিয়া দাঁড়াইলেন তখন জানিতেও পারিলেন না হস্তে মণিহীন-সূত্র মাত্র অবশিষ্ট আছে। (রঘু, ৭ম সর্গ) মুরলীগীতি-বিবশা গোপবধূগণ যখন অভিসারে গমন করিতেন, তখন তাহাদের প্রসাধনে বিপর্যয় এবং ভূষণবিন্যাসে বৈপরীত্য ঘটিত। কিন্তু সে এক স্বতন্ত্র অবস্থা। এতক্ষণ যাহা যাহা বলিলাম রবীন্দ্রনাথের 'শুভক্ষণে'র সঙ্গে যে সমস্ত কথার কোন সম্বন্ধ বা সাদৃশ্য নাই। এই বিবরণ আমার বক্তব্যের পশ্চাৎপট রূপেই উপস্থাপিত করিলাম।

রবীন্দ্রনাথের মানসী সুমধ্যমা কিছুদিন হইতেই শুনিতেছিলেন—যুবরাজ এই পথেই শুভ বিজয়-যাত্রায় গমন করিবেন। এইমাত্র সুনিশ্চিত সংবাদ পাইলেন—

'রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখ পথে', সুতরাং তাহাকে প্রস্তুত হইতেই হইবে, যেন অবিন্যস্ত বেশবাসে প্রিয়দর্শনে ব্যস্ত হইতে না হয়। শুভ লগ্ন বহিয়া না যায় ; সেজন্য যেমন তাহাকে অতন্দ্র থাকিতে হইবে, তেমনই সে সুসজ্জিতা হইয়াই অভীষ্টের প্রতিক্ষায় রহিবে। তখনও রজনী প্রভাত হয় নাই, সবেমাত্র বিহগ-কলকণ্ঠে উষার আগমনী গীতি ধ্বনিত হইতেছে। নব বিকশিত কুসুমবাস শিশিরস্নাত মন্দপবনে ভাসিয়া আসিতেছে। কুমারী যেন নূতনরূপে আপনাকে আবিষ্কার করিলেন। অঙ্গসজ্জার এই তো শুভ সুযোগ। গৃহে তখনও জননী ভিন্ন আর কাহারও নিদ্রালস্য অপগত হয় নাই। তাই তিনি জননীকে ডাকিয়াই বলিলেন—মা, 'এ প্রভাতে গৃহকাজ লইয়া তো থাকিতে পারিব না। বলিয়া দাও আমাকে কোন্ সাজে সাজিব, কি ছান্দে কবরী বাঁধিয়া লইব, অঙ্গে কেমন ভঙ্গীতে কোন্ বরণের বসন পরিধান করিব ?' জননী অবাক হইয়া কন্যার পানে চাহিলেন। জননীও যুবরাজের আগমন-বার্তা শুনিয়াছিলেন, সুতরাং কন্যার ব্যাকুলতা অনুমান করিতে পারিলেন। যেন বলিতে চাহিলেন—সে যে এক বিরাট ব্যাপার, বাছা। এক সুসজ্জিত সুশৃঙ্খল, সুবৃহৎ শোভাযাত্রার মাঝখানে যুবরাজের স্বর্ণরথ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইবে। কত সামন্ত, কত সেনাপতি, কত সৈন্য, কত অশ্ব, কত হস্তী, কত অর্থী, কত প্রার্থী, সে যে এক বিপুল সমারোহ। সেই অসংখ্য জনসংঘট্টের মাঝখানে থাকিয়া কোথাকার এক অজ্ঞাতকুলশীলা বাতায়নবর্তিনী তোমাকে তিনি কি দেখিতে পাইবেন ? তবে কেন তুমি অকারণ সাজিবার আবদার ধরিয়াছ ?

কন্যা চাহনি দেখিয়াই জননীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বলিলেন—

আমি দাঁড়াব যেথায় বাতায়নকোণে
সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে,
ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ,
যাবে সে সুদূর পুরে ;—
শুধু সঙ্গের বাঁশি কোন্ মাঠ হতে
বাজিবে ব্যাকুল সুরে।
তবু রাজার দুলাল যাবে আজি মোর-ঘরের সমুখপথে,
শুধু সে নিমেষ-লাগি না করিয়া বেশ রহিব বলো কী মতে !

মা, আমি তো জানি সে আমায় দেখিতে পাইবে না। দেখিবে না, কিন্তু আমি যে তাহাকে দেখিব। নিজে সুন্দর না হইয়া কাহারও কি চিরসুন্দরকে দেখিবার অধিকার আছে? যদি বল তাঁহার সঙ্গের অগণিত সঙ্গী-সঙ্গিনী, যাহারা তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিবে—পথের দুই পার্শ্বের প্রতীক্ষা-সমুৎসুক সেই কাতারে কাতারে নরনারী তাহারা কি সকলেই সুসজ্জিতা, সকলেই সুবেশা? মা, উহাদের সঙ্গে একাসনে বসাইয়া আমাকে দেখিও না। যাহার যেমন রুচি, যাহার যেমন সঙ্গতি, যাহার যেমন অধিকার, যাহার যেমন অধিষ্ঠানভূমি। তোমাকে স্পষ্টই বলিতেছি আমি নিজে সুসজ্জিতা না হইয়া তাহাকে দেখিতে পারিব না।

এই যে বহিরঙ্গ সজ্জার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা, ইহা শোভন অন্তঃকরণেরই বহিঃ-প্রকাশ। অন্তর নির্মল এবং পবিত্র না হইলে, ভাবাঢ্য না হইলে, প্রেম-পরিপ্লুত না হইলে, নবানুরাগে সমলঙ্কৃত না হইলে দেহপ্রসাধনের এই আকুতির এমন দুর্বার অভিব্যক্তি দেখিতে পাইতাম না। কবি তাঁহার মানসীর অন্তরলোকের সাজসজ্জার কোন পরিচয়ই প্রদান করেন নাই। কিন্তু কুমারী যেভাবে আপন দেহকে সাজাইবার জন্য অসংবৃত আবেগে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতেই তাহার হৃদয়সৌন্দর্য চর্মচক্ষেই দেখিতে পাইয়াছি।

ব্রজগোপীর স্বদেহ পরিতর্পণের সঙ্গে রবীন্দ্র-মানসীর প্রসাধনপারিপাট্য-বিধানসাধনের পার্থক্য আছে। ব্রজকিশোরী সুদৃঢ় নিশ্চয়তার সঙ্গেই জানিতেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিবেন, কৃষ্ণের স-প্রেম দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবেই। ব্রজগোপী যেমন কৃষ্ণকে দেখিতে আসিতেন, তেমনই দেখা দিতেও আসিতেন। কৃষ্ণকে দেখাইবার জন্যই তাহার নিজ দেহের মার্জনে মণ্ডনে এত আসক্তি। সুন্দর বসনভূষণের প্রতি এত অনুরক্তি। 'এই দেহ কৈনু আমি

কৃষ্ণসমর্পণ', 'কৃষ্ণ আমাকে দেখিয়া, আমার সজ্জা দেখিয়া আনন্দিত হন', তাই গোপীর এত সাজিবার সাধ। কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা। এখানকার পরিবেশ তিনি দেখিবেন না, কিন্তু আমি দেখিব। ইহারই নাম সৌন্দর্য-সাধনা, চিরসুন্দরকে দর্শনের ইহাই তপস্যা 'রম্যা কাচিদুপাসনা'! এ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ অদূরবর্তী। অচিরেই এই বেশবিন্যাস সার্থকতা লাভ করিবে।

রাজার দুলাল আসিলেন, চলিয়া গেলেন। সেই ক্ষণমধ্যেই অসম-সাহসিনী রাজনন্দন-দর্শনার্থিনী এক অভাবনীয় কাণ্ড করিয়া বসিলেন। হয়ত কোন একজনকে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না। তাই অন্তরঙ্গা জননীকেই বলিলেন—

ওগো মা, রাজার দুলাল গেল চলি মোর ঘরের সমুখপথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার স্বর্ণশিখর রথে।
ঘোমটা খসায়ে বাতায়ন থেকে
নিমেষের তরে নিয়েছি, মা, দেখে—
ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার পথের ধুলার 'পরে।
মা গো, কি হল তোমার, অবাক নয়নে চাহিস কিসের তরে?
মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয়নি কুড়ায়ে,
রথের-চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে,
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে পড়ে আছে শুধু আঁকা।
আমি কি দিলাম কারে জানে না সে কেউ, ধুলায় রহিল ঢাকা।
তবু রাজার দুলাল গেল চলি মোর ঘরের সমুখপথে—
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া রহিব বলো কী মতে॥

মা, শোন। রাজার দুলাল আমার ঘরের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন। প্রভাতের অমল আলো তাঁহার রথের স্বর্ণচূড়ায় ঝলকিয়া উঠিল। আমি ঘোমটা খসাইয়া বাতায়নে দাঁড়াইয়া নিমেষের তরে তাঁহাকে দেখিয়া লইয়াছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বস্তু,—আমার সর্বস্ব, আমার বক্ষের মণিহার হৃদয় হইতে উঘারিয়া লইয়া তাঁহার পথের ধুলার উপর ফেলিয়া দিয়াছি। ও-কি! অমন অবাক নয়নে আমার মুখপানে চাহিতেছ কেন? আমি কী দিলাম, কাহাকে দিলাম, কেন দিলাম কেহ জানিল না। আমার হার-ছেঁড়া মণি কেহ কুড়াইয়াও লইল না।—কেবল তুমি আর আমি; তৃতীয় ব্যক্তি

কস্মিন্‌কালেও ইহার সন্ধান পাইবে না। তোমাকেও বলিতাম না। আমার শূন্য বক্ষ দেখিয়া কিংবা যে অসহ আনন্দের আভাস আমার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, মুখ দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিয়া হয়ত এখনই কারণ জিজ্ঞাসা করিতে, তাই তোমাকে বলিলাম।

মা, আজ আমার আনন্দের অবধি নাই। যে রথে চড়িয়া রাজার দুলাল যাইতেছিলেন, আমার বক্ষের মণিহার যে সেই রথের চাকার তলায় গুঁড়া হইয়া পথের ধুলায় মিশিয়া গেল, ইহাতেই আমি ধন্যা হইয়াছি, কৃতকৃত্যা হইয়াছি। যুবরাজের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত উৎসর্গীকৃত আমার মণিহার সার্থকতা লাভ করিয়াছে। মা, আমারই ঘরের সম্মুখ দিয়া যুবরাজ যখন চলিয়া গেলেন, তখন আমি কি বক্ষের মণিহার ছিঁড়িয়া না ফেলিয়া দিয়া থাকিতে পারি?

'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা' উপনিষদের এই মহাবাণীর আধারে কি এই কবিতা ব্যাখ্যাত হইতে পারে? ত্যাগের আত্মসুখ-কামনাহীন আত্মদানের ইহাই চরম ও পরমতম রূপ, এই কথা বলিলেই কি এই কবিতার নিগূঢ় ব্যঞ্জনা বোধগম্য হয়? আমার মনে হয় এই ত্যাগই পরমাপ্রাপ্তির অনাস্বাদিত-পূর্ব আনন্দে সফল হইয়া উঠিয়াছে গোপীগণের কৃষ্ণসঙ্গ-সুখে। পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে রসস্বরূপের সঙ্গে মিলনে! সর্বস্ব-সমর্পণের পরিনামে!!

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব মহাজনগণের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী। বোধ হয় তিনিই শেষ মহাজন। তাঁহার কবিতার মর্মগ্রহণ আমার সাধ্যের অতীত। বুদ্ধি দিয়া অথবা অন্তর দিয়া—কোন দিক দিয়াই রবীন্দ্র-কবিতাকে আমি ঠিকমত ধরিতে পারি না। তথাপি রবীন্দ্র-বাণী আমাকে অভিভূত করে। এক নূতনতম অনুভূতিতে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। কালিদাসের কবিতা, বৈষ্ণবমহাজন-গণের পদাবলী আমাকে যে আনন্দ দান করে, রবীন্দ্রনাথের কবিতাপাঠের আনন্দ তাহারই সমগোত্র, ইহা আমি বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু বুঝাইবার ভাষা খুঁজিয়া পাই না, সে আনন্দ বাহিরে প্রকাশ করিতে পারি না।

মহারাসের শেষে আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ মহাভাবময়ী প্রিয়তমাকে এবং তাহার কায়ব্যূহস্বরূপা সখীগণকে যাহা বলিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের মানসীও আপন অন্তরদেবতার নিকট নিশ্চয়ই সেই প্রশস্তিবাক্য পুনরায় শুনিয়াছেন—

যাংবৃশ্চত্যাম্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

শরৎ-সাহিত্যে পরকীয়াবাদ

শরৎচন্দ্রের পরিচয় নয়, নাম জানিতে পারি সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত 'কাশীনাথ' গল্প পড়িয়া। গল্পটি দুই সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল। তাহার পূর্বে আমি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামও শুনি নাই। সে আজ কত দিনের কথা। তখন কি-ই বা বুঝি। তথাপি গল্পটা কিন্তু খুবই ভাল লাগিয়াছিল।

ভারতবর্ষের অনুষ্ঠান-পত্রে শরৎচন্দ্রের ছবি দেখিয়াছিলাম। মুখে দাড়ি-গোঁফ ছিল। কিন্তু কি উজ্জ্বল দুটি চোখ। মনে হইল এ হেন চক্ষুষ্মান অনেক কিছুই দেখিতে পান, দেখিতে জানেন। অথচ কেমন যেন উদাসীন। বহুদিন পরে ২০১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ভারতবর্ষের পুরানো বাড়ীতে সেই দুটি চোখের সঙ্গে চোখোচোখি হইয়া গেল। জলধরদার ঘরটিতে বসিয়া ছিলেন। গোঁফ-দাড়ি ফেলেন নাই। জলধরদা পরিচয় করাইয়া দিলেন। একদিন বাজেশিবপুরের বাসায় গিয়াও দেখা করিয়াছিলাম।

'পথের দাবী' পড়িয়াও আর একদিন পানিত্রাসে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ততদিনে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে। দেখিলাম পরনে একখানি তসর কেটের কাপড়, খালি গায়ে বসিয়া আছেন, অর্থাৎ গায়ে জামা নাই। কাপড়ের খুঁট গায়ে জড়ান। গলায় তুলসীর মালা। দুপুরে খাইতে বসিলাম—সম্পূর্ণ নিরামিষ। একটি পাথরের থালায় অন্নব্যঞ্জন সাজান। উপরে তুলসীর পাতা। বলিলেন, প্রসাদ খাও হে। বাড়ীতে বিষ্ণু আছেন, নিজের হাতে পূজা করি, অন্নের ভোগ হয়। খাওয়ার বৈশিষ্ট্য দেখিলাম, একটা পাথরবাটীতে খানিকটা দই, তার উপরে মাঝারি আকারের একখানি বাতাসা। দইয়ের বাটিতেও তুলসীপত্র ছিল।

আমার বিশ্বাস শরৎচন্দ্র মনে প্রাণে বৈষ্ণব ছিলেন। ব্রজের পরকীয়া ভাব তাঁহার সর্বান্তঃকরণে মাখান ছিল। 'শ্রীকান্তের' দ্বারিক দাসের আখড়ার কথা আর একদিন আলোচনা করিব। আজ 'বিন্দুর ছেলে' হইতে উদাহরণ দিব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন,—

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।

আচার্যগণ বলেন, নন্দালয়ে যমজ পুত্র-কন্যা আবির্ভূত হইয়াছিলেন—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং যোগমায়া একানংশা। নন্দ-নন্দন দ্বিভুজ মুরলীধর, কংস-

কারাগারে যিনি আসিয়াছিলেন তিনি চতুর্ভুজ। শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণে নন্দাত্মজ-রূপে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ আছে। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-নন্দন, যশোদার দুলাল। অথচ লোকে জানে শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-যশোদার পালিত পুত্র। নন্দ-যশোদার অহৈতুকী বাৎসল্য, এই স্বার্থগন্ধহীন অনাবিল মাতৃস্নেহ জগতে দুর্লভ। শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি শ্রীরাধা। কিন্তু তিনিই ভালবাসার আদর্শ স্থাপনের জন্যে সজ্ঞানে সংসার কুলশীল ত্যাগ করিয়া মাত্র ভালবাসিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণে সর্বস্ব ও সর্বাঙ্গ সমর্পণ করিয়াছিলেন। অন্তরে তাঁহার নিজ সুখের লেশমাত্রও কামনা ছিল না। শরৎচন্দ্র এই ভাবেরই ভাবুক ছিলেন।

বিন্দুর ছেলের আরম্ভটা এইরূপ: 'যাদব মুখুজ্জে ও মাধব মুখুজ্জে যে সহোদর ছিলেন না, সে কথা নিজেরা তো ভুলিয়াই ছিলেন, বাহিরের লোকেও ভুলিয়াছিল। দরিদ্র যাদব অনেক কষ্টে ছোট ভাই মাধবকে আইনপাশ করাইয়াছিলেন এবং বহু চেষ্টায় ধনাঢ্য জমিদারের একমাত্র সন্তান বিন্দুবাসিনীকে ঘরে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বিন্দুবাসিনী অসামান্যা রূপসী। প্রথম যেদিন সে এই অতুল রূপ ও দশ সহস্র টাকার কাগজ লইয়া ঘর করিতে আসিয়াছিল সেদিন বড় বৌ অন্নপূর্ণার চোখে আনন্দাশ্রু বহিয়াছিল। অল্পদিনেই কিন্তু বিন্দুকে লইয়া সংসারের সকলেই বিব্রত হইয়া উঠিলেন। বড় বৌ স্বামীকে বলিলেন—এ কেউটে সাপ। মাধব অনুযোগ করিলেন টাকাটাই কি দাদার বেশী হল? যাদব কিন্তু হাল ছাড়িলেন না। ছোট বৌ-এর ফিটের ব্যামো ছিল। দেখিলে সকলেই ভয় পাইত। একদিন এমনই ফিটের সময় বড় বৌ দেড় বছরের ঘুমন্ত ছেলে অমূল্যকে বিন্দুর কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া পলাইয়া গেলেন। অমূল্য কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বিন্দু প্রাণপণ বলে নিজেকে সংবরণ করিয়া মূর্ছার কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ছেলে বুকে করিয়া ঘরে চলিয়া গেল। অন্নপূর্ণা আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিলেন এবং ফিটের ব্যামোর এই অমোঘ ঔষধ আবিষ্কার করিয়া পুলকিত হইলেন। অমূল্য বিন্দুরই ছেলে হইয়া উঠিল। সে মাকে দিদি এবং বিন্দুকে ছোট মা বলিতে শিখিল।' অমূল্যকে কেন্দ্র করিয়া 'বিন্দুর ছেলে' গল্পটি জমাট বাঁধিয়া উঠিল।

সংসার-জ্ঞানহীনা যুবতী পিত্রালয়ে জনক-জননীর স্নেহে বর্ধিতা, শ্বশুরালয়ে দেবোপম ভাসুরের অকৃত্রিম স্নেহ, বড় জায়ের প্রীতি-কৌতুক-মিশ্রিত প্রশ্রয় এবং স্বামীর বহিঃপ্রকাশের আড়ম্বরবর্জিত ভালবাসার বর্মবেষ্টনীর নিরাপদ আশ্রয়ে থাকিয়া অমূল্যকে লইয়া মাতিয়া উঠিল। অমূল্যই তাহার ধ্যান-জ্ঞান, অমূল্যই

তাহার প্রধান অবলম্বন। অমূল্যর খাওয়া, শোয়া, অমূল্যর শিক্ষা, অমূল্যর ভবিষ্যত-চিন্তা সবরকমেরই মোটামুটি একটা কাঠামো তৈরী করিয়া বিন্দু সেই অনুসারেই চলিতে লাগিল। ঠিক সময়ে অমূল্যর দুধ না পাইলে সে রাগিয়া উঠে। পাছে অমূল্য খারাপ ছেলের সঙ্গে মেশে, সেই চিন্তায় সে সন্ত্রস্ত হয়। অপর ছেলের সঙ্গে একটু দূরে পাঠশালায় পাঠাইতে তাহার মন সরে না। সেই যশোদা-জননীর আশঙ্কার ছায়া। গোষ্ঠে তো বহু রাখালই যায়। কিন্তু তাহার গোপাল তো বহুর দলের কেহ নহে। বনের পথে তৃণ-কুশাঙ্কুর আছে, বন্যজন্তু আছে, গোপাল রোদে ঘুরিয়া বেড়াইবে সে ভয় আছে, ক্ষুধায় কাতর হইলে পাছে সময়ে না খায় সে দুশ্চিন্তা আছে।

অন্য ছেলেরা অমূল্যকে মারিতে পারে। এমন কি চোখ কানাও করিয়া দিতে পারে, এমনই কাল্পনিক কত চিন্তা বিন্দুর। অন্নপূর্ণা মা হইয়াও এমন চিন্তা মনেও স্থান দিতে পারেন না, সে কথা জানাইয়া দিয়াছেন। তথাপি বিন্দুর মন মানে না। পাঠশালাটা শেষে তাহাদের বাহিরের ঘরেই স্থাপিত হইল।

যাদবের ভগিনী এলোকেশী এবং এলোকেশীর পুত্র নরেনকে লইয়াও কত অশান্তি। স্বচ্ছন্দ-পথচারিণী স্রোতোস্বিনী যেখানেই বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই খানেই ফুলিয়া ফুঁসিয়া উঠিয়াছে। ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করিয়াছে।

গোড়াতেই আমি যশোদা-জননীর কথা বলিয়াছি। মা তাঁহার আদরের দুলালকে উদুখলে বাঁধিয়াছিলেন। বিন্দুও অমূল্যকে মারিয়াছে। না খাইতে দিয়া ঘরে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

একটি ছবি! টুকরা কথায় আঁকা, এত জীবন্ত যে মনে হয় তুলিয়া দেখাই। বিন্দুর সঙ্গে অন্নপূর্ণার, বিন্দুর সঙ্গে যাদবের মাধবের এবং এলোকেশীর ও নরেনের কথোপকথনগুলি যেমন উজ্জ্বল তেমনই সুন্দর, যেমন মধুর তেমনই মনোহারী; যেমন তীক্ষ্ণ তেমনই তপ্ত। এক-একটি কথা যেন লাবণ্য-ললিত নিটোল মুক্তা। আর গাঁথনী—একটিকে সরাইয়া অন্য একটি বসাইতে গেলেই মালাখানি শ্রীহীন হইয়া পড়িবে।

একদিন অমূল্যর পোষাক পরানো লইয়া মাধবের সঙ্গে, আর একদিন থ্যামটার নাচ দেখার প্রসঙ্গে অন্নপূর্ণার সঙ্গে, আর একদিন অমূল্যর জামার পকেটে সিগারেটের টুকরা দেখিয়া উদ্দেশ্যে এবং সাক্ষাতে অনুপস্থিত নরেন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে বিন্দুর অশোয়াস্তি এবং ক্রোধ যখন প্রায় মাত্রা ছাড়াইবার পথ ধরিয়াছে, সেই সময় একটা ঘটনায় এই ক্রোধাগ্নিতে পূর্ণাহুতি

নিক্ষিপ্ত হইল। কতকগুলি ছাত্র এক উড়েমালীর বাগানে গাছ ভাঙ্গে, তাকে মারে, আম চুরি করে; মালী হেডমাস্টারকে জানায়। হেডমাস্টার ছেলেদের দশ টাকা জরিমানা করেন। দলে অমূল্যও ছিল, তাহার ভাগে দুই টাকা পড়িয়াছিল। টাকাটা বিন্দুকে না জানাইয়াই অন্নপূর্ণা দিয়াছেন। সমস্ত শুনিয়া বিন্দু কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ফেলিল, ইতিপূর্বে যাদব একবার এবং অন্নপূর্ণা আর একবার অমূল্যর হইয়া বিন্দুর নিকট মার্জনা চাহিয়াছিলেন। সুতরাং আজ আর বিন্দুর কথায় কোন সংযম রহিল না। দুইটা টাকা দিদি কেন দিয়াছে, কাহার টাকা দিয়াছে, কাহার টাকায় দিন চলিতেছে, কথায় কথায় এই সব কথা বিন্দুর মুখ হইতেই বাহির হইয়া পড়িল। অন্নপূর্ণা কঠিন শপথ করিলেন তোমাদের যদি কোন সাহায্য লই,—যেন বেটার মাথা খাই।

বিন্দুর দশ হাজার টাকা যাদব দ্বিগুণ করিয়াছেন, মাধবের ওকালতির পসার জমিয়াছে, উপার্জন বাড়িয়াছে। যাদব এই সব হইতে কিছু লইয়া পৈতৃক বাসভবনের অনতিদূরে একখানি নূতন বাড়ী তৈরি করিয়াছেন। বিন্দুর পরামর্শে গৃহপ্রবেশের দিন স্থির হইয়াছে; আত্মীয়স্বজন নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, আসিয়াও পড়িয়াছেন, এমনই দিনে এই গণ্ডগোল। যাদব, অন্নপূর্ণা ও অমূল্য আসিল না। সব পণ্ড হয় দেখিয়া মাধব গিয়া অন্নপূর্ণাকে ডাকিয়া আনিলেন, কিন্তু অনুষ্ঠান অন্তে অন্নপূর্ণা যখন জলগ্রহণ না করিয়া চলিয়া গেলেন, মাধব জানিয়া শুনিয়াও অন্নপূর্ণাকে খাইতে অনুরোধ করিলেন না। মানিনী বিন্দুও অন্নপূর্ণাকে খাইবার জন্য সাধিতে পারিল না। বিন্দু কিন্তু এবার আপনার অভিমানের আগুনে পুড়িয়া ভিতরে ভিতরে এক গুরুতর ব্যাধির কবলে গিয়া পড়িল। মাধবের পায়ে ধরিয়াও কোন ফল হইল না। যাদব আবার চাকুরী স্বীকার করিয়াছেন, অমূল্য স্কুলে যায় অন্যপথে, সে জল খাবার খাইতে পায় না। লুকাইয়া গাছতলায় গিয়া দুটি ছোলা চিবাইয়া খায়। বিন্দুর পিতার কঠিন অসুখের সংবাদে যাদব বিন্দুর পিত্রালয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়া পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। পিত্রালয়ে গিয়া বিন্দুর প্রায় অন্তিম দশা উপস্থিত হইল। তখন নিরুপায় মাধব শেষ দেখা দেখাইবার জন্য অমূল্যকে আনিতে পুরানো বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বিন্দু মাধবের পায়ে ধরিয়াছে, কত কাঁদিয়াছে, বলিয়াছে আমার দোষ হইয়াছে, ঘাট মানচি; তুমি গিয়ে ব্লোগে। আমি ছেলের দিব্বি করচি আর কখনো…

মাধব বলিয়াছেন, তোমার কথা আমি গিয়ে বলব, দাদা শুনতে পাবেন না। ইহারই পরিণাম—অভিমানিনী আহার ত্যাগ করিয়াছে। ঔষধ পর্যন্ত কেহ

তাহাকে খাওয়াইতে পারে নাই। এইবার মাধব বোধহয় পত্নীকে চিনিতে পারিয়াছেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—আমার কথা শুনিলে না, কিন্তু যাহার কথা ঠেলিতে পারিবে না তাহাকেই আনিতে চলিলাম। সে রাত্রে বিন্দু নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়াছিল।

প্রভাতেই যাদব বিপদের ছায়া দেখিয়াছিলেন। যাদব চাকুরী-স্থানে গেলে ভৈরব আসিয়া বিন্দুর কঠিন ব্যাধি এবং গুরুতর অবস্থার কথা অন্নপূর্ণাকে বলিয়াছিল। সন্ধ্যায় মাধব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শুনিবামাত্র রাত্রেই যাদব অন্নপূর্ণা ও অমূল্যকে লইয়া মাধবের সঙ্গে ফরাসডাঙ্গা চলিয়া গেলেন।

তখন সবে মাত্র সূর্যোদয় হইতেছিল, মাধব ঘরে ঢুকিয়া দীপ নিভাইয়া জানালা খুলিয়া দিতেই বিন্দু চোখ চাহিয়া সুমুখেই প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে স্বামীর মুখ দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—কখন এলে ?

—এই আসচি, দাদা পাগলের মত কান্নাকাটি করচেন। বিন্দু আস্তে বলিল, তা জানি। তাঁর একটু পায়ের ধুলো এনেচ ? মাধব বলিলেন—তিনি বসে তামাক খাচ্ছেন। বৌঠান হাত পা ধুচ্চেন। অমূল্য গাড়ীতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওপরে শুইয়ে দিয়েছি, তুলে আনব? বিন্দু কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া—না ঘুমোক বলিয়া ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া শুইল।

অন্নপূর্ণা আসিয়াও মুখ ফিরাইতে পারিলেন না, ঔষধ খাওয়াইতে পারিলেন না। বলিলেন—কথা শোন, মুখ ফেরা। বিন্দু তথাপি মুখ ফিরাইল না। বলিল—না দিদি আগে—বলিবার উদ্দেশ্য বোধহয় এই যে আগে বল আমাকে ক্ষমা করেচ, সব দোষ মার্জনা করেচ। অন্নপূর্ণা বলিলেল—বলচি রে' ছোট, বলচি। শুধু তুই একবার বাড়ী ফিরে আয়। এমন সময় যাদব আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইলেন। বলিলেন—বাড়ী চল মা, আমি নিতে এসেছি।…হয় সঙ্গে করে নিয়ে যাব। নয়তো ওমুখো আর হব না। জান তো মা, আমি মিথ্যে কথা বলিনে।

বাস, কাজ হইয়া গেল মন্ত্রশক্তির মত। যাদব চলিয়া গেলেন। বিন্দু মুখ ফিরাইয়া বলিল—দাও দিদি, কি খেতে দেবে। আর অমূল্যকে আমার কাছে শুইয়ে দিয়ে তোমরা সবাই ওঘরে বিশ্রাম করগে। আর ভয় নেই, আমি মরব না।

বিন্দু মরে নাই। ইহারা মরে না। বাঙ্গালার নিভৃত পল্লীতে কোন দরিদ্র গৃহস্থের ঘরে অনুসন্ধান করিলে আজিও তাহার দেখা পাওয়া যাইবে।

স্মৃতিচারণ

বিশ্বকোষের গোড়ার কথা

প্রায় পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বৎসর পূর্বেকার কথা। বীরভূম অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষে বীরভূমের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের কাজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। তখনকার দিনে লাভপুরের নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব নাম। খ্যাতনামা নাট্যকার, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, ধনীসন্তান, বিনয়মধুর ব্যবহার, সাহিত্যিকগণের বন্ধু। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বীরভূমের অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রাম দাঁড়কা এবং দাঁড়কার পাশে লাঘোসা গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, একটি সমাধিফলকে লেখা আছে—

ওঁ তারা

দয়াসিন্ধুর্মহার্যোগী বিশ্বকোষপ্রবর্তকঃ।

জীয়াচ্চিরং রঙ্গলালো হৃদয়ে বিশ্ববাসিনাম্ ॥

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়—আবির্ভাব ২৪শে আষাঢ় ১২৫০ গ্রাম রাহুতা জেলা ২৪ পরগণা তিরোভাব ১৭ই কার্তিক ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

ঘটস্থ যাদৃশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেঽপি তাদৃশম।

নষ্টে দেহে তথেবাত্মা সমরূপো বিরাজতে ॥

নির্মলশিবের মুখে রঙ্গলাল ডাক্তারের অনেক কথা শুনিলাম। গ্রামের প্রবীণ লোক কয়েকজন তাঁহার ডাক্তারির বিশেষ সুখ্যাতি করিলেন। শুনিলাম তিনি ভাল লেখক ছিলেন, মুখে মুখে কবিতা বাঁধিতে পারিতেন। নির্মলশিব রঙ্গলালকে বহুবার দেখিয়াছেন। রঙ্গলাল এক সময় লাভপুরেও চিকিৎসা করিতে আসিতেন।

আমার মনে একটা খটকা লাগিল। আমাদের বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির সভাপতি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ই তো বিশ্বকোষের সম্পাদক। কোন্‌দিন তিনি সে কাজ শেষ করিয়াছেন। এখন আবার হিন্দী বিশ্বকোষ ছাপিতেছেন। সে কাজও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। তবে রঙ্গলাল কিরূপে বিশ্বকোষ-প্রবর্তক হইলেন? আমি লাভপুরে ফিরিয়া তথা হইতেই কলিকাতা

রওনা হইলাম। কলিকাতায় প্রথম প্রথম হেতমপুর-রাজের রিপন স্ট্রীটের বাড়ীতে গিয়া উঠিতাম। ইদানীং বিশ্বকোষ প্রেসের উপরতলায় থাকি। নগেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, রঙ্গলালই বিশ্বকোষের প্রবর্তক। 'কঙ্কাবতী', 'খাঁদাভূত' প্রভৃতি গ্রন্থের স্বনামধন্য সাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ রঙ্গলালের সহোদর ভ্রাতা। ত্রৈলোক্যনাথও তাঁহাকে এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'বঙ্গবাসী' কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে রঙ্গলাল ও ত্রৈলোক্যনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী ছাপান আছে।

'বঙ্গভাষার লেখক' একখানি সংগ্রহ করিলাম। বঙ্গবাসীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী বরদাপ্রসাদ বসুর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। বঙ্গবাসী কার্যালয়ে বসিয়া বসিয়া বঙ্গবাসীর পুরানো ফাইল ঘাঁটিলাম। রঙ্গলালের অনেক কবিতা, পাদপূরণে মুখে-মুখে রচিত কবিতা সংগ্রহ করিলাম। আশ্চর্য কবিত্বশক্তি ছিল রঙ্গলালের। একটা কবিতা দেখিলাম—যতদূর মনে আছে গোড়ার অক্ষর ধরিয়া পড়িয়া গেলে রাখালের উক্তি, মাঝের অক্ষরের হিসাবে পাওয়া যাইবে জননী যশোদার উক্তি। কবিতাটি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক, নেহাৎ ছোটও নহে। কবিতাগুলি কোথায় হারাইয়া গিয়াছে, 'বীরভূম-বিবরণ' দ্বিতীয় খণ্ডে গুটি দুই ছাপা আছে।

জীবনী সংগ্রহ করিয়া রঙ্গলালের একখানি ছবির জন্য ছুটিলাম রাউতা গ্রামে। শ্যামনগর স্টেশনে নামিয়া রাউতা অনেকখানি পথ। পথের দুই ধারে ঘন বাঁশের বন, দিনেই সূর্যের আলো সাবধানে প্রবেশ করে। গ্রামে গিয়ে বিশেষ কোন খবর পাওয়া গেল না। রঙ্গলালের পুত্রাদি ছিল না। অপর ভাইদের বংশধর ছিলেন। তাঁহাদের নিকট এইটুকু জানা গেল, ভবানীপুরের চন্দ্রনাথ চাটুজ্যের স্ট্রীটে সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট রঙ্গলালের একখানি তৈলচিত্র আছে। ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। শ্যামনগর স্টেশনে চিড়া-গুড় ছাড়া কোন খাবার মিলিল না। পরদিন সুধীরচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তৈলচিত্রখানি সংগ্রহ করিলাম। প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী কে. ভি. সেন তাহা হইতে একখানি ছবি তুলিয়া ব্লক তৈরী করিয়া দিয়াছিলেন। 'বীরভূম-বিবরণ' দ্বিতীয় খণ্ডে রঙ্গলালের ছবি ছাপা আছে।

রঙ্গলালের জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ। সংক্ষেপে লিখিতেছি। ইঁহারা খড়দহ মেলের কুলীন, কামদেব পণ্ডিতের সন্তান, এই বংশ 'ত্রিকুল থাক্' নামে পরিচিত। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে মুখোপাধ্যায়-বংশের একজন পূর্বপুরুষ, নাম শ্রীনন্দন

মুখোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গের এক নীচকুলোদ্ভবা ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করিয়া সমাজে পতিত হন, কুল কলঙ্কিত হয়। শ্রীনন্দনের এই বিপদে বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়, তাঁহার দুই বন্ধু আসিয়া অভয় দান করেন। তিনজনে ত্রিবেণীর ঘাটে গিয়া গঙ্গাজল স্পর্শপূর্বক শপথ গ্রহণ করিলেন—

(১) আমাদের এই তিন বংশেই পরস্পরের পুত্রকন্যার বিবাহকার্য সম্পাদিত হইবে।

(২) একান্ত প্রয়োজন ভিন্ন কেহ একটির অধিক বিবাহ করিতে পারিবে না।

(৩) পুত্রকন্যার বিবাহে অর্থের আদান-প্রদান রহিত হইল। পুত্রের বিবাহে কেহ জোড়া ধুতি ও একটি টাকা দক্ষিণার অধিক গ্রহণ করিলে তাহার সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ থাকিবে না।

রঙ্গলালের কনিষ্ঠ সহোদর ত্রৈলোক্যনাথ কিন্তু চারিটি বিবাহ করিয়াছিলেন, অবশ্য বিনাপণে। বাউতায় গিয়া শুনিলাম, তখনও তাঁহারা এই প্রথা মানিয়া চলিতেছেন।

রঙ্গলালের পিতার নাম বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়, মাতার নাম ভবসুন্দরী দেবী। রঙ্গলালের আরও পাঁচটি সহোদর ছিলেন, সর্বকনিষ্ঠ রাজেন্দ্র সতের বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। বাল্যকালে রঙ্গলালের লেখাপড়া শিক্ষার কোন সুযোগ ঘটে নাই। গুরুমহাশয়ের পাঠশালে হাতেখড়ি, তাহার পর গ্রামের ইংরাজী-বাংলা বিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। শেষ মানভূম-পুরুলিয়ায় খুল্লতাত শশিশেখর বন্দোপাধ্যায়ের নিকটে গিয়া সামান্য ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ পাইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা এই পর্যন্ত। কারণ, এই সময় পিতামাতা উভয়ের পরলোকগমনের পর রঙ্গলালকেই সংসারের ভার গ্রহণ করিতে হয়। তাঁহার প্রথম চাকুরি বালির পশ্চিমস্থিত বালুটি গ্রামের ইংরাজী-বাংলা বিদ্যালয়ে, এখানে তিনি ইংরাজীর শিক্ষকতা করিতেন। ১২৭০ সালে রঙ্গলাল সাহিত্য ও গণিতের শিক্ষকরূপে চন্দননগরে বদলি হন। এই সময়ে তাঁহার বিবাহ হয়, পত্নী বৈদ্যবাটির লক্ষ্মীনারায়ণ পণ্ডিতের কন্যা, নাম জ্ঞানদা দেবী।

বিবাহের পর তিনি উৎকট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। সৌভাগ্যক্রমে ম্যালেরিয়া সারিল, কিন্তু প্লীহা-যকৃতের উপসর্গ তাঁহার শরীরকে শীর্ণ করিয়া তুলিল। রোগে ভুগিয়া রঙ্গলাল চিকিৎসক-বন্ধু রমণচন্দ্র সাধু এবং ডাঃ আই হ্যাঙ্গার্ডের নিকট অ্যালোপ্যাথি শিখিলেন। এই সময় কলিকাতার প্রথম এবং প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্ত বায়ু-পরিবর্তনের জন্য চন্দননগরে

আসিয়া বাস করেন। খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথ বেরিনী সাহেব মাঝে মাঝে রাজেন্দ্র দত্তের বাসায় আসিয়া দুই-চারিদিন থাকিতেন। রঙ্গলাল ইঁহাদের নিকট হোমিওপ্যাথি শিখিয়াছিলেন। রঙ্গলালের আর-একজন বন্ধু ছিলেন ধন্বন্তরীকল্প কবিরাজ লোকনাথ কবিরঞ্জন। কবিরঞ্জন মহাশয় রঙ্গলালকে আয়ুর্বেদশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। চন্দননগর হইতে তিনি ইচ্ছাপুর স্কুলের পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া যান। কিন্তু ম্যালেরিয়ার তাড়নায় কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। কলিকাতায় থাকাকালে তিনি টাকশালে পয়সা কাটিবার ঘরে এবং পয়সার ছাপ দিবার ঘরে কিছুদিন কাজ করিয়াছিলেন। অতঃপর জ্বরের জ্বালায় তিনি গাজিপুরে জ্যেঠামহাশয় মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের বাসায় চলিয়া যান। গাজিপুরে পা দিয়াই জ্বর গেল, প্লীহা-যকৃতের উপসর্গ গেল। রঙ্গলাল সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া পুলিসে চাকুরি গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সে কার্য পছন্দ হইল না, কাজেই ছাড়িয়া দিলেন।

সংসারের তখন অত্যন্ত দুরবস্থা, সংসার আর চলে না। এমন সময় ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন। আত্মীয় হরকালী মুখোপাধ্যায় বীরভূমের স্কুলসমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টার ছিলেন। তিনি রঙ্গলালকে বীরভূম জেলার দাঁড়কা গ্রামের ইংরাজী-বাংলা বিদ্যালয়ে প্রধানশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। রঙ্গলাল তখন গেরুয়া আলখাল্লা পরিতেন, সন্ন্যাসীর বেশ। দাঁড়কা ভাল লাগিল, কিন্তু স্কুলের অবস্থা এবং আর্থিক ব্যবস্থা ভাল না থাকায় তিনি বাঁকুড়া জেলায় মা[illegible] রাজকুমারের গৃহশিক্ষকতা করিতে গেলেন। নানা কারণে সেখানেও [illegible]পারিলেন না, পুনরায় দাঁড়কায় ফিরিয়া আসিলেন। সেই তাঁহার সৌভা[illegible] সূচনা।

[illegible]২৭৮ সাল। দাঁড়কা এবং তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উ[illegible] হইবার আশঙ্কা দেখা দিল। রঙ্গলাল শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া চিকিৎসা [illegible] এই সময় কুইনাইন আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু দাম অনেক। তিনি [illegible]। ধারকর্জ করিয়া কুইনাইন কিনিয়া পরিপূর্ণ উদ্যমে চিকিৎসা চালাইতে লাগিলেন, এবং দুই হাতে টাকা কুড়াইতে লাগিলেন। রঙ্গলালের কল্পনাতীত অর্থ, তিনি প্রচুর অর্থের অধিকারী হইলেন।

গাজিপুরে অবস্থিতিকালে তিনি সেখানকার জমিদার ও পণ্ডিত ঠাকুরদাস দত্তের নিকট পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, শ্রীমদ্ভাগবত এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর কিছু কিছু অংশ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রঙ্গলাল ঠাকুর দত্তের নিকট

শ্রীমদ্‌ভাগবতের মল্লিনাথকৃত টীকা দেখিয়াছিলেন। কানপুরে বৃদ্ধ মন্নুলাল শাস্ত্রীর নিকট সংস্কৃত অধ্যয়নকালে তিনি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার জ্ঞানেশ্বরী টীকার সন্ধান পাইয়াছিলেন। কানপুরের নিকটবর্তী ব্রহ্মাবর্তের পণ্ডিত গিরিজা দত্ত শাস্ত্রী, নয়াগাঁয়ের বৃদ্ধ মন্নুলাল ও যুবক মন্নুলাল তাঁহাকে সিদ্ধান্তকৌমুদী, বামন জয়াদিত্যের কাশিকা, কাত্যায়ন বররুচি-কৃত বার্তিক, পতঞ্জলির মহাভাষ্য এবং বিবিধ পুরাণ ও কাব্য-নাটকাদি অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। এই বিদ্যানুরাগই রঙ্গলালকে 'বিশ্বকোষ' অভিধান সঙ্কলনের প্রেরণা দান করে। দাঁড়কায় প্রচুর অর্থ সংগ্রহপূর্বক তিনি কলিকাতায় একটি ছাপাখানা করেন। ইহা বাংলা ১২৯০ সালের কথা। কলিকাতায় অনেক লোকসান দিয়া ছাপাখানা তিনি রাউতায় লইয়া গিয়াছিলেন। রাউতা গ্রামেই বিশ্বকোষ প্রকাশ আরম্ভ হয়। অভিধানের প্রথম ভাগ শেষ করিয়া তিনি যখন দ্বিতীয় ভাগ ছাপিতেছিলেন, সেই সময় নগেন্দ্রনাথ বসু আসিয়া বিশ্বকোষের ভার গ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে রঙ্গলাল তাঁহাকে অভিধানের মুদ্রিত খণ্ডগুলি-সহ সর্বস্বত্ব দান করেন। বিশ্বকোষের 'অ' অংশ শেষ এবং 'আ' আরম্ভ হইয়াছিল, ইহার অধিকাংশ প্রবন্ধই রঙ্গলালের নিজের রচিত। 'অভাব' প্রবন্ধ নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হরিনাথ তর্করত্নের লেখা। অঙ্কুর এবং অনুবীক্ষণ প্রবন্ধ শ্রীশচন্দ্র দত্ত, এম-এ- সঙ্কলন করিয়া দিয়াছিলেন। দুইটি প্রবন্ধই রঙ্গলাল নিজ ভাষায় লিখিয়া লইয়াছিলেন। 'অথর্ব' প্রবন্ধের অনেক অংশ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের সঙ্কলিত। অসম্পূর্ণ অংশসহ সমগ্র প্রবন্ধ রঙ্গলালের রচনা।) তাঁহার 'হরিদাস সাধু' পুস্তক কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। বর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ রাউতায় বাহির হইয়াছিল। রঙ্গলাল-রচিত পুস্তকগুলির নাম—'শরৎশশী', 'বিজ্ঞানদর্শক', 'চিত্তচৈতন্য উদয়', এবং 'বৈরাগ্যবিপিন বিহার'। বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহাতাপচান্দ রঙ্গলালকে 'কাব্যরত্নাকর' উপাধি দিয়াছিলেন।

ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণ ঘোষাল মহাশয় মাঝে মাঝে চন্দননগরের বাটিতে আসিয়া বাস করিতেন। রঙ্গলাল যখন চন্দননগরে শিক্ষকতা করিতেন, সেই সময় অবসরকালে তিনি প্রায়ই রাজাবাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। রঙ্গলালের তখন কতই বা বয়স! একদিন ঘোষাল মহাশয়ের সভায় কলিকাতা ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ কবি গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। রঙ্গলাল গিয়া যোগদান করিলেন। ঘোষাল মহাশয় পরিচয় করাইয়া দিলেন, ইনি রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়; একজন 'সুকবি'। গোপালচন্দ্র অমনি একটি গান

রচনা করিয়া সভাস্থ গায়ককে গাহিতে বলিলেন। গানটির প্রথম ছত্র 'রাই লো তোমার কালো কিসে ভাল লাগে। ছি-ছি রাই, তোমার কালো কিসে ভাল লাগে'। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয় গানটি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। 'বীরভূম-বিবরণ' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পর লাঘোসা অঞ্চলের একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব ভিখারীর মুখে একটি গান শুনিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। বৈষ্ণব রঙ্গলালের রচিত প্রতিউত্তর গানটিও গাহিয়াছিলেন। আমার সেই জন্য বিশ্বাস জন্মে সংগৃহীত গানটিই গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত গান। হয়ত রঙ্গলালের নিকট হইতে দুইটি গানই বৈষ্ণব সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ঘোষাল মহাশয়ের আদেশে গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত গানটি গায়ক গাহিলেন। (আমার সংগৃহীত গানটি এইরূপ)—

রাই লো তোমার কালো কিসে ভাল লাগে।
কালো বরণ বাঁকা গড়ন কুল মজালি তার সোহাগে॥
চম্পক জিনি তোমার বর্ণ তুলনা যার হয় না স্বর্ণ।
খুঁজে দেখ তন্ন তন্ন, কার লাবণ্য তোমার আগে॥
শ্যাম কি সখি তোমার তুল্য কোন্ গুণে তার এত মূল্য
কি দেখে তোর নয়ন ভুলল মরলি কালোর অনুরাগে।

ঘোষাল মহাশয় রঙ্গলালকে বলিলেন, আপনাকে এখনই ইহার একটি উত্তর রচনা করিয়া দিতে হইবে। রঙ্গলাল সঙ্গে সঙ্গে গান রচনা করিয়া দিলেন—

কালোর রূপে জগৎ আলো।
আমার শ্যামের রূপে জগৎ আলো॥
সে হয় কুৎসিত কিসে মনে যারে লাগে ভালো।
ভালবাসার অনুরাগে ভালবাসায় ভাল লাগে
ভালোবাসার ভাল সবই কালোকে না লাগে কালো।
নিয়ে আমার যুগল আঁখি শ্যামের পানে চাহ দেখি
ভাল লাগে কি কালো লাগে আমার চোখে দেখে বলো॥

বিশ্বকোষের ভার নগেন্দ্রনাথ বসুকে দিয়া রঙ্গলাল নিশ্চিন্তচিত্তে লাঘোসায় ফিরিয়া আসিয়া চিকিৎসাকার্যে মনোনিবেশ করেন। তিনি বরাত দিয়া নিজ দেহের উপবেশন-উপযোগী ছোটখাট একখানি পাল্কি তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। পাল্কির প্রবেশদ্বারেরও একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। এই পাল্কিতে চড়িয়া ডাক্তার রঙ্গলাল গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে রোগী দেখিতে যাইতেন। দাঁড়কার আশেপাশের

পাঁচ-সাত ক্রোশ দূরের বড় বড় লোকদের বাড়ীর তিনি বাঁধা চিকিৎসক ছিলেন। হেতমপুর-রাজ রামরঞ্জন চক্রবর্তী দাঁড়কায় রায়-পরিবারে বিবাহ করিয়াছিলেন। রানী পদ্মসুন্দরী স্বামী-পুত্র লইয়া মাঝে মাঝে দাঁড়কায় নিজ বাসভবন রামনিকেতনে আসিয়া কিছুদিন থাকিয়া যাইতেন। রঙ্গলালও মাঝে মাঝে হেতমপুর রাজবাড়িতে গিয়া দুই-দশদিন কাটাইয়া আসিতেন। রাজ-পরিবারের সঙ্গে রঙ্গললের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

১২৭৯ সালের ১৪ই আশ্বিন রাজকুমারী ভূপবালার জন্ম হয়। ১২৮৮ সালের ২৬শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে চব্বিশ পরগনা গোবরডাঙ্গার জমিদার অন্নদাপ্রসাদের তৃতীয় পুত্র জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভূপবালার বিবাহ হইয়াছিল। জ্ঞানদাপ্রসন্ন উত্তরকালে সুদক্ষ শিকারীরূপে নাম কিনিয়াছিলেন। ভূপবালা বহুদিন শ্বশুড়বাড়ী যান নাই। জ্ঞানদাপ্রসন্নও দীর্ঘদিন শ্বশুরবাড়ি আসেন নাই। ইহারই মাঝখানে ভূপবালা পাথরী ব্যাধিতে অসুস্থা হইয়া পড়েন। কলিকাতার ডাক্তারেরা পরীক্ষার পর অস্ত্রচিকিৎসার পরামর্শ দেন। অস্ত্রচিকিৎসায় বাধা দিয়া রঙ্গলাল বলেন, আমি ঔষধ খাওয়াইয়াই রাজকুমারীকে নিরাময় করিয়া দিব, এবং আমার চিকিৎসার পর তাঁহার গর্ভধারণের ক্ষমতা জন্মিবে। সে বোধ হয়—সন ১৩০৭ সালের কথা। এই উপলক্ষে রঙ্গলাল কিছুদিন হেতমপুরে আসিয়া অবস্থিতি করেন। তাঁহার চিকিৎসার পর কলিকাতার ডাক্তারেরা যখন পরীক্ষা করিয়া বলেন রাজকুমারী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, তখন রঙ্গলাল দাঁড়কায় ফিরিয়া যান।

বাংলা ১৩১২ সাল, রাজা রামরঞ্জন সপরিবারে দাঁড়কায় আসিয়াছেন। কয়েকদিন পর এক জ্যোতিষী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জ্যোতিষী আপনাকে দ্রাবিড়দেশীয় বলিয়া পরিচয় দিলেন। তিনি রাজকুমারী ভূপবালাকে দেখিয়াই বলিলেন, ইহার স্বামী নিজ বাড়ীতে, বহুদিন এখানে আসেন নাই। আমি যজ্ঞ করিয়া পূর্ণাহুতির দিনেই জামাতাকে এখানে আনিয়া দিতে পারি। যজ্ঞ-সমাপ্তির সাতদিন মধ্যেই রাজকুমারী গর্ভবতী হইবেন। রাজকুমার, মহিমানিরঞ্জন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি এবং অপর সকলে কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু রঙ্গলালের সুদৃঢ় সমর্থনে রানী পদ্মসুন্দরী এবং রাজা রামরঞ্জন জ্যোতিষীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। রঙ্গলাল কাশীধামে একজন পরমহংসের নিকট গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে কোন এক সন্ন্যাসী তাঁহাকে তারামন্ত্রে দীক্ষাদান করেন। জ্যোতিষী যজ্ঞের ফর্দ করিয়া দিলেন। বরাতমত

জিনিসপত্র সংগৃহীত হইল, জ্যোতিষী যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, দিবারাত্রির জন্য যজ্ঞক্ষেত্রের চতুর্দিকে সজাগ প্রহরী মোতায়েন রহিল। আশ্চর্যের বিষয় তুই দিন যজ্ঞের পর তৃতীয় দিনে পূর্ণাহুতির সময় জামাতা জ্ঞানদাপ্রসন্ন দাঁড়কায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেকালে দাঁড়কায় আসিবার কোন সুগম পথ ছিল না। যজ্ঞের দ্বিতীয় দিনে জ্ঞানদাপ্রসন্ন হেতমপুর রাজবাড়ীতে আসেন। সেখানে কেহ নাই দেখিয়া ম্যানেজারকে বলিয়া হেতমপুর হইতে দাঁড়কা প্রায় কুড়ি ক্রোশ পথ ঘোড়ার গাড়ির ডাক বসাইবার ব্যবস্থা করেন এবং তৃতীয় দিনে সেই ঘোড়ার গাড়িতে দাঁড়কায় গিয়া উপস্থিত হন। জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছিল। সন্তানসম্ভাবনার পর ভূপবালাকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হয়। কলিকাতায় ১৩১৩ সালের ৩রা অগ্রহায়ণ তারিখে ভূপবালা এক কন্যাসন্তান প্রসব করেন। তুঃখের বিষয়, রানী পদ্মসুন্দরীর দৌহিত্রীমুখ সন্দর্শনের সৌভাগ্য হয় নাই। ভূপবালার কন্যা প্রসবের তুই দিন পরই ৫ই অগ্রহায়ণ মধ্যরাত্রিতে পদ্মসুন্দরীর পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। সমধিক তুঃখের বিষয়, কয়েকদিনের ব্যবধানে ১৭শে অগ্রহায়ণ ভূপবালাও লোকান্তরিতা হন। কন্যা আশালতা তখন একুশ দিনের শিশু।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বীরভূমে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে বীরভূমের নানাস্থানে হরিসভা ও ধর্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। রঙ্গলাল দাঁড়কায় একটি ধর্মসভা স্থাপন করেন; এই সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্রে'র অত্যন্ত সমাদর হইয়াছিল। দাঁড়কার জমিদারবংশীয় তুর্গাদাস রায় ভাল গান গাহিতে পারিতেন। রঙ্গলালের রচিত গানগুলি তিনি ধর্মসভায় এবং বিভিন্ন মজলিসে গাহিতেন। রঙ্গলাল অসংখ্য গান রচনা করিয়াছিলেন। সেকালের ভিখারীরা এবং সিধল গ্রামের বাজিকরের দল রঙ্গলালের গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। ধর্মসভার জন্য রচিত একটি গান—

অকূলে পারের অর্থ ছিল নাহে ভক্তাধীন।
মন প্রাণ বান্ধা দিয়ে চরণে লইনু ঋণ ॥
এ ধারে উদ্ধার পাব কিম্বা চিরঋণী হব
এই চিন্তা করে করে হইলাম বোধহীন ॥
সাধ নাহি হয় চিতে মন প্রাণ ফিরে নিতে
ঋণের দায়ে বন্দী রব তব পাশে চিরদিন।
এ ঋণে না আছে শান্তি খাতকের পাতক নাস্তি,
রঙ্গলাল তাই ভাবিয়ে পরিশেষে উদাসীন ॥

দাঁড়কার পঞ্চানন রায় এবং মহাতাপচন্দ্র রায় রঙ্গলালের সমস্যাপূরণের কবিতাগুলি দ্রুতহস্তে লিখিয়া লইয়া এডুকেশন গেজেটে পাঠাইয়া দিতেন। স্বয়ং ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রঙ্গলালের কবিতার অনুরাগী ছিলেন। স্কুল-পরিদর্শকের চাকুরি লইয়া তিনি দাঁড়কায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশ্নের পাদপূরণে রঙ্গলাল বহু কবিতা রচনা করেন। 'বঙ্গভাষার লেখক' হইতে দুইটি মাত্র কবিতা তুলিয়া দিতেছি। ভূদেবচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, 'গোদ হয়নি চুলে'। রঙ্গলাল সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া যাইতে লাগিলেন—

সুন্দরে দেখিয়া যত পুরনারী দলে।
নিজ নিজ পতি নিন্দা করিছে সকলে॥
এক ধনী কহে সই কি কহিব দুখ।
বিধাতা আমার প্রতি বড়ই বিমুখ॥
গোদা পতি বাম বিধি দিলেন আমায়।
গোদের ভরেতে মম প্রাণ সদা যায়॥
নাকে ঝোলে লম্বা গোদ যেন পাঁড় শশা।
কানেতে ঝুলিছে গোদ বাবুয়ের বাসা॥
চোখে গোদ দাঁতে গোদ গোদ গ্রন্থিমূলে।
সত্যপীরে সিন্নি মেনে গোদ হয়নি চুলে॥

ভূদেবচন্দ্র পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, 'ঠেঁটি পাঁচহাতি'। রঙ্গলাল উত্তর দিলেন—

বেশ্যার ভাগ্যে জোটে সাচ্চা শাড়ি বেনারসী।
স্ত্রীর ভাগ্যে মুখঝামটা গালি রাশি রাশি॥
ঢুলির ভাগ্যে শাল দোশালা ছালা ছালা মেলে।
ছেলের ভাগ্যে জোটে কানি কাঁদিয়া ককালে॥
ঠাকুরের ভাগ্যে জোড়া মণ্ডা আর ঠটে কলা।
খাজা গজা পোলাও কোপ্তা ইয়ারের বেলা॥
খেমটার ভাগ্যে মণি মতি জোটে নানা জাতি।
পুরুতের ভাগ্যে ঘসা পয়সা ঠেঁটি পাঁচহাতি॥

দাঁড়কার পঞ্চানন রায় একদিন প্রশ্ন দিয়াছিলেন, 'হাতের বাঁশীটি কেন হইল সরল'। রঙ্গলাল উত্তর দিলেন—

একদিন হাসি হাসি শশিমুখী রাই।
কহিলেন শুন শুন প্রাণের কানাই ॥
লইয়া বাঁকার হাট ওহে নটরাজ।
আগমন করিয়াছ এই ব্রজ মাঝ ॥
ললাটে অলকা তব বাঁকাভাবে আঁকা।
চরণে নূপুর পর তাও শ্যাম বাঁকা ॥
শিরে শিখীপুচ্ছ চূড়া বাঁকা হয়ে রয়।
সকলি তোমার বাঁকা সোজা কিছু নয় ॥
বাঁকা আঁখি বাঁকা ঠাম বাঁকাই সকল।
হাতের বাঁশীটি কেন হইল সরল ॥'

রঙ্গলাল জীবনান্তে আপনাকে দাহ করিতে নিষেধপূর্বক শবদেহ সমাধি দিবার আদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। সমাধিফলকে লিখিত শ্লোক নিজেই রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। উদ্যোক্তাগণ মৃত্যুর সন তারিখ পরে বসাইয়া দিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার কয়েক সহস্র টাকাই মজুত ছিল। রঙ্গলাল দাঁড়কার পাশে লাঘোসায় বাস করিতেন।

প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ

নগেন্দ্রনাথ বসুকে ইংরাজ সরকার যখন রায়সাহেব উপাধি দেন, তখন স্বর্গগত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'নায়কে' লিখিয়াছিলেন—'ছিলেন সর্বজ্বর-গজসিংহ, হলেন শুণ্ঠীবটিকা'। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়—'প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব' এই উপাধির সঙ্গে রায়সাহেবীর তুলনা করিয়াই ঐরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথের আরও উপাধি ছিল—সিদ্ধান্তবারিধি, তত্ত্ব-চিন্তামণি, এবং শব্দরত্নাকর। উত্তরবঙ্গে রঙ্গপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নগেন্দ্রনাথ রঙ্গপুরে গেলে মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন উদ্যোগী হইয়া তথাকার পণ্ডিতদের লইয়া নগেন্দ্রনাথকে প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব উপাধি প্রদান করেন। নগেন্দ্রনাথ এই উপাধিতেই সমধিক পরিচিত ছিলেন।

বীরভূম জেলায় নগেন্দ্রনাথের কিছু সম্পত্তি ছিল, সিউড়ি ডাঙ্গালপাড়ায়।

আর কিছু ছিল জজসাহেবের হাতায়। ডাঙ্গালপাড়ার পতিত জমি এক হাজার টাকা দাম দিয়া বীরভূমে সুলতানপুরের রায়বাহাদুর ৺অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খরিদ করিয়াছিলেন। জজসাহেবের হাতার অপর অংশীদার ছিলেন হেতমপুরের মহারাজা রামরঞ্জন চক্রবর্তী। এই সূত্রে হেতমপুর রাজবাড়ীর সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয়। হেতমপুরের বিদ্যোৎসাহী মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন নগেন্দ্রনাথকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। রাজবাড়ীর ক্রিয়াকর্মে, উৎসবাদিতে নগেন্দ্রনাথ নিমন্ত্রিত হইতেন এবং কখনও কখনও আসিতেন, তা ছাড়া প্রাপ্য খাজনা আদায়ের জন্য তাঁহাকে বৎসরে একবার হেতমপুরে আসিতেই হইত।

বীরভূম ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের জন্য মহিমানিরঞ্জন আমাকে হেতমপুরে আমন্ত্রণ করেন। আমি হেতমপুরে গেলে তিনি আমাকে কলিকাতায় লইয়া যান। ওয়েলেসলিতে তাঁহার নিজের বাড়ী ভাড়া খাটিত। তিনি উঠিতেন ৮৭।১ রিপন স্ট্রীটে জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজা সত্যনিরঞ্জনের বাড়ীতে। একদিন বিশ্বকোষ ছাপাখানার উপরের বিস্তৃত হলে নগেন্দ্রনাথ বসিয়া আছেন, মহারাজকুমার আমাকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তখন তাঁহার বিশ্বকোষ দেখি নাই, মাত্র রাজন্যকাণ্ডখানা পড়িয়াছি। মহিমানিরঞ্জন পরিচয় করাইয়া দিলেন। কথায়-কথায় ধর্মমঙ্গল ও শ্যামারূপার গড়ের কথা উঠিল। আমি রাজন্যকাণ্ডের ভুল বাহির করিতে চেষ্টা করিলাম। তিনি বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার হাতে রাজত্ব বা রাজকন্যা ছিল না, আমি না বুঝিয়া সমানে তর্ক চালাইতে লাগিলাম। তিনি আমাকে নিরস্ত করিবার জন্য বলিলেন, 'অমৃতবাজার পত্রিকা অফিস থেকে যশোদানন্দন তালুকদার-সম্পাদিত একখানা "প্রেমবিলাস" কিনে আনুন তো। নীচে নেমেই গলিপথে সোজা রাস্তা আছে।' সিঁড়ি দিয়া নামিতেছি—শুনিলাম বলিতেছেন—'কোথায় পেলেন একে? "চায়না টু পেরু"—রাজন্যকাণ্ডখানা দেখি কণ্ঠস্থ! একে ছাড়বেন না, রাখুন।' আমি তাঁহার কাছে অতি নগণ্য, তবু একেবারেই বিরক্তি নাই, আমার স্পর্ধায় ক্রুদ্ধ হন নাই। আমি বিস্মিত হইলাম, মানুষটির উপর শ্রদ্ধায় মন ভরিয়া উঠিল। কিছুদিন অন্তে বুঝিয়াছিলাম আমারই ভুল হইয়াছিল, তিনি ভুল করেন নাই। অবশ্য পরে বহু নূতন নূতন উপাদান আবিষ্কৃত হওয়ায় রাজন্যকাণ্ডের ভুল ধরা পড়িয়াছে অনেক। অপ্রামাণ্য কুলগ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া তিনি যে সব সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, রাখালদাস, রমাপ্রসাদ প্রভৃতি তাহার ভুল-ত্রুটি দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে কেহ অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

হেতমপুরে 'বীরভূম অনুসন্ধান-সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হইল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ সমিতির উপদেষ্টা। সভাপতি প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ। সম্পাদক মহিমানিরঞ্জন, সহ-সম্পাদক আমি। সারা বীরভূমে, মুর্শিদাবাদের কিছু অংশে ও সাঁওতাল পরগণার পাকুড় অঞ্চলে ঘুরিয়া আমি ইতিহাসের যে সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তিন খণ্ড 'বীরভূম-বিবরণে' তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। দুই খণ্ড সম্পূর্ণ এবং তৃতীয় খণ্ডের কিছু অংশ বিশ্বকোষ প্রেসেই ছাপা হইয়াছিল। লেখা এবং প্রুফ দেখার জন্য কলিকাতায় থাকিতে হইত। প্রথম দিকে রিপন স্ট্রীটে থাকিতাম। কিন্তু খাওয়ার অসুবিধার জন্য আমি বিশ্বকোষ ছাপাখানার উপরের ঘরে গিয়াই আশ্রয় লইলাম। বেশ খোলামেলা ফাঁকা হল, প্রচুর আলো-বাতাস। উপরেই কল-পায়খানা। বিশ্বকোষ লেন হইতে খাইতে আসিতাম শিয়ালদহের আর্যনিবাস হোটেলে। তখন ট্রামের ট্রান্সফার টিকিট ছিল, মিড্‌ডে টিকিট ছিল। ছয় আনা পয়সা দিলে মাছ, ডাল-ভাত, দুইটা তরকারী ও দই মিলিত। তখন মাছ খাইতাম। রাত্রে নিকটবর্তী বাগবাজারে এক উড়িয়ার ব্রাহ্মণের দোকানে রুটি ডাল ও তরকারী মিলিত। মিষ্টিও সস্তা ছিল। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের রাস্তায় ট্রাম ডিপোর কাছে দ্বারিক যেদিন নূতন দোকান খোলেন, সেদিন ভাল ঘিয়ের হালুয়া বিনা পয়সায় বিলাইয়াছিলেন। সেই অবধি মাঝে মাঝে দ্বারিকের দোকানে বৈকালে কিছু খাইতাম। মহিমানিরঞ্জন দেশে আমাকে খাবার দিতেন না, দিতেন মোট পঁচিশটি টাকা। এখানে রিপন স্ট্রীটের ফিরিঙ্গি পাড়ায় থাকিয়া অসুস্থ হইয়া পড়ি, খাওয়ার অসুবিধায়। সেইজন্য তিনি আমাকে বিশ্বকোষে পাঠাইয়া দেন। পঁচিশ টাকা ছাড়া দৈনিক বরাদ্দ খাওয়ার জন্যে পাঁচ সিকা। বিশ্বকোষে থাকাকালে ৺সরস্বতী পূজা বা ঐরূপ কোন উপলক্ষে নগেন্দ্রনাথ নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। সে সময় পুত্র বিশ্বনাথ শিশু। আত্মীয় হরিচরণ প্রেসের কাজ দেখাশোনা করিতেন। হরিচরণ মিত্র ছিলেন আমার প্রায় সমবয়সী—বয়সে কিছু ছোট। তিনি আমার প্রুফ দেখিয়া দিতেন। স্বনামখ্যাত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল নগেন্দ্রনাথের। অক্ষয়চন্দ্রের পুত্র নগেন্দ্রনাথের জামাতা অজয়চন্দ্র মাঝে মাঝে আসিতেন। অমৃতবাজারের মৃণালকান্তি আর এক বৈবাহিক। ইঁহাদের সঙ্গে এবং আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর, আচার্য হরপ্রসাদ, ব্যোমকেশ মুস্তোফি, প্রভৃতির সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের মাধ্যমেই পরিচিত হইয়াছিলাম। আমি যে সময়ের কথা

বলিতেছি তখনও হিন্দী বিশ্বকোষের কাজ চলিতেছে। খবর না দিয়া মহাত্মা গান্ধীর নগেন্দ্রনাথের বাড়ীতে আসার সংবাদ পরে নগেন্দ্রনাথই আমাকে বলিয়াছিলেন। ইয়ং ইণ্ডিয়ার লেখা দেখাইয়াছিলেন। এক বৎসর ৺সরস্বতী পূজায় আচার্য হরপ্রসাদ ও নগেন্দ্রনাথ হেতমপুর আসেন। আমি তাঁহাদিগকে বক্রেশ্বর দেখাইয়া আনি। আমার সঙ্গে নগেন্দ্রনাথ জয়দেবকেন্দুলী, শ্যামারূপার গড় দেখিয়াছিলেন। একবার ইলামবাজার-পায়র-দেবীপুর অঞ্চল তাঁহাকে দেখাইয়াছিলাম। আর একবার তিনি আসিয়াছিলেন আমার সঙ্গে পাইকোড় গ্রামে চেদী কর্ণ নামাঙ্কিত শিলালিপি পড়িতে। পড়িতে পারেন নাই, তাই তাঁহাকে ও আচার্য হরপ্রসাদকে পুনরায় পাইকোড়ে লইয়া আসিয়াছিলাম। কতদিন তাঁহার সঙ্গে কাটাইয়াছি। তাঁহার বাল্যজীবনের দুঃখ-কষ্টের কত কথা আমাকে অকপটে বলিয়াছেন। জীবিকার জন্য কত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, অথচ জন্মিয়াছিলেন খুব ধনীর বাড়ীতেই। তিনি অদৃষ্ট খুব মানিতেন, জ্যোতিষে বিশ্বাস করতেন, হিন্দুর পূজা-পার্বণ মানিয়া চলিতেন। কায়স্থদের উপবীত গ্রহণের তিনিই প্রথম উদ্যোক্তা। নিজে পৈতা পরিয়াছিলেন। নিত্য পূজা-আহ্নিক করিতেন।

আমার প্রথমা স্ত্রীর গুরুতর ব্যারাম। পেটে জল জমিয়াছে, হাত পা মুখ ফুলিয়াছে। দেশের নানান চিকিৎসায় হতাশ হইয়া তাহাকে কলিকাতায় আনিয়া আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ (কার্মাইকেল কলেজ) হাসপাতালে ভর্তি করিয়া দিলাম। আমি আসিয়া উঠিলাম বিশ্বকোষ ছাপাখানার উপরতলায়, আমার বাবার আপন মামাতো ভায়ের ছেলে—আমার খুড়তুতো ভাই শ্রীমান রামরেণু চট্টরাজ বিদ্যাসাগর কলেজে বি. এ. পড়িতেছিল। বিপদের সংবাদ পাইয়া আমার নিকটে আসিয়া থাকিল। দুপুরে খাই বাগবাজারের এক হোটেলে, রাত্রে খাই সেই উড়িয়া ব্রাহ্মণের দোকানের রুটি। সন ১৩২৭ সালের ২০শে আষাঢ় ভোরে পত্নী দেহরক্ষা করিলেন। রামরেণু তাহার ব্রাহ্মণ সহপাঠীদের ডাকিয়া আনিল। তাহাদের সাহায্যে কাশী মিত্রের ঘাটে পত্নীর শেষকৃত্য সম্পাদন করিয়া বিশ্বকোষেই ফিরিয়া আসিলাম। সেদিন নগেন্দ্রনাথ আমাদের দুই ভাইকে প্রচুর সহানুভূতির সঙ্গে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন। দেশে না ফিরিয়া কলিকাতাতেই পত্নীর আদ্যকৃত্য সম্পন্ন করিব স্থির করিলাম। নগেন্দ্রনাথ পুরোহিত দেখিয়া দিলেন, শ্রাদ্ধের দ্রব্যাদি যোগাড় করিয়া দিলেন। গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধ সারিয়া রাত্রে

নগেন্দ্রনাথের বাড়ীতেই ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা হইল। খরচটা অবশ্য আমি দিয়াছিলাম, কিন্তু সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন নগেন্দ্রনাথ। শ্মশানবন্ধুগণ, বীরভূমের রায়বাহাদুর নির্মলশিবের আত্মীয়স্বজন যাঁহারা কলিকাতায় ছিলেন, সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। নগেন্দ্রনাথের বাড়ীর লোকজনসহ প্রায় শত খানেকের উপর লোক সেদিন খাইয়াছিলেন। নিয়মভঙ্গের দিন রায়বাহাদুর অবিনাশচন্দ্রও অনুগ্রহপূর্বক বিশ্বকোষ লেনে আসিয়াছিলেন। আমার বিপদের দিনে নগেন্দ্রনাথের এই সহৃদয় সদয় ব্যবহার আমি আজিও ভুলিতে পারি নাই। হেতমপুর আর ভাল লাগিল না, চলিয়া আসিলাম। আবার হেতমপুরে গিয়াছিলাম, 'বীরভূম-বিবরণ' তৃতীয় খণ্ড লিখিয়াছিলাম। নানা কাজে নানা স্থানে ঘুরিয়াছিলাম। সন ১৩৪০ সালে বৈশাখে মাসে নগেন্দ্রনাথ বাঙ্গালা বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিবার আয়োজন করিলেন। তিনি এই কার্যে আমার সাহায্য চাহিলেন। আমি পূর্বঋণ স্মরণে পত্রপাঠ কলিকাতা আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া খুব খুশী হইলেন। হরিচরণ নাই। কিন্তু পুত্র বিশ্বনাথ যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, তিনিই প্রধান কর্মকর্তা। আমি তাঁহার সহকারীরূপে কার্য করিব। এক-একজন এক-এক বিষয় লিখিবেন, তাঁহাদের সম্মতি সংগ্রহ করিয়া অনুষ্ঠানপত্রে ছাপিতে হইবে। তাঁহাদের নিকট হইতে প্রবন্ধ আনার ভারও আমার উপর। আমার অধিগত বিষয়ে লিখিবারও কথা উঠিল। এই সমস্ত প্রাথমিক আলোচনার পর তিনি আমাকে গোপনে বলিলেন, এই তো সবে আরম্ভ, গ্রাহক বাড়িলে টাকা বাড়াইয়া দিব। এখন আপনি মাসে ত্রিশটি টাকা পাইবেন, অবশ্য খাইবেন আমার বাড়ীতে। আমি কোন কথা বলিলাম না। কাগজে সমালোচনা ছাপাইতাম, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নিকট হইতেও প্রশংসাপত্র আদায় করিয়া আনিতাম, লেখা সংগ্রহ করিতাম। একবার গ্রাহক সংগ্রহের জন্য পুরী কটক প্রভৃতিও ঘুরিয়া আসিয়াছিলাম। এই সময় আবার অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 'মহাকোষ' বাহির করিতে লাগিলেন। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল। কোন বাধা-বিঘ্ন গ্রাহ্য না করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিলাম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, বাঙ্গালী জাতির দুর্ভাগ্য—পুত্র বিশ্বনাথ মাত্র এক বৎসর বিশ্বকোষের কাজ চালাইয়া ১৩৪১ সালের চৈত্র মাসেই আমাদিগকে চিরতরে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। নগেন্দ্রনাথের শরীর ভাঙ্গিয়াছিল। হাঁপানিতে বিশেষ কষ্ট পাইতেন। বসিয়া থাকিতেন, চলাফেরা করিতে পারিতেন না। রোগজীর্ণ পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ

১৩৪৫ সালের ২৪শে আশ্বিন নশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্তি রাখিয়া তিয়াত্তর বৎসর বয়সের প্রথম পাদেই অমরলোকে প্রস্থান করিলেন। এই দ্বিতীয় সংস্করণের বিশ্বকোষ মাত্র চারিখণ্ড বাহির হইয়াছিল।

নগেন্দ্রনাথের জন্মসন ১২৭৬ সাল, তারিখ ২৩শে আষাঢ় শুক্রবার। জন্ম হয় ৭৫নং বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে। স্বনামধন্য প্রাতঃস্মরণীয় রামদুলাল সরকারের তৃতীয়া কন্যার নাম তারিণী দেবী। মহারাজা নবকৃষ্ণের দৌহিত্র কালীকৃষ্ণ ঘোষের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। কালীকৃষ্ণের একমাত্র কন্যা ক্ষেত্রমণি। তারিণীচরণ বসু ক্ষেত্রমণির স্বামী। তারিণীচরণের পুত্র নীলমাধব ও নীলরতন। এই নীলরতনের জ্যেষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রনাথ। নগেন্দ্রনাথের মাতা পবিত্রকুমারীর বয়স যখন বারো বৎসর সেই সময় নগেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। নগেন্দ্রনাথ কতবার গল্প করিয়াছেন, 'পিতামহী ক্ষেত্রমণি হাজার টাকা দিয়া আমার মুখ দেখিয়াছিলেন। আমার অন্নপ্রাশনে খরচ হইয়াছিল প্রায় ষোল হাজার টাকা।' নগেন্দ্রনাথের মাতা অল্প বয়সেই দেহত্যাগ করেন। তাঁহার আর একটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল।

সেকালের বড়লোকের ছেলে,—নীলমাধব ও নীলরতন যৌবনারম্ভেই মদ খাইতে আরম্ভ করেন। একে মদের নেশা, তাহার উপর নিদারুণ পত্নীশোকে নীলরতন প্রায় পাগল হইয়া গেলেন। ক্ষেত্রমণির সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের শক্তি ছিল না। কর্মচারী, দূরসম্পর্কের আত্মীয়স্বজন যে যেদিকে পাইল লুট করিতে আরম্ভ করিল। সমস্ত সম্পত্তি একে-একে দেনার দায়ে জলের দামে বিকাইয়া গেল। ক্ষেত্রমণি শুনিলেন বসতবাড়ীটাও বিক্রী হইয়া গিয়াছে। খরিদ্দার আদালতের পিয়াদার সাহায্যে শীঘ্রই বাড়ী দখল করিতে আসিবে। তিনি সকলকেই লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কিছুদিন বাগবাজারে একটা বাড়ীতে ভাড়া দিয়া বাস করিয়াছিলেন। অবশেষে ছাতুবাবুর বাড়ীতে আশ্রয় প্রাপ্ত হন।

নগেন্দ্রনাথ স্কুলে লেখাপড়ার কোনও সুযোগ পান নাই। একটি নর্মাল স্কুলে শিক্ষারম্ভ, তাহার পর ওরিয়েন্টাল সেমিন্যারী, এবং বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে—তৃতীয় কি চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়াই পাঠে পূর্ণচ্ছেদ টানিতে হয়। নন্দলাল সরকার তাঁহাদের পরিচিত, ইনি 'কল্লোলের যুদ্ধ' নাম দিয়া একখানা কাব্য রচনা করেন। বন্ধু ব্যোমকেশ মুস্তোফি এক ধনী যুবকের নিকট হইতে কিছু টাকা যোগাড় করিয়া দিলে নন্দলালের সম্পাদকতায় একখানা

মাসিকপত্র বাহির হয় 'তপস্বিনী'। তাহাতে নগেন্দ্রনাথ উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন 'অক্ষিচাঁদ'। তপস্বিনী উঠিয়া গেল। নগেন্দ্রনাথ নাটক রচনায় মন দিলেন। নগেন্দ্রনাথ আমাকে বলিয়াছিলেন 'হরিরাজ' তাঁহার লেখা নাটক। নানান্ গোলমালে তাহা অমরেন্দ্রনাথ দত্তের গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এক বন্ধু তাহাতে অনেক রদ-বদল করেন। নাট্যকার অপরেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, হরিরাজ অন্য একজনের লেখা।

নগেন্দ্রনাথ এই সময়ে একজন ছাত্রকে পড়াইয়া মাসে বারো টাকা পাইতেন। গ্রেট ইণ্ডিয়ান প্রেসের মালিক সুরেশচন্দ্র বসু 'শব্দেন্দু মহাকোষ' প্রকাশ করিতে চাহিলে নগেন্দ্রনাথ তাহার সংকলন-ভার গ্রহণ করেন। চারিশত পৃষ্ঠা ছাপা হইবার পর অপর একজন ছাপাখানার স্বত্ব দাবী করিলে শব্দেন্দু মহাকোষ বন্ধ হইয়া যায়। শব্দেন্দু মহাকোষ আমি দেখিয়াছি। ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শব্দ, তাহার অর্থ, উদাহরণ, বৈদিক ও পৌরাণিক এবং বৈদেশিক শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়-আদি পরিকল্পনা ছিল বিরাট।

শব্দকল্পদ্রুমের নাগরী অক্ষরে একটা সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনা করেন বরদাচরণ ও হরিচরণ বসু। রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র সুপণ্ডিত আনন্দকৃষ্ণ বসুর সুপারিশে নগেন্দ্রনাথ পঁচিশ টাকা বেতনে লেখা সংগ্রহ ও গ্রাহক সংগ্রহের চাকুরি গ্রহণ করেন শব্দকল্পদ্রুম কার্যালয়ে। নগেন্দ্রনাথ বলেন, এই কার্যে আমি বহরমপুর গিয়া স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ফিরিয়া আসি এবং বিশ্বকোষের দুই মালিকের সঙ্গেই দেখা করিয়া ঐ অভিধানের সর্বস্বত্ব প্রাপ্ত হই।

বিশ্বকোষ বাহির করেন, কঙ্কাবতী প্রভৃতি গ্রন্থের সুলেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং তাহার জ্যেষ্ঠ সুকবি রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়। ছাপাখানা ছিল শ্বগ্রাম রাউতায়। ১২৯৩ সালে বাইশ অধ্যায়ে 'অ' বর্ণ শেষ হইল। ত্রৈলোক্যনাথ বিলাত চলিয়া গেলেন। রঙ্গলাল 'আ' বর্ণের আমিক্ষীয় শব্দ পর্যন্ত ছাপিয়া বীরভূমে দাঁড়কা গ্রামে একটা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেডপণ্ডিত হইলেন। ত্রৈলোক্যনাথ বিলাত হইতে ফিরিলে রঙ্গলাল দেখা করিতে আসিলেন। নগেন্দ্রনাথ দুই ভাইয়ের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া বিনা অর্থব্যয়ে 'বিশ্বকোষ' পাইয়া গেলেন। এক হাজার টাকা দিয়া শেষে ছাপা বাইশ খণ্ডও পাইয়াছিলেন। এই বিশ্বকোষই তাঁহার সর্ব-সৌভাগ্যের মূল। প্রকাণ্ড বাসগৃহ, বিশ্বকোষ ছাপাখানার দ্বিতল বাড়ী, বারুইপুরে ধানের জমি, বসত-

প্রজা, বাগান-পুকুর সমস্তই তাঁহার বিশ্বকোষ-বিক্রয়-লব্ধ অর্থেই হইয়াছিল। গ্রেট ইণ্ডিয়ান প্রেসের উপেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বকোষ ছাপিবার ভার লইয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথ তাঁহাকেও পাঁচশত টাকা দিয়া দেনা শোধ করিলেন। এখন তিনিই বিশ্বকোষের একমাত্র মালিক হইলেন। ১২৯৫ সাল হইতে নগেন্দ্রনাথ নিজের দায়িত্বে বিশ্বকোষ ছাপাইতে আরম্ভ করিলেন। নানান্ জনের নিকট হইতে প্রবন্ধ লেখাইয়া আনা, গ্রাহক সংগ্রহ, ছাপার তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কার্যে নগেন্দ্রনাথ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মীও প্রসন্না হইলেন। সন ১৩১৮ সালে বাইশ খণ্ডে সতের হাজার পৃষ্ঠায় বিশ্বকোষের প্রথম সংস্করণ সম্পূর্ণ হয়। চব্বিশ বৎসরের অপ্রতিহত অধ্যবসায়, একনিষ্ঠ উদ্যোগ, অমানুষী পরিশ্রম, অতন্দ্র সাধনা তাঁহার ব্রত সার্থক করিয়া তুলিল। তিনি যখন বিশ্বকোষের ভার গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স উনিশ বৎসর। ১৩১৮ সালে বয়স তিতাল্লিশ। আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয় সন ১৩২১ সালের শ্রাবণ মাসে।

বাঁকুড়া জেলা হইতে রামকুমার নামে একটি লোক তাঁহাকে পুরানো পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিত। নগেন্দ্রনাথ বহু পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কুলগ্রন্থের সংখ্যা খুব কম ছিল না। এই কুলগ্রন্থের ঐতিহাসিকতা লইয়া ইতিহাসবেত্তাগণের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। পরে তাঁহার সংগৃহীত কুলগ্রন্থের অনেক উপকরণ প্রমাদপূর্ণ প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস বহুল পরিমাণে কুলগ্রন্থের ভিত্তিতেই লিখিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ হইতে তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন। দু-একখানি ইংরাজী গ্রন্থও তাঁহার আছে। নগেন্দ্রনাথের একজন বিশ্বস্ত কর্মঠ অনুচর ছিল 'পাহাড়ি'। পাহাড়িকে সকলেই চিনিত। নগেন্দ্রনাথ যশোহর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের ইতিহাস শাখার সভাপতি হইয়া গিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদের সাহায্যে তিনি পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্মার শুশুনিয়া পাহাড়ের লিপির পাঠোদ্ধার করেন। ঐতিহাসিকগণ পুষ্করণাকে রাজপুতানায় লইয়া গিয়াছিলেন। ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমি বাঁকুড়া জেলায় পখরণা দেখিয়া আসিয়াছি। স্থানটি প্রায় দুই হাজার বৎসরের পুরাতন। চন্দ্রবর্ম্মা এই পখরণারই অধিপতি ছিলেন। মানুষ অভ্রান্ত নহে। ভুল-ত্রুটি মানুষ মাত্রেরই হয়। সুতরাং ভ্রম-প্রমাদ থাকা সত্ত্বেও নগেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব কেহ অস্বীকার করিবে না। ১৩৭৬ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদে তাঁহার

শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত না হওয়ায় আমরা দুঃখিত। আমি সেই স্বর্গগত কর্মবীরের আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। বিশ্বকোষ লেনে বিশ্বনাথের একমাত্র পুত্র শম্ভুনাথকে বহুদিন পূর্বে একবার দেখিতে গিয়াছিলাম। অতঃপর তাহার সংবাদ জানি না।

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ

রাজা রামমোহন যে ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। মায়ে তাড়ানো বাপে খেদানো ছেলে নিজের বাহুবলে বার্ষিক দুইলক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার শাণিত বুদ্ধির উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হিন্দুজাতিকে রাজা চিনিতে পারেন নাই। এইজন্যই তিনি কোরাণ, বাইবেল, তন্ত্র ও তথাকথিত বেদান্ত-মিশ্রিত ধর্মের এক তিলোত্তমা গড়িতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার লেখা পড়িয়া জানিয়াছি ভারতাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে তিনি দু-চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। শ্রীকৃষ্ণের তিনি বহু নিন্দাবাদ করিয়া গিয়াছেন। রাজা রামমোহন শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেছেন—

'যুক্তি হইতে এককালে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দুর্জয় "মানভঙ্গ" "সুবল সংবাদ" এবং "বড়াই বুড়ি"-র উপাখ্যান যাহা কেবল চিত্তমালিন্যের ও মন্দ সংস্কারের কারণ হয়, তাহাকে পরমার্থ সাধন বলিয়া ও আপন ইষ্টদেবতার সঙ্কে সম্মুখে নৃত্য করায় কেবল অন্যকে এ সকল ক্রিয়া করিতে দেখিয়া সেই প্রমাণে অনুষ্ঠান করে—এমন ব্যক্তির প্রতি গড্ডালিকা বলিয়া শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়।'

পুনরায় বলিতেছেন—'গৌরাঙ্গ যাহার পরব্রহ্ম ও চৈতন্যচরিতামৃত যাহার শাস্ত্রগ্রন্থ তাহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ যদ্যপি বৃথাশ্রমের কারণ হয়, তথাপি কেবল অনুকম্পাধীন এ পর্য্যন্ত প্রতিবাদ করা যাইতেছে।'

বাঙ্গালী মনীষা আপন অজ্ঞাতসারে কেমনভাবে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছে, তাহার ক্রম-পারম্পর্য আলোচনা করিতেছি। হিন্দুর অন্তর্দেবতার এই অবমাননা এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ খাঁটি বাঙ্গালী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'গোপালস্তোত্র' ও 'বাসুদেব-চরিত' রচনা করিলেন।

ছাত্রাবস্থাতেই কাব্যের অধ্যাপক পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের অনুরোধে 'গোপালায় নমোঽস্তু মে' এই পঙক্তিটিকে শেষে রাখিয়া তিনি এই পাদপূরণ-মূলক বন্দনা-শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন—

যশোদানন্দকন্দায় নীলোৎপলদলশ্রিয়ে।
নন্দগোপালবালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে॥
ধেনুরক্ষণদক্ষায় কালিন্দীকুলচারিণে।
বেণুবাদনশীলায় গোপালায় নমোঽস্তু মে॥
ধৃতপীতদুকূলায় বনমালানিবাসিনে।
গোপস্ত্রীপ্রেমলোলায় গোপালায় নমোঽস্তু মে॥
বৃষ্ণিবংসাবতারায় কংসধ্বংসবিধায়িনে।
দৈত্যেয়কুলকালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে॥
নবনীতৈক চৌরায় চতুর্বর্গবিধায়িনে।
জগদ্ভাণ্ডকুলালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে॥

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসুদেব-চরিতের কথা সর্বজনপরিচিত। তাঁহার বাসুদেব-চরিত হইতে সামান্য মাত্র অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

'অনন্তর অষ্টম মাস পূর্ণ হইলে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর অর্ধরাত্রসময়ে ভগবান ত্রিলোকনাথ দেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন। তৎকালে দিক্‌-সকল প্রসন্ন হইল, গগনমণ্ডলে নির্মল নক্ষত্র উদিত হইল, গ্রামে গ্রামে নানা মঙ্গলবাদ্য হইতে লাগিল, নদীতে নির্মল জল, সরোবরে কমল প্রফুল্ল হইল। বন-উপবন প্রভৃতি মধুকরগীতে ও কোকিলকলরবে আমোদিত হইল এবং শীতল সুগন্ধি মন্দমন্দ গন্ধবহ বহিতে লাগিল। সাধুগণের আশয় ও জলাশয় সুপ্রসন্ন হইল। দেবলোকে দুন্দুভি-ধ্বনি হইতে লাগিল। সিদ্ধচারণ-কিন্নর-গন্ধর্বগণ গীতস্তুতি করিতে লাগিল। দেব ও দেবর্ষিগণ হর্ষিতমনে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল।'

শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থে সবিশেষ প্রবেশ না থাকিলে গোপালায় নমোঽস্তু মে ও এই কৃষ্ণজন্মকথা রচনা সম্ভব হইত না।

অতি স্বাভাবিক ভাবে জাতীয়-চেতনার প্রতিনিধিরূপে মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনা করিলেন। সজ্ঞানে না হইলেও এই 'কৃষ্ণচরিত্র' রামমোহনের মতবাদের প্রতিবাদ। একটা নবজাগ্রত জাতির সুপ্তিভঙ্গের অরুণোদয়ে জাতীয়-চৈতন্য এইরূপে সক্রিয় হইয়া উঠে।

আদর্শ মানবের অনুসন্ধান করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণে আকৃষ্ট হইয়াছিল। জটিল কৃষ্ণচরিত্রের তিনিও অনেক অংশ বুঝিতে পারেন নাই। তাই তাঁহাকে প্রক্ষিপ্তবাদের আশ্রয় লইতে হয়। সম-সময়েই গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব। গিরিশচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন ভারত তথা বঙ্গবাসীর জীবন হইতে কৃষ্ণকে অপসারিত করিবার কোন উপায় নাই। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, আছেন, থাকিবেন। তাঁহার কোন অংশেরই কাটছাট করিবার চেষ্টা একটা অপপ্রয়াস মাত্র। পাঁচশত বৎসর পূর্বে তিনি বাঙ্গালায় নূতন রূপে আসিয়া নূতন করিয়া সে কথা জানাইয়া দিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণ বাঙ্গালায় কেমন ভাবে আছেন, তাহা দেখাইবার জন্যেই গিরিশচন্দ্র চৈতন্যলীলা রচনা করেন। গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যলীলা রামমোহনের সার্থক প্রতিবাদ। বাঙ্গালার জাতীয়-চরিত্র গঠনে রঙ্গমঞ্চের শক্তি কিরূপ অমোঘ, সেই সময়েই তাহা প্রমাণিত হইয়াছিল। এই দিক দিয়া বিচার করিলে গিরিশচন্দ্রকে মনস্বী পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। মধুসূদন, বঙ্কিম, গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এই চারিজনকে যুগপ্রবর্তক বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।

গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে অমৃতলালের তুলনা করিব না। ভারতচন্দ্রের ধারায় ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু ও অমৃতলাল শিষ্যপর্যায়ে চতুর্থ স্থানীয়। অন্যদিকে অমৃতলালকে গিরিশচন্দ্রের সাক্ষাৎ শিষ্য বলাই সম্মত। গিরিশের সাহচর্যে, গিরিশের শিক্ষা-গুণেই তিনি রঙ্গক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। অমৃত-মদিরায় অমৃতলাল নিজেই গিরিশচন্দ্রকে গুরুদেব বলিয়া গিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র একাধারে নাট্যকার, নট, নাট্যশিক্ষক ও নাট্যালয়ের পরিচালক ছিলেন। অমৃতলালেও কিছু কম-পরিমাণে এই সমস্ত গুণ বর্তমান ছিল। ইঁহার অব্যবহিত পরেই আর একজন শক্তিধর পুরুষের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, তিনি আপনাকে গিরিশচন্দ্রের শিষ্যরূপেই পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। একাধারে শিক্ষক, নাট্যকার, নট এবং রঙ্গালয়-পরিচালক এই শক্তিমান পুরুষের নাম অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁহার প্রণীত 'কর্ণার্জুন' নাটকের নাম সুপরিচিত। 'অযোধ্যার বেগম', 'মগের মুলুক', 'চণ্ডীদাস', 'শ্রীগৌরাঙ্গ' প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের মত তাঁহারও অভিনেতা-অভিনেত্রী সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ছিল। নটগুরু অর্ধেন্দুশেখর (সাহেব) প্রসঙ্গ এই প্রবন্ধের আলোচ্য নহে।

নাটক সাহিত্যগুণযুক্ত না হইলে মাত্র অভিনয়ের গুণেই জনপ্রিয় হয় না। গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যলীলায় চৈতন্যের ভূমিকা অভিনয় করিতেন অভিনেত্রী-কুলরাজ্ঞী শ্রীমতী বিনোদিনী। গিরিশের লেখনী আর বিনোদিনীর অভিনয়,

যেন মণিকাঞ্চন-সংযোগ ঘটিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব অভিনয় দেখিয়া বিনোদিনীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, 'তোমার চৈতন্য হউক'। নবদ্বীপের অন্যতম রত্ন ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের পুত্র শ্রীমথুরানাথ পদরত্ন পিতার আদেশে কলিকাতায় অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন। অভিনয়-দর্শনে আত্মহারা হইয়া এই পণ্ডিতপ্রবর বিনোদিনীর পদধূলি লইতে ছুটিয়াছিলেন। কলিকাতায় নগরকীর্তন, ব্রাহ্মসমাজে খোলের বাদ্য ইত্যাদি ঐ চৈতন্যলীলারই ফলশ্রুতি।

মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'কে আমি একখানি সার্থক নাটক বলিয়া মনে করি। পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে রচিত প্রথম ব্যাকরণসম্মত নাটক কৃষ্ণকুমারী। সাহিত্যের দিক দিয়াও ইহার মূল্য আছে। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' ঐতিহাসিকের তালিকায় থাকিবে। কিন্তু 'সধবার একাদশী' সমসাময়িক সমাজের চিত্র হইলেও সময়কে অতিক্রম করিয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের রচিত 'বলিদান' আধুনিক সমাজের রুচিকর না হইতে পারে, কিন্তু 'প্রফুল্ল'র আদর চিরকাল থাকিবে। গিরিশের 'সিরাজউদ্দৌলা' একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর নাটক। এই নাটকখানির গাঁথুনি এত সুন্দর যে নাটক হইতে একটি চরিত্রও বাদ দেওয়া চলে না। নাটকের প্রত্যেক চরিত্রেই গিরিশচন্দ্রের সৃজনীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমের উপন্যাসকে নাটকাকারে রূপ দিতে গিয়া তিনি যে শক্তিমত্তার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাও কম বিস্ময়কর নহে। অপরেশচন্দ্রের 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' হইতে তাহার দুইটি উদাহরণ তুলিয়া দিতেছি। অপরেশচন্দ্র একস্থানে বলিয়াছেন—

'উপন্যাসে দৃশ্য-বিভাগের কোন বালাই নাই। পাত্রপাত্রী পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে ক্রমাগত পাঠককে তাহাদের কাহিনী শুনাইয়া যাইতে পারেন, কোন বিষয়ের বা চরিত্রের রহস্যোদ্ভেদ প্রথমে না করিয়া গ্রন্থকার পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত রাখিবার জন্য নিজের ইচ্ছা বা সুবিধামত স্থানে তাহা উদ্ঘাটন করিলেও কোন ক্ষতি হয় না। পুস্তকের শেষে কোন নূতন চরিত্রের অবতারণা করিলেও উপন্যাসের কিছু যায় আসে না। দুই বা ততোধিক গল্প পরস্পরের সহিত জড়িত না করিয়াও স্বতন্ত্র ভাবে দেখান যাইতে পারে। তাহাতে চরিত্র-চিত্রণের বা রস-বিকাশের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু নাটকে এরূপ করিবার উপায় নাই। নাটক জন্মায়, তাহাকে তৈয়ারী করিতে হয় না। যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে গাছ এবং গাছ হইতে ফল প্রসূত হয়, তেমনই নাটকও কোন বিশেষ ঘটনা বা বিশেষ ভাব বা রসকে অবলম্বন করিয়া ফুটিয়া

উঠে, তাহার ক্রমবিকাশ হয় এবং তাহা বীজানুযায়ী বৃক্ষের মতই স্বাভাবিক ভাবে চরম পরিণতি লাভ করে।' (অর্থাৎ ফল দান করে)।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে কবির বর্ণনায় আমরা আয়েষার অঙ্গুরীয় নিক্ষেপ দেখি। এ সেই আয়েষাই বটে—যে একদিন মুক্তকণ্ঠে নিশীথে কারাগারে ওসমান ও জগৎসিংহের সম্মুখে বলিয়াছিল, 'এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর'। যে দৃঢ়তা লজ্জাবনতমুখী কুসুম-কোমলা আয়েষাকে একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে মুখরা করিয়াছিল, সেই দৃঢ়তাই আত্মহত্যার প্রলোভন হইতে রক্ষা করিয়া আজ তাহাকে সত্যসত্যই রমণীললামভূতা করিয়াছে। উপন্যাসে এ দৃশ্যে আয়েষা যেমন সমুজ্জ্বল, রঙ্গমঞ্চের উপর কেবলমাত্র স্বগতোক্তিকারিণী আয়েষার সে ঔজ্জ্বল্য কোথায়? ওসমানকেও আমরা হারাইয়া আসি উপন্যাসে জগৎসিংহের সঙ্গে তাহার দ্বৈতযুদ্ধে। উপন্যাসের পরবর্তী পরিচ্ছেদে তাহাকে না পাইয়াও তাহার জন্য আর কোন আগ্রহ থাকে না। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের উপর জীবন্ত অভিনয় দেখিয়া দর্শকের চিত্ত আপনা হইতেই প্রশ্ন করে, 'ভগ্নহৃদয় প্রত্যাখ্যাত ওসমানের কি হইল?' নাট্যকার গিরিশচন্দ্র এই দুই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন 'দুর্গেশনন্দিনী'র শেষ দৃশ্যে। এখানে বিষাদময়ী আয়েষা বিষাদ-আচ্ছন্ন ওসমানের সঙ্গে কথোপকথনে আপনি ফুটিয়াছে, ওসমানকেও ফুটাইয়াছে। স্থান বিষাদময়, নীলবর্ণ গগনমণ্ডলে লক্ষ লক্ষ তারা যেন অগ্নিবর্ষণ করিতেছে, পেচক-ফুৎকারে আয়েষার কর্ণে অবিরাম ধ্বনি তুলিতেছে, বিষাদ, বিষাদ। গরলমাখা অঙ্গুরীয় বলিতেছে আর কেন, জীবন তো বিষাদময়, এস আমার সাহায্যে এ যন্ত্রণার শেষ কর! গরীয়সী আয়েষা নারীসুলভ দুর্বলতাকে পায়ে দলিয়া পরিখা-জলে অঙ্গুরীয় ফেলিয়া দিল। এমন সময় রঙ্গমঞ্চে ওসমান প্রবেশ করিল। বলিল—ওসমানের বাক্যে সেই জ্বালা, সেই তীব্র ব্যঙ্গ—'নবাবপুত্রী একবার দেখতে এলেম, তুমি কেমন আছ; দেখতে এলেম, দেখা দিতে এলেম, কেমন আছি বলতে এলেম। দেখছি বড় বিষণ্ণ, কিন্তু কেন? এত ভালবাসার প্রতিদান পাও নি?' আয়েষা বলিতেছে, 'ওসমান, আমি প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষিণী নই। যদি তোমার তিরস্কার করবার ইচ্ছা হয়, তিরস্কার কর। ওসমান তুমি বড় কষ্ট পেয়েছ, আমি জানি। আমিও বড় কষ্ট পেয়েছি। কি করব ওসমান, আমি নিরুপায়!'

দুই সমব্যথী, দুই বাল্যসহচর-সহচরী; প্রত্যাখ্যানের জ্বালায়, হতাশ প্রণয়ে দুজনেরই চিত্তে অশান্তি। সে শ্রী নাই, সে রস নাই, হৃদয় যেন তপ্ত অঙ্গারের আধার। আয়েষা বলিতেছে, 'ওসমান আমি নারী হয়ে সহ্য করেছি, তুমি কেন

পারছ না ?' উত্তরে ওসমান বলিতেছে, 'একবার তোমায় দেখে যাই, কেমন আছ দেখে যাই। তুমি কি সহ্য করেছ ? তুমি কদিন জগৎসিংহকে রুগ্নশয্যায় শুশ্রূষা করেছ ? আমি রণে-বনে-দুর্গমে শয়নে-স্বপনে দিবারাত্রি তোমায় দেখছি। কি সহ্য করেছ ? আমার মত সহ্য কর নি, আমার মত সহ্য কর নি!' মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাসের সহিত আয়েষার অস্ফুট কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইল, 'হা জগদীশ্বর!' যবনিকা পড়িল, দর্শক পূর্ণ বিষাদের দুইটি চিত্র তাঁহার চিত্তে অঙ্কিত করিয়া গৃহে ফিরিলেন। উপন্যাসে বর্ণিত দৃশ্য এইরূপ ঘাত-প্রতিঘাতে উপন্যাসের মূল চরিত্রকে অটুট রাখিয়া নাটকীয় সম্পদে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

গিরিশচন্দ্রের পূর্বে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সীতারাম নাটকাকারে পরিবর্তিত করিয়াছিলেন। কর্ণার্জুনের পঞ্চাশৎ অভিনয়-পূর্তির উৎসবে অপরেশচন্দ্র বিহারীলালকে আমন্ত্রণপূর্বক সম্বর্ধিত করিয়াছিলেন। বিহারীলাল গল্প করিয়াছিলেন, 'আমরাও' "সীতারাম" করিয়াছিলাম। স্টেজের মধ্যেই বিবাহ দিয়াছিলাম।' সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সীতারামে বিয়ে ? কার বিয়ে ?' বলিলেন, 'ঐ যে অবীরে মেয়েটা ত্রিশূল ঘাড়ে ঘুরে বেড়াত, ঐ জয়ন্তী'! জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বিয়ে দিলেন কার সঙ্গে ?' বিহারীলাল বলিলেন, 'দিলাম ঐ মেনাহাতীর সঙ্গে। ওর-ও তো তিন কুলে কেউ নাই।'

অতুলকৃষ্ণ মিত্র সুকবি ছিলেন, তাঁহার গীতিনাটিকা রঙ্গমঞ্চে সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছে। তিনি 'কপালকুণ্ডলা'কে নাটক করিয়াছিলেন। অতুলকৃষ্ণ কপালকুণ্ডলাকে প্রথম দেখাইতেছেন স্থান—বালিয়াড়ী, দূরে নদী-গর্ভে নৌকা দেখা যাইতেছে। কপালকুণ্ডলা কাপালিককে জিজ্ঞাসা করিল—'ওটা কি বাবা ?'

কাপালিক—গঙ্গাসাগর যাবার নৌকা!

কপালকুণ্ডলা—ওতে কারা আছে ?

কাপালিক—ওতে মানুষ আছে।

কপালকুণ্ডলা—মানুষ কি বাবা ?

ইহা সেই টেম্পেস্টের অনুকরণ। বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলার সঙ্গে ইহার কোন সামঞ্জস্য নাই। কারণ, গ্রন্থের কয়েক পরিচ্ছেদ পরেই কপালকুণ্ডলা অধিকারীকে বলিতেছে, 'যখন তোমার শিষ্য এসেছিল তখন আমাকে যেতে দাও নি কেন ?' নবকুমারকে দেখিয়া বলিয়াছিল, 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?' সুতরাং সে মানুষ চিনিত।

গিরিশচন্দ্র 'সীতারাম' নাটক করিয়াছিলেন। সীতারামেও গিরিশচন্দ্র একটি গুরুতর সমস্যার মীমাংসা করিয়াছিলেন, সীতারামের শেষ দৃশ্যের অবতারণায়। উপন্যাসে আছে শ্রী গঙ্গারামের শব দাহ করিয়া অন্ধকারে কোথায় মিলাইয়া গেল। আর রামচাঁদ শ্যামচাঁদ তামাক খাইতে খাইতে জানাইয়া দিল মুর্শিদাবাদে সীতারামকে নাকি শূলে দিয়াছে। কিংবা সেই দেবতা আসিয়া সীতারামকে কোথায় লইয়া গিয়াছে। উপন্যাসে রামচাঁদ শ্যামচাঁদ এই বলিয়া তামাক সাজিয়া টানিলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের উপর এ সকল দৃশ্যের কোন সার্থকতা নাই! এতবড় একটা বিয়োগান্ত কাব্য, রঙ্গমঞ্চে তাহার পরিণতি তদুপযোগী বিয়োগান্ত দৃশ্যে হইলেই সঙ্গত ও শোভন হয়। উপন্যাসে পড়িয়া এই বিয়োগান্ত রসের কোন ব্যতিক্রম আমরা উপলব্ধি করি না। কিন্তু অভিনয় কালে শেষ দৃশ্যে এইরূপ তামাক সাজিয়া টানিলে গুড়ুকখোর দর্শককেও ঢুলিতে হয়। গিরিশচন্দ্র সীতারাম-চরিত্রের বিয়োগ-ব্যথিত সুরকে অব্যাহত রাখিয়া নাটকের শেষ দৃশ্যে শ্রীর সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়া উভয় চরিত্রকেই এমনই ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যাহা সত্যই অতুলনীয়। সর্বস্বহারা পরাজিত সীতারাম রণক্ষেত্র হইতে পলাইতেছেন, উদ্‌ভ্রান্ত সীতারাম বুঝিতে পারিতেছেন না তিনি কোন্ সীতারাম! যবন-বিধ্বংসী হিন্দুরাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা সীতারাম, না শ্রীর প্রেমে উন্মত্ত সীতারাম? এমন সময় সন্ন্যাসিনী শ্রী আসিয়া পদপ্রান্তে-লুন্ঠিতা হইয়া বলিতেছে, 'আমায় গ্রহণ কর'। সম্মুখে শ্মশান, পশ্চাতে শ্মশান, উর্ধ্বে শ্মশান-ধূম, পদতলে হিন্দু-মুসলমানের রক্তরঞ্জিত কর্দম, আর তাঁহারই মাঝখানে সেই সীতারাম, সেই শ্রী! যেন, সমস্ত উপন্যাসের স্তরে-স্তরে বিন্যস্ত জীবন-আখ্যায়িকা মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া দর্শকের সম্মুখে তাহার পরিপূর্ণ স্মৃতি জাগরিত করিয়া দিতেছে। শ্রী বলিতেছে, 'মহারাজ, আমায় গ্রহণ কর।' সীতারাম বলিতেছেন—'...কোরব, তোমায় গ্রহণ কোরব, কিন্তু কোথায় গ্রহণ কোরব? অট্টালিকায় তোমায় গ্রহণ করা হবে না, সেখানে রমা মরেচে। নগরে তোমায় গ্রহণ করা হবে না, সোনার মহম্মদপুরী ভস্মীভূত হয়েচে। কুটীরে তোমায় গ্রহণ করা হবে না, কুটীর শূন্য করে কুটীরবাসী পালিয়েচে। কোরব, তোমায় গ্রহণ করব। আমার এখনো মমতা যায় নি; চল, স্থান খুঁজিগে, চল, স্থান খুঁজিগে, চল।' উন্মত্ত সীতারাম অনন্তের ক্রোড়ে স্থান খুঁজিতে খুঁজিতে নদীগর্ভে আশ্রয় লইলেন, শ্রী তাঁহার অনুসরণ করিল। নাটকাকারে সীতারামের পরিসমাপ্তি এইখানে।

গিরিশচন্দ্র দর্শকের নাড়ীনক্ষত্র জানিতেন। এইজন্যই তাহারা যাহা চাহিত তাহারই মাধ্যমে তাহাদের চাওয়ার অতিরিক্ত এমন কিছু দান করিতেন যাহা পাইলে জাতির জীবন ধন্য হয়, কুল পবিত্র এবং জননী কৃতার্থা হন। বাঙ্গালীকে তিনি যেমন জানিয়াছিলেন চিনিয়াছিলেন, এমন আর কয়জন জানিয়াছে, চিনিয়াছে? তাঁহার সম্বন্ধে কোন অতিশয়োক্তির আবশ্যকতা নাই, তাঁহাকে গ্যারিক শেক্সপীয়ারও বলিতে হইবে না। তাঁহার জন্য কোন সমালোচককে মানদণ্ডও ভাঙ্গিতে হইবে না, গজ-ফিতাও কাটিয়া ছোট করিবার দরকার নাই। কিন্তু তিনি যে একজন প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার, এ কথা অস্বীকার করিলে সত্যকেই বিকৃত করা হইবে। তিনিই বাঙ্গালার নাট্যশালার জনক, তিনিই ইহার প্রতিপালক। ইহার আর খুড়া-জ্যাঠা কেহ নাই। নব্যরঙ্গের স্রষ্টাগণের মধ্যে তিনিও একজন। এ কথা না মানিলে মহদতিক্রমের অপরাধ হইবে। সে কালে রঙ্গমঞ্চের জন্য তিনি কি অপরিসীম ত্যাগস্বীকার করিয়াছিলেন, আজিকার সমালোচক তাহা ভুলিতে পারেন, কিন্তু ইতিহাস তাহা ভুলিবে না। তিনি অসাধারণ শক্তিধর ছিলেন। কিন্তু রঙ্গমঞ্চকে বাঁচাইতে গিয়া, অভিনেতা-অভিনেত্রীগণের উপযোগী চরিত্র রচনা করিতে গিয়া তিনি বহু শক্তির অপচয় করিয়াছেন, তথাপি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যে কালজয়ী রচনার অভাব নাই। গিরিশচন্দ্র আজিও স্মরণীয় এবং প্রণম্য।

নাট্যকার অপরেশচন্দ্র

বাঙ্গালা সন তেরশত বাইশ সাল। হেতমপুর রাজবাড়ীতে বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির সহ-সম্পাদকরূপে বীরভূমের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের কাজে লাগিয়াছি এক বৎসর আগে। রাজবাড়ীতে ৺সরস্বতী পূজার খুব ধুম হইত। যাত্রা, কবিগান, ঝুমরীনাচ—সর্বসাধারণের আমোদের উপকরণ ছিল প্রচুর। কলিকাতা হইতে মিনার্ভার দল লইয়া থিয়েটার করিতে আসিলেন অপরেশচন্দ্র। হেতমপুরের রাজাদের একটা সখের যাত্রা ও একটা থিয়েটারের দল ছিল। থিয়েটারের বাঁধা স্টেজ ছিল। দর্শকদের বসিবার আসন ছিল। কলিকাতার দল সেই স্টেজেই থিয়েটার করিবেন। মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন অপরেশ-

চন্দ্রের পৃথক বাসা দিয়া তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন আমার উপর। আমি হেতমপুরে যাওয়ার পর নানা কারণে কোন জ্ঞানীগুণী আসিলে রাজকর্মচারীদের উপর নির্ভর না করিয়া মহারাজকুমার তাঁহাদের দেখাশোনার ভারটা আমাকেই দিতেন। মহারাজকুমারের সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি 'রমাবতী' নাম দিয়া একখানি নাটকও লিখিয়াছিলেন, ছাপাইয়াছিলেন। রাজবাড়ীর স্টেজে সেটা অভিনীতও হইয়াছিল কয়েকবার। আমি এবং রাজাদের জমিদারীর ম্যানেজার বন্ধুবর শ্রীবনবিহারী ঠাকুর ঐ নাটকে অভিনয়ও করিয়াছিলাম একবার। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কয়েকবারই হেতমপুরে আসিয়াছিলেন। মহারাজকুমার তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিতেন।

অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে ছিলেন প্রবোধ গুহ এবং রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসুর গুণী পুত্র জানকীনাথ বসু। অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম আলাপের পর আসিলেন লাভপুরের নাট্যকার নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজবাড়ীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে। তাঁহার সঙ্গে আমার এবং অপরেশচন্দ্রেরও পূর্ব হইতেই পরিচয় ছিল। সুতরাং নির্মলের মাধ্যমে আলাপটা বেশ জমিয়া উঠিল। মহারাজকুমার কলিকাতায় গিয়া রিপণ স্ট্রীটের বাড়ীতে অপরেশচন্দ্রকে একদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। কয়েক বৎসর পর নির্মলশিবের 'নবাবী আমল' নাটক লইয়া আমি অপরেশচন্দ্রের ভালুকপাড়ার কলিকাতার বাড়ীতে মাসখানেক থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তিনি আমাকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর কলিকাতায় তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন ঠিকানার বাসাবাড়ীই আমার সেদিনের কলিকাতার আশ্রয়স্থান ছিল। পনের-কুড়ি দিন এমনকি একমাস পর্যন্তও থাকিতাম আমি কলিকাতায় গিয়া তাঁহার বাসায়। যতবার গিয়াছি—প্রথম দিনের মতই অনুজের অধিকারে প্রতিবার সমান স্নেহেই অভ্যর্থিত হইয়াছি। অকপট অন্তরের অনাবিল সরল মধুর স্নেহ। কলিকাতার বাসাবাড়ীতে, স্টার থিয়েটারে, নাগের বাজারে—গদাই মল্লিকের বাগানে, তাহার সাঁওতাল পরগণার জামতাড়ার বাড়ীতে—কখনও কখনও কয়েকদিন ধরিয়াই তাঁহার চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গীও ছিলাম। আহার-নিদ্রা-বিশ্রাম এক সঙ্গে। সুতরাং আমি তাঁহাকে যেমন জানিয়াছি, চিনিয়াছি, বোধহয় অপর কাহারও সে সুযোগ ঘটে নাই। বাতের তীব্র আক্রমণ-জনিত অপটু শরীরে নিজের হাতে তিনি বড় বেশী লিখিতে পারিতেন না। তাঁহার 'গণেশ'-কর্ম করিতাম প্রধানতঃ তিনজনে—জানকী বসু, রাধাচরণ ভট্টাচার্য এবং আমি। কখনও কখনও প্রবোধ গুহ। কর্ণার্জুন

হইতেই আমার 'গণেশ'-কর্মের আরম্ভ বলিতে পারি। অনেকটা পদ্মাসনের ভঙ্গিতে বসিয়া একটানা তিনি ছয়-সাত ঘণ্টা বলিয়া যাইতেন। একবার সারারাত্রি জাগিয়া একখানা ইংরাজী নাটকই অনুবাদ করিয়া ফেলিলেন, মুখে মুখে। লিখিলেন জানকী বসু মহাশয়। ঘটনাটা বলি—মিনার্ভায় থাকিতে তিনি সংবাদ পাইলেন স্টারে 'সাইন্ অব দি ক্রশ' অনুবাদের চেষ্টা হইতেছে। প্রবোধ গুহ বলিলেন, 'এঁরা নিশ্চয়ই মূল নাটক পায় নি। হয় উপন্যাস, নয় বায়স্কোপের গল্পটা দেখে অনুবাদ করবেন। আমি এম্পায়ার থেকে মূল নাটক এনে দিতে পারি।' অপরেশচন্দ্র বলিলেন 'আনুন'। প্রবোধ গুহ নাটক আনিয়া দিলেন। ঘণ্টা দশ ধরিয়া একাসনে বসিয়া তিনি নাটকখানা অনুবাদ করিয়া ফেলিলেন। নাম হইল 'আহুতি'। 'আহুতি' মিনার্ভায় অভিনীত হইয়াছিল। 'শ্রীরামচন্দ্র' নাটক লিখিয়াছিলেন অপরেশচন্দ্র চৌদ্দ দিনে। অভিনয় হইয়াছিল কোহিনূরে। গিরিশচন্দ্রের পরে এমন একাধারে নাট্যকার, অভিনেতা, অভিনয়-শিক্ষক ও থিয়েটার-পরিচালক বাঙ্গালায় আর দ্বিতীয় কেহ ছিলেন না সেকালে। পাতিপুকুরের ওদিকে নাগের বাজারে কলিকাতার সুবর্ণ-বণিক বংশের অন্যতম ধনী বন্ধু গদাই মল্লিকের বাগানে তাঁহার অধিকাংশ নাটকই লিখিত হইয়াছিল। দিনে রান্নাবান্না, খাওয়া-দাওয়া, গল্প-গুজবেই কাটিত। বেশ ভোজনবিলাসী ছিলেন. স্টোভে ও ইকমিক কুকারে নিজেই রাঁধিতেন। খাওয়ার পর দীর্ঘ নিদ্রা। খাওয়ার শেষে রাত্রি দশটা হইতেই লিখিবার সময় নির্দিষ্ট ছিল। গদাই মল্লিকের সর্দার-মালী হুলা দশ-বারোটি কলিকায় তামাক সাজিয়া উপরে টিকা গুছাইয়া রাখিয়া যাইত। আমরা পরের পর কলিকায় আগুন দিয়া লইতাম। সিগারেট খাইতেন যে রাত্রে তামাকের পরিবর্তে, একটি নূতন কৌটা খোলা হইত। রাত্রি তিনটা পর্যন্ত লেখা চলিত, ঐ সময়ের মধ্যে কলিকা কিংবা সিগারেট ও খতম হইয়া যাইত, পুড়িয়া ছাই! অপরেশচন্দ্র মনে প্রাণে খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালীয়ানার গৌরব করিতেন। বাঙ্গালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতি লইয়া তাঁহার মনে বেশ একটা গর্বের ভাব ছিল। তবে ন্যাকামি ভণ্ডামি দেখিতে পারিতেন না। সুযোগ পাইলে আঘাতও হানিতেন নিজের নাটকে। বেশ মজলিশি লোক ছিলেন অপরেশচন্দ্র।

দুই

ভগবান মুখোপাধ্যায়ের নিবাস বর্ধমান জেলার নাড়ুগ্রামে। ভগবানের আরও ছয় ভাই ছিল, তাই ইহারা সাতভাই মুখুজ্জে নামে পরিচিত ছিলেন। লোকে বলিত 'সাতভেয়েরা।' ভগবান বিবাহ করিয়া মহেশপুরে শ্বশুরালয়ে আসিয়া বাস করেন। মহেশপুর সেকালে ছিল নদীয়ায়, পরে যায় যশোহরে। এখন কোথায়? সন ১২৮২ সালের ৪ঠা শ্রাবণ পিতার মামার বাড়ীতে মহেশপুরে অপরেশচন্দ্রের জন্ম হয়।

পিতা বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়—নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত 'কৃষিতত্ত্ব' পত্রের সম্পাদক হইয়া কলিকাতায় আসেন। পাইকপাড়ার যে বাড়ীতে বিপ্রদাস থাকিতেন অপরেশচন্দ্র সে বাড়ী আমাকে দেখাইয়াছিলেন। টালার মুখুজ্জে-বাড়ীর পাশের পাঠশালায় অপরেশচন্দ্রের পাঠ শুরু হয় পাঁচ বৎসর বয়সে। কিছুদিন পরে বিপ্রদাস মেদিনীপুরের একটি বিদ্যালয়ে হেডপণ্ডিত হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করেন। সে সময় প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহোদয় বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক ছিলেন। বিপ্রদাস মেদিনীপুরে যে পাড়ায় থাকিতেন সেখানে চৌকিদার রাত্রে রোঁদে বাহির হইয়া হাঁক দিত 'ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্'। স্বনামধন্য রাজনারায়ণ বসুর তখন মেদিনীপুরে প্রবল প্রতিষ্ঠা। মেদিনীপুর হইতে বিপ্রদাস কলিকাতায় আসিয়া মাণিকতলায় বাসা লইলেন। তিনি মাসে মাসে খণ্ড খণ্ড আকারে পাকপ্রণালী বাহির করিতে লাগিলেন। অপরেশচন্দ্র প্রথম বেঙ্গল একাডেমীতে, পরে নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে, শেষে মেট্রপলিটানে আসিয়া কেতাবতী শিক্ষায় পূর্ণচ্ছেদ টানেন। সন ১২৯৯ সালের কার্তিকী অমাবস্যায় তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তখন স্কুলের শেষ পরীক্ষা হইত চৈত্র মাসে। তিনি পরীক্ষার খাতায় অঙ্কের প্রশ্নের উত্তরে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদের বুক্‌নীগুলি লিখিয়া রাখিয়া চলিয়া আসেন।

স্কুল-যাতায়াতের পথেই তাঁহার থিয়েটারের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। স্বনামধন্য মনোমোহন পাঁড়ের পিসতুতো ভাই নসীরাম (সুরেন্দ্রনাথ) তাঁহাকে এক আড্ডায় লইয়া যান। এইখানেই 'প্রভাকরে'র সুবিখ্যাত ঈশ্বর গুপ্তের ভাইয়ের নাতি মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের সঙ্গে অপরেশচন্দ্রের পরিচয় ঘটে। এই পরিচয়ের ফলেই তিনি 'প্রভাকরে' কিছু কিছু লিখিতে আরম্ভ করেন। মাঝে মাঝে প্রুফও দেখিয়া দিতেন। পরে 'প্রয়াস' নামক একখানা কাগজেও লিখিতেন। বোধ হয়, রসময়

সাহা এবং শৈলেন সরকার সম্পাদক। প্রয়াসের সংশ্রবে সুরেশ সমাজপতি, কবি অক্ষয় বড়াল প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ হয়।

মণীন্দ্র গুপ্ত রাজকৃষ্ণ রায়ের বীণা থিয়েটার লইয়া নাম দেন প্যাণ্ডোরা। 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' রিহার্সাল দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু অভিনয়ের সুযোগ হয় নাই। বাড়ীতে মা নাই, তার উপরে থিয়েটারে যাতায়াত! পিতার কঠোর তিরস্কারে অপরেশচন্দ্র দেশত্যাগী হইলেন। প্রথমে বর্ধমান, পরে রাণীগঞ্জ, তাহার পরে পাটনা, কাশী, জামালপুর, ভাগলপুর ঘুরিয়া তিনি বাড়ী ফিরিলেন। কিন্তু দিন-যাপনের উপায় কি? কিছুদিন সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার কে. বি. দত্তের পিতাকে ভাগবত শুনাইতেন। বৈকাল হইলেই তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইতেন। দেখিতেন একটি চৌকির উপর গ্রন্থখানি সাজান আছে। দত্তের পিতাঠাকুর বলিতেন, 'এসেছেন ব্রাহ্মণ, প্রাতঃপ্রণাম'। পাঠ শুনাইয়া জলযোগ। দত্তের পিসীমা পরিপাটিরূপে জলখাবার খাওয়াইতেন। কিছু প্রণামীও মিলিত, কিন্তু সে যৎসামান্য। ঠিকাদারীর কাজে কিছুদিন গেল। কিছুদিন গেল ই. আই. আর-এর পার্শেল অফিসে। অতঃপর হোরমিলার কোম্পানীর কেরাণীগিরি প্রায় ছয় বৎসর। এমনই করিয়া আট-নয় বৎসর কাটিয়া গেল। থিয়েটারের সঙ্গে যোগসূত্র কিন্তু অক্ষুণ্ণ ছিল। নলডাঙ্গার জমিদার এক বন্ধুর থিয়েটার ছিল। এই থিয়েটারেও তিনি যাইতেন। এই বন্ধুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুকেশরঞ্জন দেবরায় বীরভূমের সিউড়ীতে এস. ডি. ও. হইয়া আসিয়াছিলেন। সিউড়ীতে থিয়েটার করিতে আসিয়া অপরেশচন্দ্র দেবরায় ও তাঁহার মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। মা একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া দুপুরে খাওয়াইলেন। আমি সঙ্গে ছিলাম। সন তেরশত চারি সাল, কি পাঁচ সাল, পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়।

সন ১৩১১ সালে নড়াইলের জমিদার বন্ধুর ইলিসিয়াম থিয়েটারে যোগ দিয়াছিলেন। শিক্ষক অর্ধেন্দুশেখর মুস্তৌফী। অধ্যক্ষ জানকীনাথ বসু। 'কপালকুণ্ডলা'য় নবকুমার, 'চন্দ্রশেখরে' চন্দ্রশেখর এবং 'জনা'য় প্রবীরের ভূমিকা শিক্ষা করিয়াছিলেন, অভিনয় হয় নাই। এই বৎসরেই মনোমোহন পাঁড়ে মিনার্ভা থিয়েটার লীজ লইয়াছিলেন। ভাদ্র মাসে অর্ধেন্দুশেখর মিনার্ভায় আসেন। অধ্যক্ষ চুনীলাল দেব। শনিবারে 'কপালকুণ্ডলা' ও রবিবারে 'সংসার' অভিনীত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। অভিনয় করিবার কথা মনোমোহন গোস্বামীর। বৃহস্পতিবার তিনি নোটীশ দিলেন 'আর থিয়েটার করিব না'। অর্ধেন্দুশেখরের নির্দেশে চুনীলাল অপরেশচন্দ্রকে শনিবারে নবকুমার ও রবিবারে

প্রিয়নাথের ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে তুলিলেন। পাবলিক্ থিয়েটারে সেই অপরেশচন্দ্রের হাতেখড়ি। অপরেশচন্দ্র কিছুদিন এমারেল্ড থিয়েটারে মহেন্দ্র বসুর নিকটও শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময় সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী তিনকড়ি মাঝে মাঝে অভিনয়ে নামিতেন। 'জনা'য় তিনি জনা, চুণীলাল প্রবীর। এক্ রাত্রিতে চুণীলাল অপরেশচন্দ্রকে প্রবীরের ভূমিকা দিয়া নিজে অর্জুন সাজিলেন। তিনকড়ি নূতন লোক দেখিয়া রাগ করিয়া চুণীলালের নিকট নালিশ জানাইলেন। কিন্তু চুণীলালের দৃঢ়তা দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং নূতন অভিনেতা অপরেশচন্দ্রের সঙ্গেই অভিনয় করিলেন। অপরেশচন্দ্র ও-দিনের কথা বিস্মৃত হন নাই। নিজের সুদিনে এবং চুণীলালের দুর্দিনে তাঁহাকে 'আর্ট থিয়েটার লিমিটেডে' আনিয়া এই কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। আমরা 'অযোধ্যার বেগমে' চুণীলালকে সুজাউদ্দৌলার ভূমিকায় দেখিয়াছি। সন ১৩১১ সালের ২৫শে অগ্রহায়ণ মিনার্ভায় ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' অভিনীত হয়। চুণীলাল প্রতাপ, অর্ধেন্দুশেখর বিক্রমাদিত্য ও রডা। অপরেশচন্দ্র শঙ্কর। তারাসুন্দরী কল্যাণী। চুণীলালের প্রণীত 'নাসিব' এবং অর্ধেন্দুশেখরের 'ভগবান ভূত' জমিল না। টাকার খুব টানাটানি! মিনার্ভার দল গেলেন মফঃস্বলে, কটক ঘুরিয়া মালদহ। ঝগড়া বাঁধিয়া দল ভাঙ্গিয়া গেল। চুণীলাল দল ত্যাগ করিলেন। গিরিশচন্দ্র আসিলেন মিনার্ভায়। ১৩১১ সালে ৩রা ফাল্গুন অধ্যক্ষরূপে তাঁহার নাম বিজ্ঞাপিত হইল। তাঁহার 'হরগৌরী' জমিল না। ১৩১১ সালের ২১শে চৈত্র গিরিশচন্দ্র 'বলিদান' খুলিলেন—করুণাময় গিরিশচন্দ্র, দুলালচাঁদ দানী (সুরেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্রের পুত্র), অপরেশচন্দ্র কিশোর। 'বলিদান' খুব জমিয়াছিল। ১৩১২ সালে শ্রাবণ মাসে 'রাণাপ্রতাপ' খোলা হইল। দানী প্রতাপ, অপরেশচন্দ্র শক্তসিংহ। ১৩১২ সাল ২৪শে ভাদ্র গিরিশচন্দ্রের সিরাজউদ্দৌলা অভিনীত হইবে। মনোমোহন পাঁড়ে চাহেন সিরাজ অপরেশচন্দ্র। গিরিশচন্দ্র চাহেন সিরাজরূপে দানীকে। মতভেদের সূচনায় তিনি গিরিশচন্দ্রকে সিরাজের ভূমিকা-লিপি ফেরৎ দিয়া মিনার্ভা হইতে চলিয়া আসেন।

তিন

অক্ষয়কালীকুমার তাঁহাকে স্টারে লইয়া গেলেন। অবৈতনিক অভিনেতা রূপে তিনি যোগ দিলেন অমৃত মিত্রের নিকট শিক্ষার আশায়। 'পলাশীর

প্রায়শ্চিত্তে' মোহনলালের ভূমিকায় প্রশংসা অর্জন করিলেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। শরৎচন্দ্র রায় কোহিনূর খুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। অপরেশচন্দ্র তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ১৩১৪ সালের ২৬শে শ্রাবণ 'চাঁদবিবি' অভিনীত হইল। অপরেশ মালোজীর ভূমিকায় প্রশংসা অর্জন করিলেন। বৎসর দুই কোহিনূরে থাকিয়া নিজে এক থিয়েটার খুলিলেন বাণী থিয়েটার ; উহা চলে নাই। বাঙ্গালা ১৩১৬ সালের শেষের দিকে ইং ১৯১০ সালে এম্পায়ার থিয়েটারে আমেরিকান টুরিস্টদের জন্য একটা অভিনয়ের আয়োজন হয়। ব্যারিস্টার শ্রীশচন্দ্র বসু উদ্যোক্তা। বাণী থিয়েটার এম্পায়ারে অভিনয় করে। এই খানে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার পরিচয়। এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে ঘনীভূত হইয়াছিল। প্রবোধচন্দ্র থিয়েটারের সঙ্গে জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। বাণী থিয়েটারে লোকসান হওয়ায় অপরেশচন্দ্র পুনরায় মিনার্ভায় আসিলেন সন ১৩১৭ সালে। তখনও গিরিশচন্দ্র মিনার্ভায়। মনোমোহন পাঁড়ে স্বত্বাধিকারী। ১৩১৮ সালে মহেন্দ্র মিত্র মিনার্ভা লীজ লইয়াছিলেন। এই সময় প্রকাশ্য নীলামে মনোমোহন পাঁড়ে কোহিনূর কিনিয়া লন। মহেন্দ্র মিত্রের মৃত্যুতে পুনরায় মনোমোহন মিনার্ভার দখল লইলেন। কোহিনূর হইতে আবার অপরেশচন্দ্র মিনার্ভায় আসিলেন। অভিনয় করিলেন —'গৃহলক্ষ্মী' নাটকে হীরু ঘোষালের। বেশ প্রশংসা হইল। ১৩১৯ সালের ৫ই আশ্বিন গৃহলক্ষ্মীর প্রথম অভিনয়। ১৩২১ সালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। সেই সময়েই প্রথম নাটক অপরেশচন্দ্রের 'রঙ্গিলা' মিনার্ভায় অভিনীত হয়। কিন্তু তিনি কোন কারণে মিনার্ভা ত্যাগ করেন।

পুনরায় তিনি মিনার্ভায় ফিরিলেন ১৩২২ সালে।

১৩২২ সালে উপেন্দ্রনাথ মিত্র মিনার্ভা লীজ লইলেন। অধ্যক্ষ হইলেন অপরেশচন্দ্র। দ্বিতীয় নাটক 'আহুতি', তৃতীয় নাটক 'শুভদৃষ্টি' ও চতুর্থ নাটক 'রামানুজ' মিনার্ভায় অভিনীত হইল। মিনার্ভায় কাটিয়া গেল কয়েক বৎসর। ১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তিনি স্টারে যোগ দিলেন, গিরীন্দ্র মল্লিকের সঙ্গে। দেড় বৎসর পরে নিজেই স্টারের ভার গ্রহণ করিলেন। সন ১৩২৭ সালে অপরেশচন্দ্রের 'রাখীবন্ধন' স্টারে অভিনীত হইল। তাহার পর ক্রমান্বয়ে অভিনীত হইল 'ছিন্নহার', 'বাসবদত্তা', 'অযোধ্যার বেগম'। 'অপ্সরা' 'সুদামা' ও 'অযোধ্যার বেগম' স্টার রঙ্গমঞ্চে অপরেশচন্দ্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। ১৩২৯ সালের ৵বিজয়া দশমীর দিন তিনি 'কর্ণার্জুনে'র কথা বিজ্ঞাপিত করিলেন।

সন ১৩৩০ সালের বৈশাখ মাসে অপরেশচন্দ্র আর্ট থিয়েটার লিমিটেডকে লীজ দিলেন—স্টার থিয়েটার অধ্যক্ষরূপে রহিলেন নিজে। আর্ট থিয়েটারে তাঁহার প্রথম নাটক 'কর্ণার্জুন'। শত রাত্রির অভিনয় উৎসবের আয়োজন হইল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ মিলিয়া অপরেশচন্দ্রকে সেই উৎসব সভায় 'নাট্যবিনোদ' উপাধি প্রদান করেন। নাট্যকার নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সভাপতিত্বে এক রাত্রিতে এই উপাধিপত্র অপরেশচন্দ্রের হস্তে প্রদানের আয়োজন করিলেন। অনিলবরণ রায়ের সঙ্গে কথা বলিয়াই ঐ তারিখ স্থির করা হইয়াছিল। সময়ও তিনি দেশবন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু দেশবন্ধু আসিলেন না। ফোন করিয়া জানিলাম—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলিলেন—, অনিলবরণের স্মরণ ছিল না। একটা সভা হইতে তিনি স্টারের পাশ দিয়াই ফিরিয়াছেন। এখন বড় ক্লান্ত, আর আমরা তাঁহাকে বলিতে পারিব না। সে দিনের আয়োজন পণ্ড হইয়া গেল। টাকা গেল নির্মলশিবের। আর্ট থিয়েটারে পর পর অপরেশচন্দ্রের 'ইরাণের রাণী,' 'বন্দিনী,' 'শ্রীকৃষ্ণ,' 'চণ্ডিদাস', 'মগের মুলুক,' 'পুষ্পাদিত্য,' 'ফুল্লরা,' 'মন্ত্রশক্তি' (অনুরূপা দেবীর উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্তিত) 'শকুন্তলা,' 'শ্রীগৌরাঙ্গ,' 'পোষ্যপুত্র' (উপন্যাস হইতে), এবং 'মা' (উপন্যাস হইতে) এই নাটকগুলি অভিনীত হয়। অপরেশচন্দ্রের রচিত একখানি উপন্যাস ছিল 'ভদ্রা'। এতদ্ভিন্ন 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' নামে তাঁহার অন্য একখানি গ্রন্থ আছে। রঙ্গালয়, নাটক ও অভিনেতা লইয়া তাঁহার স্মৃতি-পরিক্রমার পরিচয় 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর'।

সিরাজউদ্দৌলায় তিনি অভিনয় করিবার সুযোগ পান নাই, প্রধানত গিরিশচন্দ্রের জন্যে। কিন্তু সে কারণে গিরিশচন্দ্রের উপর তাঁহার কোন ক্ষোভ বা অভিযোগ ছিল না। তিনি তাঁহাকে বঙ্গ-রঙ্গালয়ের স্রষ্টা ও নট-নটিগণের গুরু এবং প্রতিভাধর নাট্যকার রূপে আজীবন পূজা করিয়া গিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের বিরুদ্ধে কোনদিন কোন কথা তিনি সহ্য করেন নাই। দানীবাবু (সুরেন্দ্রনাথ) দুর্দিনে তাঁহাকে আর্ট থিয়েটারে আনিয়া নাট্যাচার্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, বেতন দিয়াছিলেন মাসে হাজার টাকা। অভিনেত্রী কৃষ্ণভামিনীকে তিনিই শিক্ষা দিয়াছিলেন। দুর্গাদাস তাঁহারই নিকট হাতেখড়ি লইয়াছিলেন। তুলসী চক্রবর্তী অকুণ্ঠ কণ্ঠে তাঁহার ঋণ স্বীকার করিতেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে আমি তাঁহার অধ্যক্ষতার দিনে আর্ট থিয়েটারে অভিনয় করিতে দেখিয়াছি।

শিশিরকুমার অপরেশচন্দ্রকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। নূতন থিয়েটার খুলিবার দিনে ভাদুড়ী মহাশয় অপরেশচন্দ্রকে আনিয়াই রঙ্গালয়ের উদ্বোধন করাইয়াছিলেন।

অপরেশচন্দ্রের পুরাতন সহকর্মী, দুঃস্থ-অভিনেতার বিধবা, কেহ সাহায্যের জন্য তাঁহার নিকট কোনদিন বিমুখ হইয়া যান নাই। কর্জ করিয়াও তিনি কাহারও পুত্রের বিবাহের খরচ, কাহারও স্বামীর শ্রাদ্ধের ব্যয় বহন করিয়াছেন। অপরেশচন্দ্রের মগের মুলুক, অযোধ্যার বেগম, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি নাটকের ভাষা অনবদ্য। গুরু-চণ্ডালী দোষ ও ফেরঙ্গ-ফ্যাসান-বিবর্জিত নাটকের ব্যাকরণ তিনি গিরিশচন্দ্রের মতই মানিয়া চলিতেন। তিনি চরিত্র সৃষ্টি করিতে জানিতেন। নাটকে তাঁহার মৌলিক সৃষ্টি আছে। আর্ট থিয়েটার একবার রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় করিয়াছিলেন। দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর আসিতেন থিয়েটারে গান শিখাইতে। অহীন্দ্র চৌধুরী চন্দ্রবাবুর ভূমিকায় অভিনয় করিতেন। কয়েকদিন ভাদুড়ী মহাশয়কেও ঐ ভূমিকায় দেখিয়াছি। অপরেশচন্দ্র রসিক সাজিতেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন। পরদিন অপরেশ-চন্দ্রের সঙ্গে প্রণাম করিতে গিয়াছিলাম গুরুদেবকে। অপরেশচন্দ্রের ও অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়ের প্রশংসা করিয়া গুরুদেব বলিলেন, 'সাচ্ এ ক্রিয়েসন'।

অপরেশচন্দ্রের অনেক শত্রু ছিল। তাহারা অযথা নিন্দা রটাইত। কিন্তু থিয়েটারে তো নগদ-বিদায়। হাজার হাজার দর্শকের হাততালি। তাহাদের মুখে মুখে প্রচারিত সুখ্যাতি। সে আর রোধ করিবে কে? নৈহাটীতে শাস্ত্রী মহাশয়ের আমন্ত্রণে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন। শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্র বিনয়তোষ (পরে ডক্টর) আমার বন্ধু ছিলেন। সুতরাং আমি দুই দিন আগেই গিয়াছিলাম। অধিবেশনের পূর্বদিন সন্ধ্যায় শুনিলাম অপরেশচন্দ্র নিমন্ত্রিত হন নাই। শাস্ত্রী মহাশয়কে কথাটা বলিতেই তিনি বিনয়তোষকে বলিলেন, 'আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম করিয়া দাও'। তাহাই হইল, অপরেশচন্দ্র ঠিক্ সময়েই আসিয়া সম্মেলনে যোগ দিলেন। অথচ নাট্যকার অমৃতলাল বসু ছিলেন নৈহাটী সম্মেলনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি। ভাবিয়াছিলাম, তিনি অপরেশচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া আসিবেন। অপরেশচন্দ্রের নিকট শুনিলাম অমৃতলাল তাঁহাকে কোন সংবাদই দেন নাই।

স্টার থিয়েটারের দোতলায় একখানা ঘর ছিল। অপরেশচন্দ্র সেই ঘরে বসিতেন। ডাঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু নামকরা লোক মাঝে মাঝে সে ঘরে

আসিতেন, বসিতেন। থিয়েটারের সাজ-পোষাক লইয়াও আলোচনা করিতেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তো প্রায়ই আসিতেন। সময় সময় সে ঘরে আরও বহু জ্ঞানী-গুণীদের বেশ একটা জমজমাট মজলিস বসিত। সরস গল্পে, মার্জিত রসিকতায় হাসির তুফান ছুটিত। আবার বহু গুরুগম্ভীর বিষয়ও আলোচনায় স্থান পাইত। সে একদিন গিয়াছে। ১৩৪১ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ অপরেশচন্দ্র লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন।

অপরেশচন্দ্রের তিন কন্যা ও একটি পুত্র ছিল। পুত্রের নাম হরিচরণ, কন্যাদের কেহ আছে কিনা জানি না। পত্নী বহুদিন পূর্বেই লোকান্তরে গিয়াছেন। হরিচরণও নাই, আছেন হরিচরণের বিধবা, অপরেশচন্দ্রের সন্তানহীনা পুত্রবধূ।

বীরভূমের থিয়েটার

বাড়ীর বাহিরে পা বাড়াইতেই মাথায় চাল ঠেকিয়া গেল। সরস্বতীপূজা উপলক্ষে বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির প্রথম অধিবেশনেই একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিল। অধিবেশনে যোগদানের জন্য কলিকাতা হইতে মহামহোপাধ্যায় আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং 'বিশ্বকোষে'র প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু আমন্ত্রিত হইয়া হেতমপুর রাজবাড়ীতে আসিয়াছিলেন। তত্ত্বাবধায়ক একজন রাজকর্মচারীর অসৌজন্যে তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়া কলিকাতা ফিরিয়া গেলেন। রাজ-কর্মচারিগণের অনেকেই 'হ্যাট-কোট' না দেখিলেই মানুষকে বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না। তাছাড়া নগেন্দ্রনাথকে তাঁহারা চিনিতেন অন্য পরিচয়ে। বীরভূমে সিউড়ীতে তাহার সামান্য কিছু সম্পত্তি ছিল। এই সম্পত্তির জন্য রাজ-এস্টেটের সঙ্গে অল্পস্বল্প আর্থিক দেনা-পাওনার ব্যাপারে তাঁহাকে মাঝে মাঝে হেতমপুরে আসিতে হইত, পরিচয়টা সেই সূত্রে। নগেন্দ্রনাথের অন্য পরিচয় তাঁহারা জানিতেন না, জানা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু কে হরপ্রসাদ? শাস্ত্রী উপাধি, হয়ত টোলের কোন পণ্ডিত আসিয়াছেন। কথঞ্চিৎ সাহায্য-ভিক্ষায়! অথবা অন্য কোন কারণও থাকিতে পারে, এই পর্যন্ত! সুতরাং যাহা ঘটিবার ঘটিল, আমি উপস্থিত থাকিয়াও ঘটনার প্রতিরোধ করিতে পারিলাম না। ফলে বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন

সাবধান হইয়া গেলেন। অতঃপর কোন সাহিত্যিক কিংবা ওই ধরনের জ্ঞানী-গুণী কেহ হেতমপুরে আসিলে তিনি একক আমার উপরই তাঁহাদের তত্ত্বাবধানের ভার দিতেন। আদেশ ছিল—'চিরকুট দিয়া ভাণ্ডারে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র চাহিয়া পাঠাইব : না পাইলে যেন কাহাকেও কোন কথা না বলি এবং নিজে দাম দিয়া বাজার হইতে তাহা সংগ্রহ করি। পরে তিনি তাহার ব্যবস্থা করিবেন।' এই কারণেই আমি স্বনামধন্য শ্রীনামকীর্তন-প্রচারক অধুনা নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের সেবার সুযোগ লাভে কৃতার্থ হইয়াছিলাম। পর পর কয়েক বৎসরই তিনি স-দলে হেতমপুরে শুভ-পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে নবরাত্র নামসংকীর্তনের অনুষ্ঠান হইত।

তখন সরস্বতীপূজা উপলক্ষে হেতমপুর রাজবাড়ীতে খুব ধুমধাম হইত। কবি, ঝুমরি, লেটো, যাত্রা, কলিকাতার থিয়েটার; কয়দিন ধরিয়া উৎসবের বন্যা বহিত। অনেক অনেক সাহেবসুবাও আসিতেন, রাজবাড়ীর খরচে কেলনার কোম্পানি তাঁহাদের খানাপিনার ভার গ্রহণ করিতেন। মেলায় নানান জিনিসের প্রদর্শনী বসিত। মেলা জমিয়া উঠিত। পূজার পরদিন শীতলা ষষ্ঠী, ওই দিন সাধারণ গৃহস্থের গৃহে অরন্ধন পালিত হইত। ওই দিনেই মহারাজ রামরঞ্জনের বার্ষিক শ্রাদ্ধতিথি। পোলাওয়ের সহিত মাছ মিষ্টান্নের আয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্গে চারি আনা দক্ষিণার ব্যবস্থা থাকিত বলিয়া নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত বহু ব্রাহ্মণ শুভাগমন করিতেন। বাড়ীতে বাসি খাওয়ার হাঙ্গামা পোহাইতে হইত না, আর সেকালে চারি আনায় অনেক কিছু পাওয়া যাইত। সুতরাং রথ দেখা এবং কলা বেচার সুযোগ ঘটিত। আমি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের কথা বলিতেছি। রাজাদের নিজেদেরই একটি যাত্রার দল ছিল। সরস্বতী পূজায় এই দলের অভিনয় হইত। অন্য সময়ও হইত। বাঁধা স্টেজ ছিল বলিয়া যাত্রার দলের লোক লইয়া এবং বাহির হইতে লোক আনাইয়া মহারাজকুমার মাঝে মাঝে থিয়েটারেরও ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার লেখার সখ ছিল, গান বাজনা জানিতেন। 'রম্যবতী' নাম দিয়া নিজে একখানি নাটকও লিখিয়াছিলেন। বাহিরের লোক আনাইয়া নাচ গান এবং অভিনয় শিক্ষা দেওয়াইতেন। মহারাজা রামরঞ্জনের এক ভাগিনেয় সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার ম্যানেজার ছিলেন। এই যাত্রা ও থিয়েটার-দল উপযুক্ত দক্ষিণা লইয়া নানাস্থানেই অভিনয় করিয়া বেড়াইত। ছেলেবেলায় সিউড়ী বড়বাগানের মেলায় হেতমপুরের যাত্রাদলের গান শুনিয়াছি। থিয়েটার দেখিয়াছি। আমার উপনয়ন উপলক্ষে

থিয়েটার দল কুড়মিঠায় আসিয়াছিল। এই থিয়েটারের সূত্রে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মাঝে মাঝে হেতমপুরে আসিয়া দুই-দশ দিন থাকিয়া যাইতেন। একবার ক্ষীরোদপ্রসাদ বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিছুদিন হেতমপুরের নিকটবর্তী দুবরাজপুরে সাবরেজিস্ট্রার ছিলেন। নিমন্ত্রিত হইয়া তিনিও মাঝে মাঝে হেতমপুরে আসিতেন। একবার ক্ষীরোদপ্রসাদ আসিয়াছেন, এই উপলক্ষে ছোটখাট একটা মজলিসের অনুষ্ঠান হইয়াছে। নিমন্ত্রিত শচীশচন্দ্রকে আসিতে দেখিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ বলিলেন, 'এই যে কেমন আছেন ?' শচীশচন্দ্র একটু মেজাজে ছিলেন, বলিলেন, 'কেন আমার জন্যে আপনার এত দুশ্চিন্তা কেন ? ঘুম হয় না বোধ হয়। কই চিঠিপত্র লিখে কোনদিন তো একটা খবরও নেন না। কাকের মুখেও কোন তত্ত্ব নেই। আর আজ দেখেই একেবারে "কেমন আছেন" !' ক্ষীরোদপ্রসাদ কোন সদুত্তর খুঁজিয়া পান নাই।

মহারাজকুমার আরও একখানি নাটক লিখিয়াছিলেন, আমি নাম দিয়াছিলাম 'বঙ্গে বর্গী'। নাটক ছাপানো হয় নাই। তাঁহার আশা ছিল অপরেশচন্দ্র এই নাটকখানি দেখিয়া শুনিয়া স্টার থিয়েটারে অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এইজন্য বহুদিন তিনি অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। 'সরস্বতীপূজার কিছুদিন পরে মহারাজকুমার কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাদের রিপন স্ট্রীটের বাড়ীতে অপরেশচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করেন। সেইদিন এই নাটকের পাণ্ডুলিপি লইয়া আলোচনা হয়। নাটকের বিষয়বস্তু ছিল—বীরভূমে বর্গীর হাঙ্গামা। দিল্লীর সুলতানের কন্যা শেরিনা হাফেজ নামে এক যুবককে ভালবাসিয়া ফেলে। শেরিনার পিতা কিন্তু ওসমান নামক একজন ওমরাহপুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহের-সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। বিবাহের দিন নিকট জানিয়া শেরিনা ও হাফেজ পলাইয়া আসিয়া হেতমপুরের ফৌজদার হাতেম খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন। খুঁজিতে খুঁজিতে ওসমান বাঙ্গালায় আসিয়া উপস্থিত হন। এবং বর্গীদলের সাহায্য লইয়া বীরভূমে হাতেম খাঁর গড়ে হানা দেন। বীরভূমের রাজধানী ছিল রাজনগর। হাতেম খাঁ ছিলেন বীরভূমের অধীশ্বর বাদিওজ্জমানের অধীনস্থ একজন সামান্য ফৌজদার। তাঁহার আর সৈন্যসামন্ত কোথায় ? বীরভুম-রাজ সাহায্য করিতে পারিলেন না। অল্পক্ষণের যুদ্ধেই হাফেজ নিহত হইলেন, ধরা পড়িবার ভয়ে শেরিনাও আত্মহত্যা করিলেন। হাতেম খাঁর নামেই হাতেমপুর, এখন হেতমপুর নামে পরিচিত। হেতমপুরের

পূর্বদিকে গড়ের ধ্বংসাবশেষ এবং তাহার নিকটেই পূর্ব-দক্ষিণ দিকে শেরিনা বিবির কবর আছে। কিছুদূরে রাঘব বেড়া—এখানে রাঘব নামে এক তেজস্বী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। রাজনগর-রাজের একজন তহশিলদারের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ ঘটে। রাজদরবারে কোন প্রতিকার না পাইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ কামনায় তিনিও এই ব্যাপারে জড়াইয়া পড়েন। নাটকের ইহাই বিষয়বস্তু। অপরেশ-চন্দ্রের পরামর্শ মত নাটকখানি নূতন করিয়া লিখিলাম। লিখিতাম, তাঁহাকে দেখাইয়া আসিতাম, পড়িয়া শুনাইতাম। নাটকখানি অভিনীত হইল না। কিন্তু আমার লাভ হইল অপরেশচন্দ্রের বন্ধুত্ব।

এই বিষয়বস্তু লইয়া বীরভূমের খ্যাতনামা সাহিত্যিক রায়বাহাদুর নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি নাটক লিখিলেন। ইহার পূর্বেই তাঁহার লিখিত নাটক 'বীর রাজা' কলিকাতার থিয়েটারে অভিনীত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার লিখিত প্রহসন 'রাতকাণা'র খ্যাতি এখন লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছে। অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে নির্মলশিবের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদও নির্মলশিবকে বিশেষ স্নেহ করিতেন, লাভপুরেও তাঁহার যাতায়াত ছিল। অপরেশচন্দ্র-তো কয়েকবারই লাভপুরে আসিয়াছেন। নির্মলশিব এক সময় তাঁহাদের কয়লাকুঠির কাজ দেখিবার জন্য কিছুদিন রানীগঞ্জে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অপরেশ-চন্দ্র বার-দুই রানীগঞ্জের বাসাতেও গিয়াছিলেন। নির্মলশিবের থিয়েটারের শখ ছিল, তাঁহারও থিয়েটারের দল ছিল। নিজে নাট্যকার, ভাল অভিনেতা, সুদক্ষ শিক্ষক। লাভপুরেও থিয়েটারের জন্য বাঁধা স্টেজ ছিল। কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে হাতেখড়ি হয় লাভপুরে নির্মলশিবের হাতে। কিশোর তারাশঙ্কর নির্মলশিবের থিয়েটারে অভিনয় করিতেন। এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, হেতমপুর ও লাভপুরের আদর্শেই বীরভূমে শখের থিয়েটারের প্রসার বাড়ে। এখন তো ছুটিছাটায় স্কুলের ছেলেরাও থিয়েটার না করিয়া ছাড়ে না।

নির্মলশিব যখন রানীগঞ্জে, আমি হেতমপুর ছাড়িয়া সেই সময় নির্মলশিবের নিকট চাকুরি স্বীকার করিয়াছিলাম। আমার এক আত্মীয় মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় নির্মলশিবদের রানীগঞ্জ অফিসের ম্যানেজার ছিলেন। আমি তাঁহারই বাসার নিকট একটি বাসা ভাড়া লইয়া কয়েক মাস রানীগঞ্জ বাস করিয়াছিলাম। মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে নির্মলশিবকেরও নিকট-সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল।

একবার অপরেশচন্দ্র রানীগঞ্জ গিয়াছেন ; নির্মলশিবের লেখা নাটকটির কথা উঠিল। অপরেশচন্দ্র নাটকখানি শুনিলেন—'বঙ্গে বর্গী' নামটিও তাঁহার পছন্দ হইল। 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রের সহকারী-সম্পাদক বিহারীলাল সরকারের একখানি বই ছিল, নাম 'বঙ্গে বর্গী', নামটি আমি বিহারীলালের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলাম। 'বঙ্গে বর্গী' স্টারে অভিনীত হইবে, কথা পাকা হইয়া গেল। নাটকের পাণ্ডুলিপি লইয়া আমি অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে কলিকাতায় আসিলাম। দেখি কলিকাতা শহরের যেখানে সেখানে প্রাচীরপত্র। মনোমোহন থিয়েটারে 'বঙ্গে বর্গী' নাটক অভিনীত হইবে। যতদূর স্মরণ হয় রচয়িতার নাম নিশিকান্ত বসু। দাশরথি মুখোপাধ্যায়ের 'কণ্ঠ-হার' নাটকের যোগে 'বঙ্গে বর্গী' বহুদিন চলিয়াছিল।

অপরেশচন্দ্র নির্মলশিবের লেখা নাটকখানির নাম দিলেন 'নবাবী আমল'। এ নামও ধার করা, ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানি বই ছিল, নাম 'নবাবী আমল'। নাটকখানি নতুন করিয়া লেখার প্রয়োজন দেখা দিল। আমি অপরেশচন্দ্রের কলিকাতার বাসায় থাকিয়া গেলাম।

এই সময় আমি একটা গুরুতর অসুখে ভুগিতেছিলাম। সে একটা অদ্ভুত ব্যারাম। আমি চা খাই না, সকালে অন্য কিছু খাইতাম না। দুপুরে সামান্য ঝোল-ভাত খাইতাম কিন্তু তাহাতেই বৈকালের দিকে মনে হইত যেন দম বন্ধ হইয়া যাইবে। কী যেন একটা ঠেলিয়া উপর দিকে উঠিত, অসহ্য যাতনা হইত। অপরেশচন্দ্রের ডাক্তার-বন্ধুর সংখ্যা বড় কম ছিল না। কলিকাতার অনেক নাম-করা ডাক্তার তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। স্টার থিয়েটারের নিকটেই রাজাবাগান স্ট্রীটে ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ী। কারমাইকেল কলেজের অন্যতম পরিচালক, ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদ ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ ভদ্রতার অবতার ছিলেন। যুবক ডাক্তারগণের এই 'সার' অপরেশচন্দ্রকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। প্রায় প্রতিদিন বৈকালের দিকে ডাক্তার বসুর বৈঠকখানায় বিরাট একটা আড্ডা বসিত। ডাক্তার মদনমোহন দত্ত, ডাক্তার বটকৃষ্ণ রায়, থিয়েটারের অন্যতম কর্ণধার মনোমোহন পাঁড়ে, আরও অনেকেই আসিয়া সেই আড্ডায় যোগ দিতেন। প্রায়ই পাশাখেলা চলিত। নরেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে প্রচুর জলযোগের যোগান দিতেন। এই আড্ডার আড্ডাধারী আজিও একজন বর্তমান আছেন, নাম ডাক্তার শ্রীইন্দুভূষণ রায়। সংস্কৃত বহু উদ্ভট শ্লোক ইঁহার মুখস্থ ছিল। মনে হয়, যত্ন করিয়া সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। এই সব

ডাক্তারের দলও থিয়েটার করিতেন। একবার একটি বড় মজার ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ডাক্তারের দল দ্বিজেন্দ্রলালের 'পরপারে' অভিনয় করিতেছেন। প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, রায় বাহাদুর চুণীলাল বসু প্রভৃতি বড় বড় ডাক্তারেরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন, অভিনয় দেখিতেছেন। পার্বতী, দয়াল, সরযূ, শান্তা কে সাজিয়াছিল মনে নাই। মনে আছে ডাঃ নরেন্দ্রনাথ মহিমের ভূমিকায় সাজিয়াছিলেন। শান্তাকে লইয়া তাহার ঢলাঢলি সকলেই সহিয়া গেলেন। কিন্তু চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নর্তকীর নাচগান ও বন্ধুবান্ধব লইয়া মহিমের হুল্লোড় দুই-একজন যেন বরদাস্ত করিয়া উঠিতে পারিলেন না। হঠাৎ ডাক্তার চুণীলাল ডাকিয়া উঠিলেন, 'নরেন!' আমরা চমকিয়া উঠিলাম, অভিনয় বন্ধ হইয়া গেল। আমি প্রতিবাদ করিলাম, 'এখানে তো নরেন বলিয়া কেহ নাই স্টেজে তো উনি মোহিত। আর দৃশ্যটা যদি অশ্লীল বলিয়া মনে হয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি (চুণীলাল) ডাক্তারবাবু কি নাটকখানি পড়িয়া আসিবার সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই? অভিনয় দেখিতে না আসিলেই তো পারিতেন।' ডাক্তার আচার্য আমাকে ধরিয়া বসাইলেন। কিন্তু আমাদের অনুরোধে পুনরায় ওই দৃশ্য হইতেই থিয়েটার আরম্ভ হইল।

নরেন্দ্রনাথের পাশার আড্ডায় আমিও যোগ দিতাম্। সুতরাং আমার চিকিৎসার কোন ত্রুটি ঘটিল না। অপরেশচন্দ্রের আতিথেয়তারও কোন কমতি নাই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ব্যারাম বাড়িয়া চলিল, রাত্রে আমি জলবার্লি খাইতে ধরিলাম। প্রায় মাসখানেক ধরিয়া যখন এই দুর্ভোগ চলিতেছে, এমন সময় হঠাৎ এক রাত্রে একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটিল। রাত্রি শেষের দিকে স্বপ্ন দেখিলাম একটি ভাঙ্গা শিবমন্দির, নিকটেই দীঘিতে কাকচক্ষু জল টল টল করিতেছে। আমি শিবের পূজা দিতে গিয়াছি, পূজক ব্রাহ্মণ আমাকে শিবের চরণামৃত খাওয়াইয়া দিলেন। ঘুম ভাঙিয়া গেল, আর ঘুমাইলাম না। মনে মনে খোঁজ করিতে লাগিলাম, কোথায় সেই শিবমন্দির। মনে পড়িল আমাদের গ্রামের কিছু দূরেই একটি গ্রামের শিবমন্দিরের কথা। লোকে সেখানে অম্লশূলের ঔষধ আনিতে যায়। কিন্তু সেখানে তো বড় দীঘি নাই। মন্দিরের পাশে ছোট একটি পুষ্করিণী আছে। যাহা হউক, মনে মনে শিবের উদ্দেশে পূজা মানসিক করিয়া সকালে উঠিয়া হাত মুখ ধুইলাম। দুপুরে ঝোল-ভাত খাইয়া ভয়ে ভয়ে বৈকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কোন যন্ত্রণা নাই, যেন মন্ত্রশক্তিগুণে সকল ব্যাধি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণ সহজ অবস্থা। অপরেশচন্দ্র প্রতিদিন বৈকালে

জিজ্ঞাসা করিতেন, 'আজ কী খাইবেন ?' রোজ রোজ জলবার্লির কথা শুনিয়া বিরক্ত হইতেন, তিরস্কার করিতেন। বলিতেন 'সাহস করুন, জলবার্লি ছাড়িয়া যাহা রুচি হয় পুষ্টিকর কিছু খাওয়া ধরুন, নইলে এমন করিয়া কতদিন বাঁচিবেন' ইত্যাদি। আমার কিন্তু সাহস হইত না। খাবার নামেই ভয়ে বুক কাঁপিত। আজ যেমন জিজ্ঞাসা করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বলিলাম, 'লুচি খাইব'। অপরেশচন্দ্র যেন খুশিতে ভরিয়া উঠিলেন। হাসিয়া বলিলেন, সে কী মশায়, এ দুর্বুদ্ধি আপনাকে কে দিলে ? বেশ তো জলবার্লি চলছিল, সামান্য তিনটে পয়সার মামলা ! লুচির খরচ জানেন ?' রাত্রে তিনি লুচিই খাইতেন। সেদিন একটু ঘটা করিয়াই ঠাকুরকে আয়োজন করিতে বলিলেন। রাত্রে এক সঙ্গেই দুইজনে আহার করিলাম। গ্রামে ফিরিয়া শিবের পূজা দিয়াছিলাম। চরণামৃত খাইয়া আসিয়াছিলাম। সেইদিন হইতে প্রায় বিশ বৎসর সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলাম। পরে পুনরায় সেই ব্যারামে আক্রান্ত হই। এবার আক্রমণ অত্যন্ত তীব্র। কলিকাতায় থাকিয়া প্রায় চারি মাস ধরিয়া কবিরাজী ঔষধ খাইয়া সে যাত্রা রক্ষা পাই। গত বৎসর পুনরায় তাহাই রূপান্তরে দেখা দিয়াছিল এবং ডাক্তারের শরণ লইয়াছিলাম, কারণ এবারকার ব্যাধির নাম নাকি 'করোনারি থ্রম্বসিস' ! এইবার প্রসিদ্ধ কীর্তন গায়ক শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ ঘোষ চিকিৎসার ব্যয় বহন করিয়াছিল।

তখনকার দিনে খুব সদাচারে থাকিতাম, কারণ প্রায় বাড়ীতেই থাকিতাম। মন ছিল নির্মল, তাই স্বপ্নে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাইতাম। কোন সময়ে ভবিষ্যৎ বিপদের ইঙ্গিত, কোন সময়ে বা তাহার প্রতিকার-পন্থা স্বপ্নে জানিতে পারিতাম। স্বপ্নেই আমি শ্রীগীতগোবিন্দের নিগূঢ় রহস্যের সামান্য সন্ধান পাইয়াছি। স্বপ্ন আমার অনেক সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছে।

বীরভূমে হরপ্রসাদ

কলিকাতা ইণ্টালি হইতে মাসিক পত্র 'গৃহস্থ' প্রকাশিত হইত। সম্পাদক শ্রীরামরাখাল ঘোষ। এই পত্রে নামকরা লেখকরাও লিখিতেন। ১৩২০ সালে বীরভূম হেতমপুরের মহারাজকুমার শ্রীমহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী 'গৃহস্থ'-এ একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন 'সুপুর'। লেখায় কিছু ভুল ছিল, আমি প্রতিবাদ লিখিয়া

পাঠাইলাম। প্রতিবাদ ছাপা হইয়াছিল। ভুল-ত্রুটি দেখাইয়া লিখিয়াছিলাম, বীরভূমের ইতিহাস আশমান হইতে গজাইবে না। এ কাজে দিঘাপাতিয়ার কুমার শরৎকুমারের মত পৃষ্ঠপোষক চাই, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও রমাপ্রসাদ চন্দের মত সাধক চাই ইত্যাদি। প্রতিবাদ পড়িয়া ১৩২১ সালের আষাঢ় মাসে মহারাজকুমার কুড়মিঠা গ্রামে আমার নিকট লোক পত্রসহ পাঠাইলেন। পত্রখানি নিজের হাতে লেখা। 'সুপুর সম্বন্ধে আপনার প্রতিবাদ পড়িলাম। দুর্ভাগ্যবশত আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নাই। বীরভূমে এমন লোক আছেন জানিতাম না। অনুগ্রহপূর্বক হেতমপুরে আসিয়া দেখা করিলে আনন্দিত হইব।' লোক যখন আসে আমি বাড়ীতে ছিলাম না। আমি সে সময় মাঝে মাঝে কিছু পয়সা জোগাড় করিয়া সিউড়ী চলিয়া যাইতাম। তুলসী বৈষ্ণবীর হোটেলে খাইতাম—চারি আনা পয়সায় এক বেলা পেট ভরিয়া ভাত খাওয়া হইত। চা খাই না, রাত্রে ময়রার দোকানে দুই আনায় আধসের খাস বালুসাই, নয়ত রসগোল্লা। কাজ ছিল শিবরতন মিত্রের রতন লাইব্রেরীতে দুই বেলা পুস্তক পাঠ। উকিল শ্রীদেবরাজ মুখোপাধ্যায়ের বাসাতে রাত কাটাইতাম। উকিলের মুহুরী গোবিন্দচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দূরসম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল। পয়সা ফুরাইলেই পলাইয়া আসিতাম। বাড়ী ফিরিয়া মহারাজকুমারের পত্র পড়িলাম এবং দুই একদিন ভাবিয়া চিন্তিয়া হেতমপুরে উপস্থিত হইলাম। মহারাজকুমারের প্রস্তাব শুনিয়া আমি তো অবাক। আমার বিদ্যাবুদ্ধির কথা অনেক বুঝাইয়া বলিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন, 'এম-এ, বি-এর এখানে অভাব নাই। তুমি এখানে এস, কত বড় বড় লোকের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে, কত কত বই পড়তে পাবে, তোমার লেখা কাগজে বেরুবে, বইয়ের আকারে ছাপান হবে।' ভাবিয়া দেখি, বলিয়া হেতমপুরে একদিন থাকিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। শ্রাবণ মাসে কলিকাতা হইতে মহারাজকুমারের এক চিঠি পাইলাম। টেলিগ্রাম লইয়া হেতমপুর হইতে একজন লোকও আসিল। বই পড়িতে পাইব লেখা ছাপার অক্ষরে বাহির হইবে, বীরভূমের কথা, চণ্ডীদাস, জয়দেবের কথা বাহিরের লোককে শুনাইব, এই প্রলোভন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। আমি মন স্থির করিয়া ফেলিলাম। হেতমপুর গিয়া দেখি পুণ্যাহ উপলক্ষে রাজবাড়ীতে অনুষ্ঠানের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। রাত্রে কর্মচারীরা এবং দুবরাজপুরের মুনসেফ, সাবরেজিস্ট্রার স্টেশনমাস্টার-আদি অনেক লোক খাইবেন। দুইদিন হেতমপুরে ছিলাম। তৃতীয় দিন মহারাজকুমার আমাকে একেবারে কলিকাতায় আনিয়া

তুলিলেন—প্রায় এক বস্ত্রে। দিন দুই পর একদিন আমাকে লইয়া বিশ্বকোষ লেনে গিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন।

কলিকাতায় ডেঙ্গুজ্বরে পড়িলাম। যত গায়ে বেদনা তত শীত। সঙ্গে বিছানা ছিল না। তিন দিন অত্যন্ত কষ্টভোগ করিলাম। পথ্য পাওয়ার পর একদিন বসুমহাশয়ের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। বীরভূমের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের জন্য বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপনের কথা আলোচিত হইল। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির তখন খুব নাম। শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দের 'গৌড়রাজমালা' বোধহয় বাহির হইয়াছে। শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়মহাশয়ের প্রকাণ্ড পাণ্ডিত্য এবং কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়ের অকাতর অর্থব্যয়ের কথা লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছে। পরামর্শ হইল আমাদের, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদকে গিয়া ধরিতে হইবে। আমরাই দুইজনে গিয়া দেখা করিব। পরদিন সকালের দিকে বসুমহাশয় আমাকে লইয়া পটলডাঙায় গেলেন। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর সে সময় পটলডাঙায় থাকিতেন। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া শাস্ত্রীমহাশয়ের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। রামেন্দ্রসুন্দরকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সৌম্য প্রশান্তমূর্তি সদাহাস্যমুখ প্রজ্ঞার মাধুর্য-বিগ্রহ। নগেনবাবুর নিকট অনুসন্ধান-সমিতির কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। বীরভূম-সাহিত্য-পরিষদের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আশীর্বাদ পাইয়া ধন্য হইলাম। শাস্ত্রীমহাশয়কে, দেখিয়া কিন্তু দমিয়া গেলাম। নগেনবাবুর দেখাদেখি আমিও পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি নীচের একটি ঘরেই বসিয়া ছিলেন। নগেনবাবুকে কুশল প্রশ্নের পর আমার দিকে চাহিয়া একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করিলেন 'একে আবার কোত্থেকে নিয়ে এলে।' খাস পাড়াগাঁ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছি; চেহারাতেও বিদ্যাবুদ্ধির কোন পরিচয় নাই, তিনি ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। নগেনবাবু আমার পরিচয় দিলেন, মহারাজকুমারের কথা, বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির কথা বলিলেন। কিছুদিন পূর্বে বোধহয় বর্ধমানে রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শাস্ত্রীমহাশয় তাহার সভাপতি। সুতরাং আমরা বিশেষ আমল পাইলাম না। তবে নগেনবাবুর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আমাদের সমিতির মহোপদেশক-রূপে নাম দিতে তিনি সম্মত হইলেন। মহোপদেশক কথাটা কিন্তু তাঁহার পছন্দ হইল না। বলিলেন উপদেষ্টা লিখিও।

বৌরাণীর শরীর ভাল যাইতেছিল না, মহারাজকুমার বৈদ্যনাথধামে চলিয়া

গেলেন। আমাকেও সঙ্গে যাইতে হইল। দেওঘর হইতে পূজার কিছু পূর্বেই মহারাজকুমার হেতমপুরে ফিরিলেন। হেতমপুরে আসিয়া অনেক বিচার বিবেচনা করিয়া তিনি স্থির করিলেন প্রতিমাসে আমাকে পঁচিশটি টাকা দিবেন। থাকিবার স্থান পাইব, তবে ঐ টাকা হইতে খাওয়ার ব্যবস্থাটা আমাকেই করিয়া লইতে হইবে। কলেজ-হোস্টেল এবং স্কুল-বোর্ডিং রাজবাড়ী হইতে কিছুটা দূরে। রাজকর্মচারীদের কোন মেস নাই। গ্রামেও পয়সা দিয়া কোথাও ভাত পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া আমাকে বীরভূমের গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে হইবে। কখন আসি, কতদিন থাকি, কখন যাই, স্থিরতা নাই। দেওঘরে 'চণ্ডীদাস'-জীবনী লেখক শ্রীকরালীকিঙ্কর সিংহের মামার বাড়ীতে (মামা বীরভূমের লোক, দেওঘরের মোক্তার) ইক্‌মিক্ কুকারে রাঁধিয়া খাইয়া মহারাজকুমারের নিকট গল্প করিয়াছিলাম। তিনি একটা কুকার কলিকাতা হইতে রেল পার্শেলে আনাইয়াছিলেন। রান্নাটা শিখাইয়া দিয়াছিলাম। সেই কুকারে তিনি প্রতিদিন কিছু না কিছু একটা রাঁধিয়া খাইতেন। কথা ছিল কুকারটা আমাকেই দিবেন। হেতমপুরে আসিয়া কিন্তু যোগীন্দ্র কর্মকারের দ্বারা একটা কুকার তৈয়ারী করাইয়া দিলেন। বাটি চারিটা টিফিন ক্যারিয়ার হইতে লওয়া হইল। লোহার পাতে কুকারের অন্য সবটাই যোগীন্দ্র তৈয়ারী করিয়া দিল। আমি পঁচিশ টাকা বেতনেই কুকারে রাঁধিয়া খাইতে রাজী হইয়া গেলাম।

পূজার পর কলিকাতায় গিয়া পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, সরস্বতী পূজার সময় হেতমপুরে অনুসন্ধান-সমিতির প্রথম অধিবেশন হইবে, সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া এখোরায় কাশিমবাজাররাজের নায়েব মুর্শিদাবাদ-কাহিনীর লেখক শ্রীনিখিলনাথ রায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলাম।

সরস্বতী পূজাটা সেবার বোধহয় ফাল্গুনের গোড়ার দিকে পড়িয়াছিল। ষষ্ঠীর দিন কলিকাতা হইতে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রীমহাশয়কে সঙ্গে লইয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব আসিলেন। এখোরা হইতে আসিলেন নিখিলনাথ। কলেজের অধ্যাপকগণ ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ছিলেন। লাভপুর হইতে নাট্যকার শ্রীনির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়াছিলেন। নিমন্ত্রণ পাইয়াও বীরভূমের অপর কেহ আসেন নাই। সপ্তমীর দিন সন্ধ্যায় পুরাতন রাজবাড়ীর উপরে সভা বসিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথমেই সমিতির কর্মকর্তা নির্বাচনের পালা। সমিতি স্থাপিত হইল। উপদেষ্টা হরপ্রসাদ, সভাপতি

নগেন্দ্রনাথ। সহ-সভাপতি নিখিলনাথ, সম্পাদক মহিমানিরঞ্জন, সহ-সম্পাদক আমি, সভ্য কলেজ-স্কুলের দুই-একজন শিক্ষক ও বীরভূমের এখান-সেখান হইতে দুই-দশজন ভদ্রলোক। কর্মকর্তা নির্বাচনের পর প্রবন্ধ পাঠ, আমি 'কেন্দুবিল্ব' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পড়িলাম। নগেনবাবু ও নিখিলবাবু প্রবন্ধের খুব প্রশংসা করিলেন। শাস্ত্রীমহাশয় বলিলেন, 'জয়দেব সম্বন্ধে আমি যাহা জানি, অন্যে যাহা জানে, আজ পর্যন্ত যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, সবই এ প্রবন্ধে আছে। যাহা জানিতাম না, অন্যেও জানে না, কেন্দুলী সম্বন্ধে স্থানীয় এমন অনেক খবর লেখক দিয়াছেন।' এতদিনে একটু ঘনিষ্ঠ হইবার সৌভাগ্য হইয়াছে। চুপি চুপি কাছে ডাকিয়া বলিলেন, 'তোর লেখার এমন ধৃষ্টদ্যুম্ন ধরনের চেহারা কেন? অ্যাঃ ভারী পণ্ডিত! লেখাটাকে শক্ত না করলে চলে না বুঝি? সহজ সরল করে বলতে পার না?' লেখাটা 'বীরভূম-বিবরণ' প্রথম খণ্ডে আছে। কাঁচা হাতের লেখা, কিঞ্চিত উচ্ছ্বাসপূর্ণ।

পরের দিন একটা কেলেঙ্কারী ঘটিয়া গেল। এই কয়দিন আমি শাস্ত্রী-মহাশয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই ছিলাম। যে দুইজন কর্মচারীর উপর তত্ত্বাবধানের ভার ছিল, তাঁহারা জানিতেন আমি একজন সামান্য লোক, মাহিনা খোরাকী সহ পঁচিশ টাকা। তাহাও আবার জমিদারী সেরেস্তার কাজ জানি না, কী যে করি তাহারও ঠিক-ঠিকানা নাই! নগেন বসু রাজবাড়ীতে আসেন যান। শাস্ত্রীমহাশয় বোধহয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। কর্মচারী দুইজন আমি সঙ্গে আছি বলিয়া বসু ও শাস্ত্রীমহাশয়কে একটু তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিতেন। আমি নানা রকমে সামলাইয়া লইতাম। সকালে শাস্ত্রীমহাশয় বলিলেন, 'আমি বক্রেশ্বর দেখিতে যাইব।' রাজবাড়ীতে মোটর ছিল না। জুড়ি-গাড়ীও পাওয়া যাইবে না। এক জোড়া খচ্চরের একটা গাড়ী ছিল। বক্রেশ্বর যাতায়াতের জন্য মহারাজকুমার সেই গাড়ীটাই ঠিক করিয়া দিলেন। বক্রেকশ্বরে পৌছিয়া শাস্ত্রী-মহাশয় নগেনবাবুকে লইয়া প্রথমে মূল মন্দিরটি দেখিলেন। শ্বেতগঙ্গার উত্তর তীরে বটগাছতলায় হর-গৌরীর একটি ভগ্ন মূর্তি পড়িয়া ছিল, সেটি দেখিলেন। এদিক-ওদিক ঘুরিয়া পাপহরা ও গরম জলের কুণ্ডগুলি দেখিয়া বেড়াইলেন। শেষে শ্বেতগঙ্গার জলেই স্নান সারিয়া দেবদর্শন করিলেন। আমি শাস্ত্রী ও বসু মহাশয়কে দাঁইহাটের হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ীতে লইয়া গিয়া বসাইলাম। ময়রার দোকানে ভাল রসগোল্লা ছিল, আনিয়া জলযোগ করাইলাম। হেতমপুর ফিরিতে দুইটা বাজিয়া গেল। বিশ্রাম করিয়া খাইতে

বসিলেন প্রায় আড়াইটায়। ভাত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। তরকারিও তথৈবচ। গরম পড়িয়াছিল, নগেনবাবু দই চাহিলেন। তিনি জানিতেন, সাঁওতাল পরগণার কুণ্ডহিতের দই প্রসিদ্ধ। তত্ত্বাবধায়কদের একজন দই আনিয়া দিলেন। পাতায় পড়িবামাত্র দুর্গন্ধ পাইয়া ছুটিয়া ভাঁড়ারে গিয়া আমি এক হাঁড়ি (ছোট হাঁড়ি, বেঠে বলে) ভাল দই আনিয়া দেখি, দুইজনেই উঠিয়া পড়িয়াছেন।

আমি তখনও খাই নাই, খাওয়া মাথায় উঠিল। ছুটিয়া পুরাতন রাজ-বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ইহাদের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল হাজার দুয়ারীর (রঞ্জন প্যালেসের) উপরতলে। সেখান হইতে পুরাতন রাজবাড়ী কিছু কম আধ মাইল। মহারাজকুমারকে লইয়া আসিলাম, কিন্তু সেই রাত্রেই শাস্ত্রী ও বসুমহাশয় কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

বর্ধমানে অষ্টম বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে শাস্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। শাস্ত্রী-মহাশয়ই মূল সভাপতি ছিলেন। দ্বিতীয় দিন স্নানের পর দেখা করিতে গিয়াছিলাম। বলিলেন, 'এখানেই খাইয়া যাও'। খাওয়ার সময় নিজের পাশেই বসাইলেন। চুপি চুপি একবার হেতমপুরের দইয়ের কথাটাও তুলিয়াছিলেন। সেখানে কলিকাতার বড় বড় সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকদের দেখিয়াছিলাম। বর্ধমান-সাহিত্য-সম্মেলন এক এলাহি কাণ্ড। মাছ মাংস প্রচুর। মিহিদানা সীতাভোগ ও সিগারেটের ছড়াছড়ি। চৌদ্দ শত প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। অনেকেই চাঁদা বাঁধিয়াছিলেন।

বীরভূমের উত্তরে পাইকোর গ্রামে চেদিরাজ কর্ণদেবের নামযুক্ত একটি স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছিল। স্তম্ভে কয়েকছত্র লিপি। আমি কর্ণদেব নাম মাত্র পড়িতে পারিলাম। কলিকাতা হইতে নগেন্দ্রনাথকে লইয়া আসিলাম। তিনিও সবটা পড়িতে পারিলেন না। ফিরিয়া গিয়া দুইজনেই শাস্ত্রী মহাশয়ের শরণ লইলাম। কিন্তু তিনি প্রায় তাড়াইয়া দিলেন। 'কোথায় ধাপধাড়া গোবিন্দপুর পাইকোর। এই শরীর নিয়ে বর্ষায় (সময়টা বর্ষাকাল ছিল) তেপান্তরের মাঠে গিয়ে পড়ে থাকি। তোর রাজা তো থাকবে হেতমপুরে, আর তোরা ভাল ভাল দই এনে খাওয়াবি! চেদি কর্ণের লিপি পড়ে দেশোদ্ধারের জন্যে আমার বুক টন্ টন্ করছে!' সেদিনের মত চম্পট দিলাম। বসুমহাশয় বাগবাজারে, আমি রিপন ষ্ট্রীটে। মহারাজকুমার কলিকাতায় ছিলেন। আমি পটলডাঙার বাড়ীতে কয়েকদিন যাতায়াতের পর একদিন মহিমানিরঞ্জনকে সঙ্গে লইয়া গেলাম। মহারাজকুমারের অনুরোধে শাস্ত্রীমহাশয় পাইকোর যাইতে সম্মত হইলেন।

সিউড়ী হইতে কিছু তরকারিপত্র, কয়েক রকমের মোরব্বা প্রভৃতি লইয়া পাইকোরে গিয়া বসিলাম। নগেনবাবুর জন্য দুইটি দিন পাল্টাইয়া গেল। জিনিসপত্র নষ্ট হইল। দুই দিনই পাইকোরের ভদ্রলোকদের লইয়া কয়েক জোড়া গরুর গাড়ী মুড়ারই স্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিল। বৈকালে আমি সিউড়ী গিয়াছি, উদ্দেশ্য টাটকা জিনিসপত্র আনিব। সন্ধ্যার ট্রেনে শাস্ত্রীমহাশয়কে লইয়া নগেন্দ্রনাথ মুড়ারইয়ে আসিয়া নামিলেন। যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়। গরুর গাড়ী তো দূরের কথা, স্টেশনে একজন লোক পর্যন্ত নাই। মুড়ারই থানার দারোগা ছিলেন সে-সময় বন্ধু শ্রীকিরীটী রায়চৌধুরী। তিনি লিপি-সম্বন্ধীয় সমস্ত সংবাদই জানিতেন, আমার সিউড়ী যাওয়ার কথাও তাঁহার জানা ছিল। ঐ সময়ে তিনি স্টেশনে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। কিরীটী নগেনবাবুকে চিনিতেন। তিনি বহু সমাদরে তাঁহাদিগকে থানায় লইয়া গিয়া থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। আর সেই রাত্রেই সংবাদ পাঠাইয়া পরদিন নিজে গিয়া শাস্ত্রীমহাশয়দের পাইকোরে রাখিয়া আসেন। নগেনবাবুর প্রিয় ভৃত্য পাহাড়ী সঙ্গে থাকায় কোন অসুবিধা হয় নাই। দূরবর্তী স্থানের কোন এক মুসলমান ভদ্রলোক পাইকোরের জমিদার ছিলেন। গ্রামের শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার নায়েব। হেতমপুর হইতে আনা রাঁধুনীটিকে পাইকোরে রাখিয়া গিয়াছিলাম। অন্যান্য ব্যবস্থা প্রভাসবাবু করিয়াছিলেন। বৈকালে আমি সিউড়ী হইতে পাইকোর ফিরিলাম। দেখিলাম, নারায়ণচত্বর পুকুরের ঘাট হইতে মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ের-প্রাঙ্গণে স্তম্ভটি আনাইয়া শাস্ত্রী মহাশয় পাঠোদ্ধার করিতেছেন। নগেনবাবু কিন্তু আমাকে মারিতে বাকী রাখিলেন।

লিপিটি পাঠ করিয়া শাস্ত্রীমহাশয় অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কর্ণদেবের সঙ্গে বঙ্গেশ্বর নয়পালের যুদ্ধ হইয়াছিল। নয়পালের পুত্র বিগ্রহপালের হস্তে কর্ণদেব আপনার কনিষ্ঠা কন্যা যৌবনশ্রীকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। সুতরাং কর্ণদেব বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। কিন্তু কোথায় আসিয়াছিলেন কেহ জানিত না। পাইকোরের স্তম্ভলিপি হইতে সেই স্থানের পরিচয় পাওয়া গেল। একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া কর্ণদেবের একজন সামন্ত এই লিপি উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। পাইকোর-লিপি ভারত, তথা বাঙ্গালার ইতিহাসে নতুন পত্রাঙ্ক যোজনা করিয়াছে।

পাইকোর বুড়াশিবতলায় অনেকগুলি পুরাতন মূর্তি আছে। পাহি দত্তের নামাঙ্কিত একটি স্তম্ভ আছে। আশেপাশে ধ্বংসস্তূপের অভাব নাই। পাইকোরে

শাস্ত্রীমহাশয় পাঁচদিন ছিলেন। তাঁহার আরও কয়েকদিন থাকিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নগেনবাবু রাজী হইলেন না। কোন একজন বড়লোককে জাতিতত্ত্বের পাঁতি দিতে হইবে, কিছু টাকা পাওয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহার থাকিবার উপায় নাই। শাস্ত্রীমহাশয় আমার উপর এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, নগেনবাবু চলিয়া গেলেও একক থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু নগেনবাবুর জন্য তাহা হইয়া উঠিল না। নগেনবাবু শাস্ত্রীমহাশয়কে পাইকোরে ফেলিয়া কলিকাতা যাইবেন না। এদিকে প্রবল বৃষ্টির জন্য মাঠ ঘাট ডুবিয়া গেল। পাগলা নদীর বন্যায় নদী নালা একাকার। দুইখানি খেয়া ডিঙিতে আমি তাঁহাদিগকে মুড়ারই স্টেশনে আনিয়া ট্রেনে তুলিয়া দিলাম।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পূর্বচক্রের অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত শাস্ত্রী মহাশয়ের কথামত এই স্তম্ভ-লিপির প্রতিলিপি এবং ফটো আনাইয়াছিলেন। স্তম্ভটিকে আইনানুসারে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম খণ্ডে এই স্তম্ভ-লিপির উল্লেখ এবং লিপির আবিষ্কারক বলিয়া আমার নাম করিয়াছেন।

শাস্ত্রীমহাশয় বীরভূম-ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে আমার অকপট আগ্রহ এবং তজ্জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা নগেনবাবুর নিকট শুনিয়াছিলেন। পাইকোরেও কিছু দেখিয়াছিলেন। পাইকোরের কথাপ্রসঙ্গে আমার সাংসারিক অবস্থা ও হেতমপুর হইতে পঁচিশটি টাকা মাসিক পাওনার কথাও শুনিয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণে আমার উপর তাঁহার কেমন একটা মায়া জন্মিয়াছিল। আমাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। যখন-তখন পটলডাঙার বাড়ীতে যাইতাম। দুই একদিন থাকিতাম। ভারতের নানাস্থানে তাঁহার ভ্রমণের কথা, বার বার নেপালে যাওয়া, রামচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ সংগ্রহের কথা, এবং বাঙ্গালার ইতিহাসের নানা তথ্য আবিষ্কারের কথা শুনিতাম। গল্পের মত করিয়া ইতিহাসের কত কথাই যে বলিতেন। আমি মাঝে মাঝে তাঁহার সঙ্গে নৈহাটীও যাইতাম। নৈহাটীতে তিনি একবার সাহিত্য-সম্মেলন ডাকিয়াছিলেন। খুব ধুম হইয়াছিল। খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথও গিয়াছিলেন। এখানে বর্ধমানের মহারাজা সভাপতি, ওদিকে কাঁঠালপাড়ায় কয়েকজন সাহিত্যিক নাটোরের মহারাজাকে সভাপতি করিয়া একটা প্রতিদ্বন্দ্বী সম্মেলন বসাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, চেষ্টা সফল হয় নাই। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথকে আমি নৈহাটীর সভাতেও দেখিয়াছিলাম।

একপাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন, দেখিয়া পাঁচজনে আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়া মঞ্চে বসাইলেন। বিখ্যাত শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু ও বর্ধমানের শ্রীবিজয়চাঁদকে সম্মেলনের সময় একদিন শাস্ত্রীমহাশয়ের বাড়ীতে জলযোগ করিতে দেখিলাম—নৈহাটীর গজা ও বিশ্বনাথ চাটুজ্যে আম। শাস্ত্রীমহাশয় নৈহাটীর গজার বড় ভক্ত ছিলেন। এ-গজা দুই-চারিটি তৈয়ারী হয় না, একটা বড় কড়াই-ভর্তি পাক চড়াইতে হয়। তাঁহার নিকটেই গল্পটা শুনিয়াছিলাম। নৈহাটী-সম্মেলনে গিয়া আমি প্রায় দিন-দশেক ছিলাম।

একবার শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত পটলডাঙার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার জন্য শাস্ত্রীমহাশয় নারিকেলের গঙ্গাজলী নাড়ু তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। এই নাড়ু আগুনে পাক করিতে হয় না। সূর্যপক্ব গঙ্গাজলী গঙ্গাজলের মত কিছুদিন অবিকৃত থাকে। গঙ্গাজলী সেই খাইয়াছিলাম—প্রথম ও শেষ। শাস্ত্রীমহাশয় লোককে খাওয়াইতে খুব ভালবাসিতেন। পটলডাঙা হইতে হাঁটিয়া শিয়ালদহ যাইবার পথে পড়িয়া গিয়া পায়ে এমন আঘাত পাইয়াছিলেন যে, আর চলাফেরা করিতে পারিতেন না। এই কারণেই তাঁহার সংবর্ধনা উপলক্ষে যে গ্রন্থ লেখা হইয়াছিল, সেই গ্রন্থ তাঁহার হাতে দিবার জন্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নরেন্দ্রনাথ লাহা, যতীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি জন পনের ভদ্রলোক পটলডাঙার বাড়ীতে গেলেন। তিনি শতাধিক লোকের জলযোগের মত প্রচুর মিষ্টান্নের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। পনের জন লোক দেখিয়া তাঁহার সে কী রাগ। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করেন নাই জানিয়া তাঁহাকে তীব্র তীরস্কার করিয়াছিলেন। সন্দেশ রসগোল্লা দোকানে কিছু ফেরত পাঠান হয়। কিছু আমাদের সদ্ব্যবহারে লাগিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপর শাস্ত্রীমহাশয়ের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। নৈহাটী গিয়াছি; একদিন বৈকালে বলিলেন, 'চল একটা তীর্থ দেখাইয়া আনি।' হাঁটিয়াই কাঁঠালপাড়ায় গেলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়দের দেবমন্দির, বৈঠকখানা, বাস্তবাড়ী প্রভৃতি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখাইলেন। বঙ্কিমের জন্মভিটা, বঙ্গদর্শন লিখিবার ঘর সব দেখিয়া ফিরিবার পথে বৃষ্টি নামিল। আমরা নৈহাটী স্টেশনে বেঞ্চির উপর গিয়া বসিলাম। স্টেশন জলে ভাসিয়া গেল, দুইজনেই জুতা খুলিয়া বেঞ্চির উপর পা তুলিয়া দিলাম। দুইজন গোরা সিপাহী সামনে দিয়া জল ভাঙিয়া হাঁটিয়া যাইতেছিল। একজনের সঙ্গে একটা বানর ছিল—দড়িতে বাঁধা। বানরটা মাঝে মাঝে গোরার কাঁধে উঠিতেছিল, আমার পিঠে কাদাসুদ্ধ

হাত-পায়ের দাগ আঁকিতেছিল। দেখিয়া আমি বলিলাম, 'বাঁদর কি আর গাছে ফলে?' শাস্ত্রীমহাশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'না, বাঁদর নৈহাটি স্টেশনে বেঞ্চির উপর পা তুলে বসে থাকে।' রসিকতায় শাস্ত্রীমহাশয় পুরাতন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেরই উত্তরাধিকারী ছিলেন।

কত লোককে যে তাঁহার বাড়ীতে দেখিয়াছি। কালীপ্রসাদ জয়সোয়াল, কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত প্রভৃতির সঙ্গে পটলডাঙার বাড়ীতেই পরিচিত হইয়াছিলাম। একবার এক ভদ্রলোককে দেখিলাম, বেদের বয়স জিজ্ঞাসা করিতেছেন। শাস্ত্রীমহাশয় গম্ভীর নিরুত্তর, আমি প্রমাদ গণিতেছি। এমন সময় সেই ভদ্রলোক বলিলেন, অবিনাশচন্দ্র দাস বলিয়াছেন, ঋক্‌বেদের বয়স এত হাজার বৎসর। আর যায় কোথায়, শাস্ত্রীমহাশয় ফাটিয়া পড়িলেন। একদিন নীচের ঘরে বসিয়া আছি। শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আসিলেন। এক সময় রাখালদাস তাঁহার প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ইদানীং ইতিহাসের কথায় কিছু বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছিল। শাস্ত্রীমহাশয় বলিলেন, 'এই যে শ্রীমৎ আর. ডি. বন্দ্য, আসুন।' রাখালদাস পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতেছিলেন, দাঁড়াইয়া পড়িলেন। অনেকে শাস্ত্রীমহাশয়কে দাম্ভিক বলিতেন। আমি দেখিয়াছি পরিহাসপ্রিয় পিতামহ, শুভাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক, সহৃদয় আচার্য, মনীষা ও মনস্বিতায় এক প্রকাণ্ড পুরুষ।

১৩২৬ সালে শাস্ত্রীমহাশয় দ্বিতীয়বার হেতমপুরে আসিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিলেন প্রিয় পুত্র শ্রীমান্ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য। এবার মহারাজকুমার যথাযোগ্যভাবে তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রীমহাশয় জয়দেব কেন্দুবিল্ব গিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য বৌদ্ধ সহজিয়াদের অনুসন্ধান। কেন্দুবিল্বের সভায় শাস্ত্রীমহাশয় জয়দেব সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলেন। মহান্ত দামোদর ব্রজবাসী শাস্ত্রীমহাশয়ের বিশেষ সমাদর করিয়াছিলেন। শাস্ত্রীমহাশয় শ্যামরূপার গড় ও ইছাই ঘোষের দেউলও দেখিয়া আসিয়াছিলেন। বীরভূম বিবরণ ২য় খণ্ড তখন ছাপা শেষ হইয়াছে। আমরা কলেজপ্রাঙ্গণে সভা করিয়া তাঁহাকে অকপট শ্রদ্ধার অভিনন্দন দিয়াছিলাম। বীরভূম বিবরণ ২য় খণ্ড তাঁহার মহিমময় নামে উৎসর্গ করিয়াছিলাম। শ্রীঅনিলবরণ রায় তখন হেতমপুর কলেজের অধ্যাপক। তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমাদিগকে অনুগ্রহপূর্বক একটু প্রেরণা (Inspiration) দিয়া যাইবেন।' তিনি সেই সভায় আমাকে 'সাহিত্যরত্ন' উপাধি দিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'এই তো মূর্তিমান প্রেরণা আপনাদের সম্মুখেই রহিয়াছেন।'

সভায় মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জনকে তিনি 'তত্ত্বভূষণ' উপাধি দিয়াছিলেন। ২য় খণ্ড বীরভূম বিবরণে প্রায় আশিখানা ছবিতে বীরভূমের বহু স্থানের, মন্দিরের, মূর্তির ও জলাশয় ভিটি-আদির ছবি আছে। সাহিত্যিকদের পরিচয় আছে। বীরভূম বিবরণ ৩য় খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন হরপ্রসাদ। মহারাজকুমার দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমিও দিন গণিতেছি। বীরভূমের অনেক কথাই বলা হইল না।

বীরভূমে দাদামশাই

বীরভূম লাভপুরের খ্যাতনামা সুরসিক সাহিত্যসেবক নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় কাশীধাম হইতে পত্র লিখলেন, 'কাশী চলিয়া আইস। এখানে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (বিখ্যাত লেখক) আছে, এ্যাংলো-বেঙ্গলী স্কুলে মাস্টারী করে। তার চেয়েও গুরুতর খবর দাদামশাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে। উত্তরার সুরেশ চক্রবর্তী পরিচয় করাইয়া দিয়াছে। পত্রপাঠ আসিতে অন্যথা না হয়।'

দুর্ভাগ্য সে যাত্রা কাশী দর্শন ঘটিল না। নির্মলশিব ফিরিয়া আসিলে দেখা করিতে গিয়া শুনিলাম তিনি দাদামশাই—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাদর আমন্ত্রণ জানাইয়া আসিয়াছেন লাভপুরে আসিবার জন্য। দাদামশাই দয়া করিয়া সম্মত হইয়াছেন।

ইহার কিছুদিন পরেই মঙ্গলডিহি গ্রাম হইতে একজন লোক আসিয়া নির্মলশিবের একখানি পত্র দিল, 'মোটর বাইক পাঠাইলাম, দাদামশাই আসিয়াছেন, অতি অবশ্য আসিবে।'

সিউড়ী-বোলপুর রাস্তায় মোটর চলে। এই রাস্তার মাঝখানে পাড়ুই গ্রাম। পাড়ুই হইতে মঙ্গলডিহি গ্রাম পর্যন্ত মোটর বাইক আসিয়াছে। তাহার পরই রাস্তা দুর্গম। নির্মলের বন্ধু মঙ্গলডিহি-নিবাসী নিত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ড্রাইভারকে বুঝাইয়া দিয়াছিল কোথায় গিয়া কাহার বাড়ীতে বাইক রাখিবে। ড্রাইভার নির্দেশমত আমার প্রিয় সুহৃদ বনবিহারী ঠাকুরের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। বনবিহারীর মাতাঠাকুরাণী লোক পাঠাইয়াছেন। আমি দুই ক্রোশ হাঁটিয়া মঙ্গলডিহি গিয়া দেখি ড্রাইভার খাইয়া প্রস্তুত হইয়াই

আছে। মা আমারও খাওয়ার ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন। বৈকালবেলায় লাভপুর গ্রামের প্রবেশমুখে নির্মলশিবের নূতন বিরাম-মন্দির প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া দাদামশাইয়ের চরণবন্দনা করিলাম। নির্মলশিব পরিচয় করাইয়া দিলেন। বিরাম-মন্দিরের নীচেরতলার বৈঠকখানায় দাদামশাইকে কেন্দ্র করিয়া একটি ছোটখাট মজলিশ বসিয়াছে। প্রধান দুইজনের মধ্যে একজন নির্মলশিবের ভগিনীপতি সাহিত্যরসিক মজলিশী মানুষ মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় জন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর তখন সবে মাত্র সাহিত্যসাধনা শুরু করিয়াছেন। বোধহয় তাঁহার কবিতার বই 'ত্রিপত্র' বাহির হইয়াছে। কয়েকদিন বেশ আনন্দেই কাটিল। নির্মলশিব দাদামশাইকে লইয়া সিউড়ী আসিলেন। সিউড়ীতে তাহার বাড়ী ছিল এবং তখন তিনি সিউড়ীতে অনারারী হাকিম ছিলেন।

সে-সময় আমি থাকিতাম কচুজোড় গ্রামে। অণ্ডাল সাঁইথিয়া রেলপথে কচুজোড়ে যাহাতে গাড়ী দাঁড়ায় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এখন কচুজোড়ে একটি স্টেশন হইয়াছে। কুড়মিঠা গ্রাম হইতে বাহিরে যাতায়াত দুর্ঘট ছিল, কারণ পথ ছিল অত্যন্ত দুর্গম। কোথাও যাইবার আমন্ত্রণ আসিলে গাড়ী-গরু লইয়া বিপদে পড়িতাম, এই জন্যই কচুজোড়ে শ্বশুরালয়েই বাস করিতেছিলাম সাময়িকভাবে। একদিন দাদামশাই ও নির্মলশিবকে কচুজোড়ে আমন্ত্রণ জানাইলাম। পূর্বদিন আমি বৈকালে কচুজোড় আসিলাম, পরদিন স্নানান্তে উভয়ে আসিয়া মধ্যাহ্নভোজন করিবেন। নির্মলশিবের জুড়িগাড়ী ছিল, মোটরও ছিল।

যথাসময়ে উভয়ে আসিলেন। মধ্যাহ্নভোজনের পর নিকটবর্তী চণ্ডীমণ্ডপে তাঁহাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিলাম। কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'দাদামশাই, দক্ষিণেশ্বরে কে একজন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন?' দাদামশাই প্রতিপ্রশ্ন করিলেন, 'কেন বল দেখি?' আমি বলিলাম তিনি একখানা বই ছাপিয়েছিলেন—'লুপ্তরত্নোদ্ধার'। মানুষ হারান রত্নের সন্ধান পাইলে যেরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করে, তিনি তাহারও অধিক ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, 'কই হে আছে না কি? আন তো দেখি, দেখি।' আমি বইখানি আনিয়া দেখাইলে হাতে লইয়া বলিলেন, 'ও হে, আমিই সেই শর্মা, এ অপকর্ম আমিই করেছিলাম। তুমি এ বই কোথায় পেলে?' আমি বলিলাম, 'এক পুরানো বই-এর দোকান থেকে।'

বৈকালে বইখানি লইয়া আমরা তিনজনে সিউড়ী ফিরিলাম। বইখানির প্রথম পত্রে আছে—গুপ্তরত্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবি-সঙ্গীত-সংগ্রহ, দক্ষিণেশ্বর-

নিবাসী শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত, সন ১৩০১ সাল মূল্য ১।৶০

পরপৃষ্ঠায় লেখা আছে, কলিকাতা ৫৫নং আমহার্স্ট স্ট্রীট সরস্বতী যন্ত্রে শ্রীক্ষেত্রমোহন ন্যায়রত্ন দ্বারা মুদ্রিত। কেন কবির গান-সংগ্রহ প্রকাশ করিলাম তাহার কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম—

অবতরণিকা

"আজ বিংশতি বৎসরেরও অধিক হইল, তখন আমার বয়ঃক্রম নয় বৎসর মাত্র। পিতৃদেব কার্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া অন্তিম-প্রতীক্ষা যেন ক্লেশদায়িনী বোধে অসুস্থতাকে আহ্বান করিয়াছেন। অহরহ বহির্বাটীতেই থাকেন; সহচর মধ্যে কবির গান ও গুড়ুক, ইহারাই প্রিয়। মধ্যে মধ্যে গানে বিভোর হইয়া আমাকে বলিতেন, 'এ জিনিসের দাম নেই, এত মজা আর কিছুতে নেই।' আবার কখনও কখনও আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, 'এ সব আর শুনতে পাওয়া যাবে না; এমন জিনিস দেশ থেকে গেলে বড়ই অসুখের দিন আসবে।' পরে দেহ-রক্ষার ছয়-সাত দিন পূর্বে আমাকে একখানি খাতা দিয়া বলিলেন, 'দেখ আমার কিছুই নাই, সম্বলের মধ্যে এইখানি, ইহা যত্ন করিয়া রাখিও, পরে অনেক আমোদ পাইবে।' আমিও তাহা আমার বন্ধন শূন্য গলিত পত্র পুস্তকপুঞ্জের মধ্যে সরস্বতীর সমাধিমন্দির সদৃশ সেকেলে এক বিসদৃশ দন্তহীন বাক্সে রক্ষা করিলাম। কর্তব্যবোধ তখন যথেষ্ট, খাওয়া আর খেলা ইহারাই কর্তব্যের মধ্যে প্রধান; সুতরাং সে-খাতার আর খোঁজ রহিল না। বিশেষত সে বাক্সটি আমার সাবেক তোষাখানা, তন্মধ্যে যিনি একবার প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারই অগস্ত্যগমন হইয়াছে। অথবা সচ্ছন্দ ও প্রকৃত অবস্থায় কেহই প্রত্যাবর্তন করেন নাই। সম্ভবত খাতাখানি ক্রমে 'ভাঙ্গা ছাতা ও পুরাতন কাগজ ক্রেতার' হস্তে ন্যস্ত হইয়া বিশেষ সমাদৃত হইয়া থাকিবে।

সে যাহা হউক ত্রয়োবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে আমি কবির গানের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পরিলাম ও তখন ব্যাকুল হইয়া সেই খাতার অনুসন্ধান করিলাম; আক্ষেপের বিষয় তাহার চিহ্নমাত্রও পাওয়া গেল না। এত অনুতপ্ত হইলাম, যেন পিতার আজ্ঞা-লঙ্ঘনের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। সেই দিন হইতেই কবির গান সংগ্রহের ইচ্ছা বলবতী হইল। ক্রমে দুই বৎসরের চেষ্টায় যাহা পাইলাম তাহাও সম্পূর্ণ নহে ও তাহা লইয়া আশ্বস্ত বা সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। ভাবিলাম

বুঝি ভাল জিনিস মাত্রেই তবে নিরাকার; তাই বুঝি জোড়াতাড়া দিয়া কষ্ট-কল্পনা করিতে গেলেই অদ্ভুত সৃষ্টি হইয়া পড়ে।"

অতঃপর দাদামশাই অসুস্থ হইয়া মিরাট গিয়াছিলেন। সেখানে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত তাঁহার হাতে ঈশ্বর গুপ্তের সংগৃহীত কতকগুলি কবির গান লেখা একটি খাতা তুলিয়া দেন। দেশে ফিরিয়া বালী-নিবাসী শ্রীযুক্ত ভগবতী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বড় কাঁটালে-নিবাসী নীলমাধব চট্টোপাধ্যায়, আড়িয়াদহ নিবাসী বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নিকট হইতে সাহায্য পাইয়া দাদামশাই গুপ্তরত্নোদ্ধার প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে বহু কবিওয়ালার গান সংগৃহীত আছে। পুস্তকের প্রথম পাতায় গুপ্তরত্নোদ্ধার, আর পুস্তক মধ্যে লুপ্তরত্নোদ্ধার লিখিত আছে, ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, 'গুপ্ত-রত্নোদ্ধার নাম দিয়া একখানি বই আগেই বাজারে বাহির হইয়া গেল, তাই আমাকে নাম বদলাইতে হইয়াছিল।'

গুপ্তরত্নোদ্ধার আমাকে দাদামশাই-এর একেবারেই আপনার করিয়া দিল। আমি তাঁহার প্রশ্রয় পাইয়া তাঁহার সাহিত্য-সাধনার ইতিহাস জানিতে চাহিলাম। কাশীধামে গিয়া আমি একখানি 'কাশীর কিঞ্চিৎ' কিনিয়াছিলাম। কে রচয়িতা জানিতে পারি নাই। কথায় কথায় প্রকাশ হইয়া পড়িল নন্দী শর্মা কেদারনাথ। যতদূর স্মরণ হয়—প্রচ্ছদপটে একটি গাঁজার কলিকার ছবি ছিল। প্রথম সংস্করণ হারাইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয়টিও খুঁজিয়া পাইতেছি না। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণখানি হাতের কাছে পাইলাম। তৃতীয় সংস্করণে নন্দী শর্মায় তারকা চিহ্ন আছে। নীচে পাদটিকায় লেখা আছে—নরদেহে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণেশ্বর।

'কাশীর কিঞ্চিৎ' প্রথম প্রকাশিত হয় কাশী হইতে সন ১৩২২ সালের বড়দিনে। দ্বিতীয় সংস্করণও বাহির হইয়াছিল কাশী হইতে সন ১৩২৭ সালের ১লা বৈশাখ। তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে কলিকাতা হইতে, লেখা আছে দক্ষিণেশ্বর, জন্মাষ্টমী—সন ১৩৩১ সাল।

উৎসর্গ পত্র

শ্রীশ্রীবাবা বিশ্বনাথ শ্রীপাদপদ্মেষু

কে নেবে আর এমন জিনিস কার চড়ে না হাঁড়ি,
কোপনি কাঁথাও জোটেনিক' চালচুলো না বাড়ী;

যা কিছু অস্পৃশ্য আর যা কিছু জঞ্জাল
ছাই ভস্ম মড়ার মাথা, অস্থি হাড় মাল,
গলায় ফণী কণ্ঠে গরল বেড়াও ঘুরে ফিরে
গাঁজার গরম কাটবে বোলে গঙ্গা ধর শিরে,
কপালেতেও আগুন ধর দুনিয়ার বার
এমন পাত্র মনে ধরেছিল শুধু মা'র।
এতেই যদি বিশ্বনাথ হয় বিগ্রহিত
পাত্র বটে পেতে তুমি কাশীর কিঞ্চিৎ।

চিরসেবক, নন্দী শর্মা

'কাশীর কিঞ্চিৎ' বইখানিতে ভূমিকা নাই, আছে জমিকা।

জমিকা

ভগবানকে দেওয়া যেমন গুণের সার্টিফিকিট
ব্রাহ্মণ ব'লে বশিষ্ঠের ভালে মারা টিকিট।
কাশীর গুণ ব্যাখ্যা করাও সেইরূপই ধৃষ্টতা
পরিহাস মাত্র সেটা বাহুল্য শিষ্টতা।
মহাজনে যে মহাত্ম্যের পাননিক' সীমা
কাশীখণ্ডে যে ক্ষেত্রের প্রকাশে মহিমা।
কি জানি শেষ আমার মত মূর্খ অকিঞ্চন
লাট সাহেবকে ব'লে বসে দারোগা সাহেব হন।
কিম্বা পাছে শিব গোড়তে বানর গোড়ে বসি
দুর্লভ মাহাত্ম্যে পাছে মাথাই শুধু মসী।
তাই অমৃতে অমৃত আর কৈবল্যে কৈবল্য
নূতন ক'রে বলবার কিছু দেখিনা সাফল্য।
চিরকালই আছেন কাশী ক্ষেত্র অবিনাশী
আমি সেটা ব'লে কেন বাড়াই শুধু হাসি।
কাশী সেই কাশীই আছে থাকবেও চিরদিন
মানুষই স্বভাব দোষে হচ্ছে ক্রমে হীন।
সে দোষ কাশীর নয়, মানুষেরই সেটা
হেথায় সে বিষয় খুঁজে বাধিয়েছে এই লেটা।

বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা জাহ্নবী চরণে
শ্রদ্ধায় নির্ভর কর জীবনে মরণে।
আমিও আজ এই সুযোগে করি তাঁদের প্রণাম
লিখতে দুচার অন্য কথা মঞ্জুরিটা নিলাম।

কাশীধাম, বড়দিন ১৩২২

নন্দী

গল্প করিলেন—বঙ্গবাসীতে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চানন্দ লিখতেন, আমি নন্দী শর্মা নাম দিয়ে লিখতাম। একটা কাগজে (কাগজের নাম আমার মনে নাই, বোধহয় 'ভারতী' হইতে পারে) 'লাঠী' বাহির হইয়াছিল, পঞ্চানন্দ লিখলেন 'লাঠীর উপর লাঠী'। আমি লিখলাম 'লাঠালাঠী'! সাহিত্য-চর্চা তাঁহার অব্যাহত ছিল। 'কাশীর কিঞ্চিৎ' কবিতায় লেখা—ছড়ার আকারের কবিতা। এ যাত্রাও তাঁহার সঙ্গে একটা বাক্স ছিল, তালা প্রায়ই খোলা থাকিত। একদিন তাহার মধ্য হইতে একটা কবিতার খাতা লুকাইয়া বাহির করিয়া পড়িলাম। যথাস্থানে খাতা রাখিয়া সন্ধ্যায় ধরিয়া বসিলাম যদি কোন লেখা সঙ্গে থাকে আমাদের শুনাইতে হইবে। অনেক ওজর আপত্তির পর খাতা বাহির হইল। তিনি নিজে পড়িয়া কবিতাগুলি শুনাইলেন। আমি বলিলাম কবিতাগুলি ছাপাইয়া ফেলুন। সম্মত হইলেন, বলিলেন, 'নামকরণ কর।' নাম দিলাম 'উড়ো খৈ'। সেই নামেই কবিতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে দাদমশাইয়ের 'কোষ্ঠীর ফলাফল' বাহির হইয়াছিল। এই বইয়ে একটি জীবন্ত চরিত্র আছে 'জয়হরি'। জয়হরি সশরীরে সিউড়ীতে দাদামশাই-এর সঙ্গে আসিয়াছিলেন। যেমন বপু, তেমনই ভোজনেপটু। দাদামশাই-এর জামাতা পূর্ণিয়ায় ডাক্তারী করিতেন। জয়হরি তাঁহার কম্পাউণ্ডার ছিলেন। জামাতার অকালে পরলোকগমনের পর জয়হরি ঐ ডাক্তারখানা আগলাইয়া দাদামশাই-এর নাতিদের দেখাশোনা করিতেন। সিউড়ীতে জয়হরি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, তিনিই সংবাদ দিলেন সিউড়ীর রেলওয়ে কোয়ার্টারে তাহার একজন আত্মীয় আছেন। তাঁহার ইচ্ছামত নির্মলশিব তাঁহাকে সেই আত্মীয়ের বাসায় পাঠাইয়া দিলেন। সুস্থ হইয়া জয়হরি দাদামশাই-এর সঙ্গেই পূর্ণিয়ায় ফিরিয়াছিলেন।

সাহিত্যের আসরে অনন্তকর্মা হইয়া নামিয়াছিলেন দাদামশাই সমরকামী

চাকুরী হইতে অবসরগ্রহণের পরে। তিনি সামরিক বিভাগে কাজ করিতেন—রসদের হিসাব-নবীশ। বৃটিশ সরকার চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বক্সার বিদ্রোহ দমনে গিয়াছিল। দাদামশাই সৈন্যদলের সঙ্গী ছিলেন। যুদ্ধের ডামাডোলের বাজার, তাহার উপর খাস রসদ-সরবরাহের তালুক। কত লোকে লাল হইয়া গেল। দাদামশাই চীনের পাঁচিলের একখানা ইট পাইয়াই খুশী হইয়াছিলেন। পরিবর্তে আমাদিগকে দান করিয়াছিলেন 'চীনযাত্রী'। স্বয়ং পরশুরাম বইখানির মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন। 'চীনযাত্রী' ভ্রমণ কাহিনী নহে, একখানি রসোত্তীর্ণ সাহিত্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থেই তাঁহার পাকা হাতের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর আছে। বইখানি এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

দাদামশাই পেন্‌সন লইয়া কাশীবাসী হইয়াছেন। যতদূর স্মরণ হয়—ইং ১৯২৬ সালে দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন। সভাপতি স্বনামধন্য বীরবল—প্রমথ চৌধুরী। উত্তরার সুরেশ চক্রবর্তী (দাদামশাই-এর আবিষ্কারক দ্বিতীয় কলম্বস) দাদামশাইকে দিল্লী পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গেলেন, এবং প্রবন্ধ হস্তে পৌঁছাইয়া দিলেন সম্মেলন-মণ্ডপে। দাদামশাই পাঠ করিলেন 'পেন্‌সেনের পর'। প্রবন্ধ শুনিয়া জড়াইয়া ধরিলেন রসজ্ঞ প্রমথ চৌধুরী। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এতদিন চুপচাপ ছিলেন কেমন করিয়া?' একটি প্রবন্ধই তাঁহাকে সাহিত্যিক সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল। লেখাটি 'কবলুতি'তে ছাপান হইয়াছিল। কবলুতি অমৃতলাল বসুর নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। দাদামশাই-এর সমস্ত বই-ই আমার কাছে ছিল। এখন মাত্র নয়খানি পাইলাম।

চীনযাত্রী—১৩৩২ সালে প্রকাশিত। আমার নিকটে যে 'চীনযাত্রী' আছে তাহাতে কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ লেখা নাই। দাদামশাই যেন বলিয়াছিলেন ১৯১৮ সালে 'চীনযাত্রী' প্রথম বাহির হইয়াছিল। আমার ঠিক মনে পড়িতেছে না। 'আমারা কি ও কে' ১৩৩৪ সালে, 'কবলুতি' ১৩৩৫ সালে 'পাথেয়' ১৩৩৭ সালে, 'ভাদুড়ী মশাই' (উপন্যাস) ১৩৩৮ সালে, 'মা ফলেষু' ১৩৪৩ সালে, 'সন্ধ্যা শঙ্খ' ১৩৪৭ সালে, 'স্মৃতিকথা' ১৩৫২ সালে প্রকাশিত হয়। 'আই-হ্যাজ' (উপন্যাস) বইখানিতে প্রকাশকাল লেখা নাই। 'উড়ো খৈ' বোধহয় ১৩৩৪ সালে বাহির হইয়াছিল। দাদামশাই বলিয়াছিলেন কবিতাগুলি 'কাশীর কিঞ্চিৎ' 'লেখার পূর্ব হইতেই লিখিতে সুরু করিয়াছিলেন, বোধহয় সন ১৩১৯ সাল হইতে পারে শুভারম্ভের তারিখ। অবসর মত লিখিয়াছিলেন, দুই-এক বৎসরের ভিতর।

ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, অমৃতলাল বসু—রসরচনার এই এক ধারা। স্বনাম প্রসিদ্ধ ইন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরাধিকারী হইয়াও আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। বাঙ্গালার ভাব-স্বাতন্ত্র্যের ব্যাখ্যাতা তিনি। বাঙ্গালীর পুরাণ ও তন্ত্রের অতীত মহিমার যুগোপযোগী ব্যাখ্যার অগ্রদূত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। বিপিনচন্দ্র পাল, বিজয়কৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য 'ডন' সোসাইটির সতীশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে দেশাত্মবোধকে মিলিত করিয়াছিলেন। পাঁচকড়িও ভগবদ্ভক্ত হইয়াও দেশ-ভক্ত, সেই সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতায়, শ্লেষ-ব্যঙ্গ-কৌতুকে সুদক্ষ।

রসরচনার ক্ষেত্রে বীরবল—প্রমথ চৌধুরীকে নবযুগের প্রবর্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার সবুজপত্র একটি পৃথক গোষ্ঠীরই সৃষ্টি করিয়াছিল। সাহিত্যে তিনিই কথ্যভাষাকে জলচল করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথও বীরবলকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কথ্যভাষা এখন প্রায় সকল সাহিত্যিকেরই ভাবপ্রকাশের বাহন।

পরশুরাম (রাজশেখর) এবং কেদারনাথ বাঙ্গালার রস-সাহিত্যের দুই দিক্‌পাল, আপন আপন স্বাতন্ত্র্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। আধুনিক সমালোচকগণ যাহাকে 'প্যারাডক্স' বলেন—জীবনের নানান্ অসঙ্গতি উভয়েরই লক্ষ্যস্থল। নিষ্ঠার নামে গোঁড়ামি, শুষ্ক আচারের আবরণে কাপট্য, সততার ছদ্মবেশে শাঠ্য, ছলনা, ন্যাকামি, ইঁহাদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নাই। তবে পরশুরাম প্রধানত নাগরিকদের লইয়াই কারবার করিয়াছেন। কেদারনাথের লক্ষ্য ছিল পল্লীসমাজ, সাধারণ গৃহস্থ-মানুষ। এই দিক দিয়া বরং শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কেদারনাথের কিছুটা ঐক্য আছে। সমাজের নানান্ অসঙ্গতি, অনাচার, অত্যাচার, অভাব, অভিযোগ, দুঃখকষ্ট উভয়কেই ব্যথিত করিয়াছিল। আপন আপন অধিষ্ঠানভূমি হইতে দুইজনে দুই রকম দৃষ্টিভঙ্গীতে তাহা দেখিয়াছেন, এবং আপন অনুভূতির রঙ-এ রাঙ্গাইয়া তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র অন্তরের দরদ দিয়া লিখিয়াছেন পল্লীকথা। পল্লীর সমাজ, পল্লীর নরনারী, তাহাদের সারল্য, সততা, সদাচরণ, স্নেহ, মমতা, তাহাদের অনাচার, ব্যাভিচার, ধূর্ততা, পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা সমস্তই তিনি দেখিয়াছেন এবং নিপুণ হস্তে বর্ণনা করিয়াছেন। কেদারনাথও দেখিয়াছেন সমস্তই, আঁকিয়াছেন তাহার নিখুঁত ছবি। সেই সঙ্গে মিলাইয়াছেন আপন স্বভাবসিদ্ধ শ্লেষ-ব্যঙ্গ, কৌতুক-রসিকতা। তিরস্কার আছে, সে তিরস্কার আত্মতিরস্কার, আত্মধিক্কারের-ই রূপান্তর, বাজিয়াছে

তাহারই বুকে বেশী। একটা জাতির প্রতিনিধিরূপে এ যেন নিরুপায় দুঃখে আপনার বক্ষে শিরে হতাশার করাঘাত—কষাঘাত!

কেদারনাথ ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। তাই বলিয়া তথাকথিত রক্ষণশীল ছিলেন না। সমস্যা বুঝিয়াছেন, সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিতও করিয়াছেন। কিন্তু কোথাও বাড়াবাড়ি করেন নাই। রক্ষণশীল ও সংস্কারক উভয়েরই মাত্রাধিক্য তাঁহার হাতের শ্লেষ ও ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ ও তীব্র আঘাতে জর্জরিত হইয়াছে। আস্তিক্য-বুদ্ধিসম্পন্ন এই ব্রাহ্মণ যেমন আত্মপ্রত্যয়ে তেমনই আত্মমর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার মুখে প্রত্যক্ষদৃষ্ট অনেক অলৌকিক কাহিনী শুনিয়াছিলাম। বিশ্বাস এবং কৃতজ্ঞতার বিগ্রহ ছিলেন তিনি। 'আই হ্যাজ' উপন্যাস ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করিয়াছেন। 'পাথেয়' উৎসর্গ করিয়াছেন সহধর্মিনীকে। লিখিয়াছেন, 'তোমাকে, তুমি জান আমার অন্য কিছু নাই। আমিও জানি তোমার নিকট ঋণী থাকাতেই আমার সুখ।' 'ভাদুড়ীমশাই' দিয়াছেন প্রমথ চৌধুরীকে। 'সন্ধ্যা শঙ্খ' বনফুলের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কৃতজ্ঞতা নাই, আছে অপরিসীম স্নেহের প্রকাশ। আমাকে তিনি কত স্নেহ করিতেন, আমি তাঁহার কিরূপ প্রীতিপাত্র ছিলাম—'স্মৃতিকথা'র উৎসর্গপত্রে আমার মত একজন নগণ্য ব্যক্তির নাম যোগ করিয়া চিরকালের জন্য তাহার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। একখানি বই তিনি ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সত্যের পূজারী ছিলেন দাদামশাই। রহস্যছলে ব্যঙ্গ-কৌতুকের মুখে সত্যেরই সন্ধান দিয়া গিয়াছেন তিনি। সে-সত্য সেদিনও যেমন ছিল অম্লান, আজিও তেমনই আছে উজ্জ্বল। আমরা তাহার আলোকে অনেক কিছু আবিষ্কার করিতে পারি যদি ইচ্ছা থাকে, সাহস থাকে, অনুসন্ধিৎসা থাকে।

'আমরা কি ও কে' বিশ্ববন্দ্যনীয় কবি রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গীকৃত। রবীন্দ্রনাথ বইখানি পাইয়া লিখিয়াছিলেন—'এখনও কি যৌবনের বসন্ত হাওয়া তোমার কলমের মুখে অপর্যাপ্ত লেখা বিকশিত করে তোলে? রসের তো বিরাম নেই। তোমার এই রচনার কুঞ্জে মরা ডালে শুকনো পাতা নেই বললেই হয়। তোমার চিত্রপট থেকে ছবিগুলো বেড়িয়ে এসে কথা কইতে থাকে। এর মধ্যে দুটো-একটা লেখা আছে যার মধ্যে টানা-বোনার লক্ষণ দেখেছি। তোমার কথায় সহজ উচ্ছ্বাস আছে বলেই এর জন্যে নালিশ জানাতে হল। তা

হোক পড়ে খুশী হয়েছি, এমন করে মূর্তির ভেতর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে অল্প লোকেই পারে' (১৩৪৪, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ)।

তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'শেষ খেয়া' গুরুগম্ভীর রচনার নিদর্শন। অন্যান্য তিনখানি উপন্যাসে এই ধারা বর্জন করিয়াছিলেন। উপন্যাসেও যেমন ছোট-গল্পেও তেমনই। 'চিত্রকল্পে' সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তুলির টান সর্বত্রই সূক্ষ্ম কারুকার্যে সুবিন্যস্ত ছিল। স্থূল রেখাঙ্কনও তাঁহার ছবিতে প্রচুর। কিন্তু সবগুলিই প্রায় ছবি হইয়াছে। আর কবিগুরুর ভাষায় ছবিগুলি চিত্রপট হইতে বাহিরে আসিয়া কথা কহিয়াছে। তাঁহার আঁকা অধিকাংশ ছবিই জীবন্ত। গতানুগতিকতা, টানা-বোনার লক্ষণ, কষ্ট-কল্পনা, কাতুকুতু দেওয়ার চেষ্টা তাঁহার রচনাতে আছে, তবে কমই আছে।

এই মনীষী ও মনস্বী লেখক হাস্যরস সৃষ্টিতেও যেমন, করুণরস সৃষ্টিতেও তেমনই—উভয়ত সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার 'পাথেয়' বইখানি প্রায় সত্য ঘটনা অবলম্বনেই লিখিত। তিনি বলিয়াই দিয়াছেন, 'সত্য ঘটনা অবলম্বনে গল্প কয়টির গড়ন।' গল্প আছে, 'দূরের আলেয়া', 'ধর্ম', 'হারু', 'অন্নপূর্ণা' এবং 'দুর্ভিক্ষের দান'। দেবতা ও শয়তান পাশাপাশি আছেন এই গল্পগুলির ভিতরে। তথাকথিত ডুলে বাগদী চাঁড়ালের মধ্যে তিনি দেবতাকে দেখিয়াছেন, আর নামাবলী যজ্ঞোপবীতের অন্তরাল হইতে শয়তানকে আবিষ্কার করিয়াছেন তিনি। এই ধরনের অনেক সত্য ঘটনার কথা আমি তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। 'পাথেয়' মধ্যে প্রকাশিত গল্পগুলি তাহারই কয়েকটি মাত্র। তাঁহার দেখিবার চোখ ছিল, প্রকাশের সামর্থ্য ছিল, ভাষা ছিল। 'পাথেয়' পড়িয়া চোখের জল রোধ করা শক্ত হয়। 'মা ফলেষু,' 'সন্ধ্যা শঙ্খ' প্রভৃতির মধ্যেও প্রকৃত গল্প আছে। অনেক গল্প পড়িতে পড়িতে আপনা আপনিই হাসিয়া উঠি। পার্শ্বে কেহ থাকিলে বিস্মিত হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। চোখে জল দেখিয়াও তেমনই পার্শ্বোপবিষ্ট বন্ধুবান্ধব অপ্রস্তুত হইতেন। এসব তো আর ব্যাখ্যা করিয়া বুঝান যায় না। কারণ নির্ণয় করা কঠিন হয়। যাহা অনুভবের বস্তু তাহাকে কোন্ ভাষায় বিবৃত করা চলে। যিনি লিখিয়াছেন তিনিও চোখের জলেই লিখিয়াছিলেন, হাসির আলোক ছড়াইয়া লেখাটাকে রঙীন করিয়াছিলেন। এইসব গল্প বলিতে গিয়াও দাদামশাইয়ের চোখের কোণে জল দেখিয়াছি। হাসির গল্পে নিজে বড় একটা হাসিতেন না। উচ্চহাসি তো নয়ই, মৃদুমন্দই হাসিতেন। তাঁহার বলার ভঙ্গিই ছিল হাসি-মাখান।

কেদারনাথ ছোট গল্পের নূতন ধারার প্রবর্তক। যৌনকথা না থাকিলেও গল্প হয়। অশ্লীলতা না আনিয়াও গল্পে রসসৃষ্টি করা যায়, ইহা দেখাইয়া গিয়াছেন কেদারনাথ। 'আমরা কি ও কে' তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। প্রথম গল্পের নামেই বইখানির নাম। গল্পের শেষে স্মরণীয় মন্তব্য, 'বিলীতি মলাটের বেদান্ত'। এই বইয়ের দুটি গল্প 'পুরসুন্দরী' ও 'থাকো' একই জীবনের দুইটি দিক। ঈশ্বর বিশ্বাসের কথা বলিতেছিলাম। 'থাকো' গল্পটির এক অংশ তুলিয়া দিলাম, 'একজন সৎগোপ, উপাধি নিয়োগী, নিজের উত্তম, অধ্যবসায় ও সততায় সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতির উচ্চশিখরে উঠিয়াছিল। বাড়ীতে দুর্গোৎসবই প্রধান উৎসব ছিল, আর ছিল কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। তাছাড়া বারমাসে তের পার্বণ ছিল। থাকো এই বাড়ীর কর্ত্রী। সে গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারে সেবা করিয়া, আবশ্যকমত সাহায্য করিয়া দিন কাটাইত। এক বৎসর পুরোহিতের অশৌচ, তিনি অন্য ব্রাহ্মণ ডাকাইয়াছেন লক্ষ্মীপূজায়। পূজার রাত্রির ঘটনটা বলিতেছি।'

'কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার রাত্রি। দেবীর আরত্রিক শেষ করিয়া পুরোহিত যেন কাহাদের বলিলেন—ওগো মায়েরা এ বাড়ীর গিন্নীমাকে এখানে একবার আসতে বলুন। পূর্বপরিচিত বেশে থাকো উপস্থিত হইয়া বলিতেছে—আপনি কি আমাকে ডাকছেন ? পূজারী বলিলেন না তোমাকে ডাকি নি। এ বাড়ীর গিন্নীকে একবার ডেকে দিতে বলেছি। থাকো ধীরভাবে বলিল তার প্রতি কি আদেশ বলুন। পুরোহিত বিরক্ত হইয়া বলিলেন তাঁর প্রতি এখানে আসতে আদেশ। থাকোকে তখনও দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া একটু শান্তভাবে বলিলেন, বল তিনি না এলে আমি দর্পণ বিসর্জন করতে পারছি না অপেক্ষা করে রয়েছি।...থাকো বিনীতভাবে বলিল আমি তো আপনার আদেশ পালন করবার জন্যে উপস্থিতই রয়েছি। আপনি কি বলবেন বলুন না। পুরোহিত চকিতভাবে থাকোর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। ইতিপূর্বে তিনি তাহার আধময়লা কস্তাপেড়ে কাপড়ই দেখিয়াছিলেন। বলিতে ভুলিয়াছি থাকো থাকিত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু একটা আধময়লা কস্তাপেড়ে শাড়ীই তাহার পরিধেয় ছিল। হাতে শাঁখা লোহা আর দুই গাছি সোনার বালা ভিন্ন অলঙ্কার সে পরিত না। পুরোহিত আবিষ্টের মত বলিলেন, 'ওঃ তা না তো কি মা নিজে আসেন। কি ভুলই করেছি। আমি নূতন লোক, কাল রাত্রে এসেছি, কিছু মনে কর না মা।

'পুরোহিত বলিলেন, মায়ের কাছে এখন যা চাইবে তাই পাবে। এ শুধু ঠাকুর-প্রণাম নয়। বেশ মনস্থির করে ভেবেচিন্তে প্রার্থনা জানাও। খুব সাবধান, গরীব ব্রাহ্মণের কথা অবিশ্বাস কর না। থাকো সঙ্গে সঙ্গে গলবস্ত্রে মায়ের নিকট প্রণামপূর্বক প্রার্থনা জানাইয়া উঠিলেন। পুরোহিতের নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি যখন বলিলেন প্রার্থনা জানাইয়াছি—এই সুখের মাঝখানে সব অটুট থাকতে থাকতে আমাকে দয়া করে তিনি তাঁর পাদপদ্মে নিয়ে নিন। পুরোহিত বিচলিত হইলেন, মৃদু তিরস্কার করিলেন। বলিলেন তেমোদের চিনতে পারলুম না। থাকো উত্তর দিল, আপনি যে মেয়েলি শাস্তোর পড়েন নি বাবা। এই বলিয়া পুরোহিতের পায়ের ধুলা লইয়া বিজয়িনীর মত চলিয়া গেল। পুরোহিত বিমূঢ়বৎ অপলক নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিলেন।'

একেবারে গীতার জঙ্গম প্রতিমা! কোন পূজা-অর্চনা নাই জপতপ নাই, সাধন-ভজন নাই, গৃহস্থ বাড়ীর অক্ষর-জ্ঞানহীনা মেয়েমানুষ—জাতিতে সৎগোপ। মাত্র পাতিব্রত্য আর সেবাব্রতের মধ্য দিয়া এমন এক রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিল, যেখানে গেলে আর পতন হয় না, আর কিছু চাওয়া-পাওয়ার কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না। থাকোর মনস্কামনা সফল ও সার্থক হইয়াছিল। স্বামী, পুত্র ও একটি নাতি রাখিয়া সে স্বামীর পায়ে মাথা দিয়া শান্তি লাভ করিয়াছিল। লেখকের ভাষাতেই বলি—

'তাহার পর কয়েক মাস গত হইয়াছে। একদিন প্রাতে দেখি গ্রামের ইতর ভদ্র স্ত্রীলোকেরা, মায় বৌ ঝি, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, অসংযত, গঙ্গার ধারে ছুটিতেছে। কারণটা জানিবার জন্য এক বর্ষিয়সীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, আর বাবা সর্বনাশ হল, আমাদের থাকো চলল। গত কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার কথাটা যুগপৎ স্মরণ হইয়া বুকটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল।

... ...

(অন্তিম শয়নে থাকো স্বামীকে বলিতেছে—)

'ছিঃ পুরুষ মানুষের অমন হতে নেই। পায়ের ধুলা দাও।

কর্তা বলিলেন, ভগবান এতটা দিলেন, সে সুখ একদিন ভোগ করলে না, এই আমার দুঃখ।

থাকো সিক্তকণ্ঠে বলিল, ওগো, তুমি জান না, আমার এত সুখ যে, তা সয়ে থাকতে আর সাহস হচ্ছিল না। মেয়েমানুষের এত সুখ বেশিদিন ভোগ করবার লোভ করতে নেই গো। এই পর্যন্ত বলিয়া হাত দুখানি কষ্টে বক্ষের উপর

তুলিয়া জোর করিতে করিতে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে চক্ষু বুলাইয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল, এদের নিয়ে থেক। হাত আর মাথায় উঠিল না, দুই পাশে পড়িয়া গেল।...শতকণ্ঠে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। দর্পণ বিসর্জন শেষ হইয়া গেল। পল্লী লক্ষ্মী বিদায় লইলেন।'

সাহিত্যের রসের সঙ্গে এই পরম রসের সমন্বয়,—সাবলীল তুলির টানে এইরূপ জীবন্ত চিরন্তন চিত্র অঙ্কন ইদানীং দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে সে বিচার করিবে ইতিহাস, করিবেন মহাকাল।

আমার প্রার্থনা, আমরা যেন অকৃতজ্ঞ না হই। দাদামশাইকে যেন ভুলিয়া না যাই। তাঁহার দেওয়া ঋণ যেন তাঁহাকে প্রাপ্য মর্যাদা দিয়াই পরিশোধ করিবার চেষ্টা করি।